নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস
ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট। সুজিত দাস
নতুন ধারাবাহিক কলম
আসামের চিঠি। সমর দেব
অন্যান্য ধারাবাহিক
ইতিহাস। রেনী-র ডুয়ার্স
উপন্যাস। তাজ্জব মহাভারত
পর্যটন। বউ সাথে পথে পথে
গল্প। রম্যাণী গোস্বামী

উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

জানুয়ারি ২০২০। ২০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্তা

কোচবিহার স্পেশাল
গান্ধী ও রাজ পরিবার।
ইভনিং @ সাগর দিঘি স্কোয়্যার
নতুন ধারাবাহিক।
রাজনগরের রাজনীতি।
অরবিন্দ ভট্টাচার্য

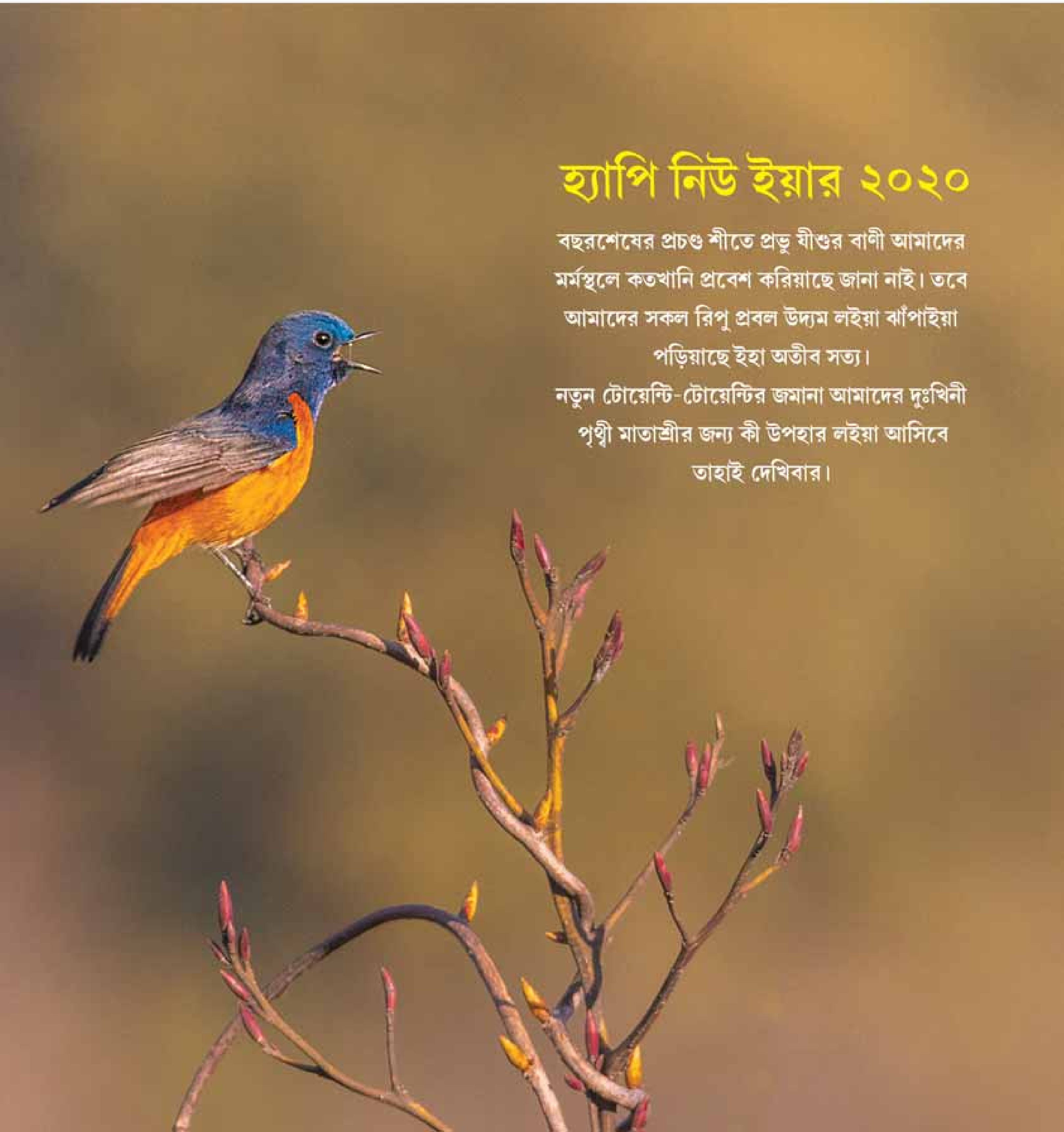

হ্যাপি নিউ ইয়ার ২০২০

বছরশেষের প্রচণ্ড শীতে প্রভু যীশুর বাণী আমাদের মর্মস্থলে কতখানি প্রবেশ করিয়াছে জানা নাই। তবে আমাদের সকল রিপু প্রবল উদ্যম লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে ইহা অতীব সত্য।
নতুন টোয়েন্টি-টোয়েন্টির জমানা আমাদের দুঃখিনী পৃথ্বী মাতাশ্রীর জন্য কী উপহার লইয়া আসিবে তাহাই দেখিবার।

এখন ডুয়ার্স **সম্পাদকের চিঠি**

বাণিজ্যে বসতি সাহিত্য

টোয়েন্টি টোয়েন্টি। আমাদের অস্তিত্বের ষষ্ঠ বসন্ত যখন দোরগোড়ায়, তখনও উত্তরের বইপত্র-সংশ্লিষ্ট মহল ধন্ধ কাটিয়ে উঠতে পারে নি, 'এখন ডুয়ার্স' আসলে কোন দল বা গোষ্ঠীর প্রতিভূ! এদের অর্থের যোগানই বা আসে কোত্থেকে? এদের বিরোধী গোষ্ঠীই বা কারা? উত্তরের লেখক বা কবি হিসেবে স্থানীয় মহলে পরিচিত সেই মানুষগুলি এক হাতে টাকা অন্য হাতে পাণ্ডুলিপি নিয়ে বই করবার অভিপ্রায়ে এসে সবিনয়ে 'আপাতত নয়' বলে যখন প্রত্যাখ্যাত হন তখন তাঁরাও বিস্ময়ে ঘুরে ঘুরে দেখেন আর ফিসফিস বলাবলি করেন, এরা কারা রে? এরপর অকারণে এক অদৃশ্য দেওয়াল তৈরি করতে থাকেন তাঁরা, অহেতুক দূরত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করেন। আমরা অজান্তেই শত্রু শিবিরে পরিণত হই, আর তাঁরা দলে ভারি হওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। যেন আজ হোক কাল হোক যুদ্ধ আসন্ন।

বাকি বৃহত্তর অংশ কিন্তু আবেগে আপ্লুত, সত্যিই এরা বাংলার এই প্রান্তভূমির জন্য কিছু করবার চেষ্টা করছে, এদের যত দেখি তত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই, এরা একদিন নিশ্চয়ই সফল হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁদের সবাইকে যে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিই বা সবাইয়ের লেখা যে আমরা ছাপি তা নয়। তবু এইসব মানুষগুলির আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় ভালবাসায় ভরে যায় আমাদের ইনবক্স, আমাদের দপ্তর, চলার পথ, এবং অবশ্যই আমাদের হৃদয়। গত তিন মাসে আয়োজিত তিনটি অনুষ্ঠানে হলঘর ভর্তি করে ওঁরা প্রমাণ করে দিয়েছেন ওঁদের ভালবাসায় কোনও ওপর চালাকি নেই।

প্রথম দিকে আমরা কেবল ছোট বড় নিবন্ধে সাম্প্রতিক ডুয়ার্সকে যতটা সম্ভব তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি, সাহিত্য মহল থেকে দূরত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করেছি। কারণ পত্রিকা শুরু করে প্রথমটায় খালি চোখে বা এক নজরে গুটিকয়েক ইতিহাস গবেষক আর লিটল ম্যাগাজিনের দুর্বোধ্যতায় আটকে থাকা স্বঘোষিত কবি-সাহিত্যিক ছাড়া কিছু চোখে পড়ে নি। অজস্র ছোট ছোট গোষ্ঠী একে অপরের প্রতি যুযুধান, অথবা নিজেদের পিঠ নিজেরাই চাপড়ে দিচ্ছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ একটু বেশি স্মার্ট, লেখালেখিতে হাত না পাকলেও নিজেদের সীমানা ছাড়িয়ে দক্ষিণে বা পূর্বে গিয়ে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে হাত পাকিয়ে ফেলেছেন। যেমন লেখা বিনিময়, সম্বর্ধনা বিনিময়, পুরস্কার সম্মাননা বিনিময়। সোশ্যাল মিডিয়ার বদান্যতায় সৃষ্টি হয়েছে কিছু কাগুজে বাঘ, আসলে গুটিকতক বই এবং পুরস্কারেই যাঁদের মোক্ষলাভ। এতে সাহিত্যচর্চায় কতটা উন্নতিসাধন হল বলা কঠিন, তবে সাহিত্যের পাঠক ক্রমশ হারিয়ে গেল। পড়ে রইল দৈনিক বা সাপ্তাহিকের মুখরোচক খবরের কিছু পাঠক, যারা সত্যি সত্যিই শয়তানের মতই ঈশ্বরকেও ভয় করে। ভয় যে আদপে নেই তা নয়, এসময় অকুতোভয় হওয়ার পরামর্শও কাউকে দিতে চাই না। কিন্তু এর বাইরেও অদৃশ্য এক ভয়ের পরিমণ্ডল ঘিরে ধরেছে এই মানুষগুলিকে, অহেতুক ভয় তাদের নীরব ঘরমুখী করে তুলেছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, সাধারণ পাঠক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া আজকের সাহিত্য মানুষকে অকারণ ভয়ের এই বেড়াজাল থেকে বের করে আনতে সত্যিই অক্ষম। কলমের জোরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে মানুষ, সে সাহিত্যে বা সাংবাদিকতায় কোনও আস্থা বা আশ্রয় খুঁজে পায় না আর। সাহিত্যের গুণ বা পবিত্রতা রক্ষায় সোচ্চার সেই অর্বাচীনের দল যেমন ছড়া বা রম্যরচনাকে অন্ত্যজ সাহিত্য আখ্যা দিয়েছে একদিন, তাদেরই বদ্যন্যতায় সৃষ্টি হয়েছে নতুন শব্দ-সমষ্টি— পপুলার সাহিত্য। অর্থাৎ যে সাহিত্য মানুষ এখনও পড়ে, কেনে। যেমন রহস্য রোমাঞ্চ অলৌকিক গল্পগাঁথার এক পপুলার মার্কেট জমে উঠেছে এপার ওপার বাংলা জুড়ে— সম্ভবত এটাকেই আপাত মুক্তির বা বেঁচে থাকার পথ হিসেবে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন বই-দোকানিরা। অথচ দেখুন, রাজনীতি অর্থনীতি পরিবেশ সবকিছুতেই আজ চরম দুঃসময়— এই দুর্দশার ছবি কিন্তু ধরা পড়ছে না আজকের 'পপুলার' সাহিত্যে, যেটা চরম দুর্ভাগ্যজনক।

টিকে থাকার প্রথম কঠিন পাঁচ বছর পেরিয়ে 'এখন ডুয়ার্স' সাহিত্যে মনযোগী হয়েছে। শুরুতেই 'এখন ডুয়ার্স সাহিত্য ২০২০' সংকলন অভাবনীয় সাড়া পেয়েছে। এছাড়া এমাসেই আয়োজিত হয়েছে প্রথম ডুয়ার্স সাহিত্য উৎসব। কবিদের থেকেও আমরা গোড়ার দিকের দূরত্ব বজায় রেখেছি। এবার তাঁদের বেশ কয়েকজনকে গদ্যে নিয়ে আসবার চেষ্টা সফল হয়েছে, পাঠক তাঁদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। কবিতা নিয়েও আমাদের নতুন উদ্যোগ আসন্ন। এসব প্রচেষ্টার পেছনে মূল ভাবনা একটাই— নিজেদের জমিতে নিজেদের চাষ করে উৎপন্ন জৈব ফসলের কোনও বিকল্প হয় না। আর সেই উৎকর্ষ মানের ফসল যদি বিক্রয়যোগ্য হয় তবে তো কোনও কথাই নেই। সাহিত্যচর্চার মান না বাড়ালে কেবল গল্প-উপন্যাস-কবিতা নয়, কোনও বইপত্রই বিক্রয়যোগ্য হয় না— এই কঠিন বাস্তবকে মেনে না নিলে পড়ে থাকতে হবে সেই তিমিরেই।

তাই শত্রুভাবাপন্ন সেইসব বন্ধুদের সবিনয়ে জানাই, উত্তরের বইপত্র নিয়ে কারবার করবার জন্যই আমাদের আবির্ভাব, কোনও গোষ্ঠীবাজি বা কোনও সমাজ সাহিত্য কল্যাণের মহান ব্রত নিয়ে আমরা আসি নাই। অতএব যে লেখা বাজারে বিকোয়, পাঠক কেনে, কেবল সেসব নিয়েই আপাতত ফেরি করব হৈচৈ করব আমরা, পাঠকই আমাদের ঈশ্বর। আপনি আর যাই হোক আমাদের শত্রু হতে পারেন না, আপনার কলমে যদি সত্যিই জোর থাকে তবে একদিন আপনার সামনে করজোড়ে গিয়ে দাঁড়াবই। ততদিন সুস্থ থাকুন, লিখতে থাকুন, আর পড়তে থাকুন 'এখন ডুয়ার্স'।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি

বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির

অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার ৯৫৬৪৯৯৮৫৬১

জলপাইগুড়ি

ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

মালবাজার

সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫

চালসা

দিলীপ সরকার, চালসা মোড় ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি

রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল ৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া

বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

মাদারিহাট

জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) ৯৩৮২৯৭৭৬২৯

লাটাগুড়ি

সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি

দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা

অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

তুফানগঞ্জ

আনন্দবাজার বুক স্টল ৯৩৩৩৬৮৮৬৭১

দিনহাটা

হরিপদ রায় ৯৯৩২৬৩৯০৬৮

আলিপুরদুয়ার

দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

কোচবিহার

জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪

মালদা

অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৭৮৬৪৯৯৫৫১৫

বালুরঘাট

মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক

বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন।

মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

ষষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২০

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ বিরূপাক্ষ মিত্র

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।
অনিমা ভবন। শান্তি পাড়া।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের চিঠি ২

ধারাবাহিক প্রতিবেদন
সার্জেন রেনী'র ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি ৬

আসামের চিঠি
নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে জ্বলছে অসম ১০
শিলচরে শীত আসে ১১

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন
গান্ধী ও কোচবিহার রাজপরিবার ১২
দলতন্ত্র শিক্ষার সর্বনাশ ঘটিয়েছে ক্ষমতায় থাকতেই মেনে নিয়েছিলেন বামেরা ১৪

রাজনগরের রাজনীতি
রাজ্য থেকে জেলায় রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে যাত্রার সুফল কি মিলেছে? ১৬

কোচবিহার স্পেশাল
ইভনিং @ সাগর দিঘি স্কোয়্যার ১৮

ধারাবাহিক উপন্যাস
ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ৩০

ধারাবাহিক কাহিনি
তাজ্জব মহাভারত ৩৪

পর্যটন
বউ সাথে পথে পথে ২০
অনুপম অবসর ২২
ডুয়ার্সের চার্চগুলিতে প্রাক বড়দিন সুহানা সফর ২৬

এ নদী কেমন নদী
নদী বাঁচানোর আওয়াজ উঠছে দক্ষিণ দিনাজপুরে ২৪

গল্প
ডাইনি ৩৮

শ্রীমতি ডুয়ার্স
মায়াবতী জন্মান্তরেও অপরিবর্তিত এক স্ত্রী চরিত্র ৪৩

কবির কলমে
সুমন মল্লিক ৪৪

উত্তরের উপকথা
মহাকাব্যের লোককথা ৪৫

নিয়মিত বিভাগ
ফেসবুক পোস্ট ৪
খুচরো ডুয়ার্স ৫
রাসায়নিক রস ৪৬

সেরা পোস্ট

সেরা পোস্ট

দীপশিখা পোদ্দার
ডিসেম্বর ২৬

মানুষ নাকি মানুষকে আর বিশ্বাস করে না? শুনে

আমার হাসি পায়।

বাসে ট্রেনে প্লেনে সর্বত্র মানুষ অবলীলায় চালককে বিশ্বাস করে। অসুখ হলে বিশ্বাস করে নিজের প্রাণটা চিকিৎসকের হাতে তুলে দেয়। আয়াকে বিশ্বাস করে তার কাছে সন্তানকে রেখে নিশ্চিন্তে অফিস যায় বাবা-মা। নেতাকে বিশ্বাস করে ভোট দেয়। গুরুকে বিশ্বাস করে মন্ত্র গ্রহণ করে। আরও আরও কত....।

আসলে যা কিছু সহজাত, যাকিছু চোখ খুলে দেখা হয় না কখনও —সেখানে আমাদের কোনো প্রশ্ন জন্মায় না। আমরা চিরদিনই নির্দিষ্ট সীমায় দাঁড়িয়ে চোখ খুলি। ততটুকুই খুলি যতটুকু আমাদের অভ্যাস পারমিট করে। সেই অভ্যাসের ভেতরে দাঁড়িয়েই আমাদের যাবতীয় তর্ক ও তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ। যাবতীয় বার্তা ও বাতাস।

তার বাইরে পড়ে থাকে বিরাট প্রান্তর। যেখানে আমাদের কখনও পা-ই পড়ে না।

সোমেন ঘোষ
ডিসেম্বর ২৬

তুই তো curry সম pork ও

আমাকে যদি কোন বয়সে বড় বিখ্যাত লোক তুই বলে সম্বোধন করেন তাহলে আমি পাঁচজনকে ফলাও করে বলে বেড়াই। আবার যদি কোন ছোটবেলার বন্ধু পরে বিখ্যাত হয়ে যায় যার সঙ্গে তুই তোকারি সম্পর্ক ছিল সেটাও সকলকে হাবে ভাবে জানিয়ে দিই। ধরা যাক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। লোককে বলি, সুনীলদা আমাকে এত ভালবাসে যে তুই করে কথা বলে কিংবা

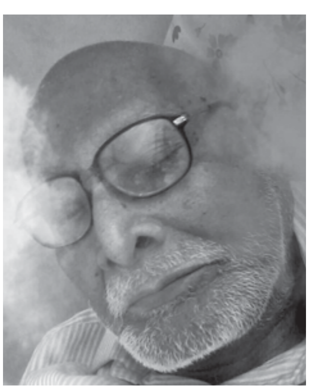

সুনীলের সঙ্গে আমার তুইতোকারি সম্পর্ক। কী ভাল যে লাগে বলতে!

আমি যদি কোন রিক্সাওলাকে তুই বলি তাহলে কি সে ফলাও করে বলে যে ঐ বুড়ো দাড়িওলা লোকটা আমাকে তুই করে কথা বলে? আবার যদি কোন ছোটবেলার বন্ধু রিক্সাওলা হয় তাহলে আমি কি বলি যে ঐ রিক্সাওলার সঙ্গে আমার তুই তোকারি সম্পর্ক। ইংরেজি ভাষায় এসব ঝামেলা নেই। রাণীকেও ইউ রাণীর চাপরাসিকেও ইউ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কাকে তুই তুমি বা আপনি বলব! বয়সে ছোটকে তুই বা তুমি বলতে পারি, কিন্তু হাঁটুর বয়সী bossকে কি তুই করে বলব? বয়সে ছোট ও মানে ছোটকে তুই বলতে পারি। কিন্তু বদমাশ প্রমোটারকে কী করে তুই বলব? আমার গিন্নী আবার সকলকেই আপনি করে কথা বলেন। আগে এর জন্য কয়েকজনকে অস্বস্তিতে পড়তেও দেখেছি। এখন লক্ষ্য করছি অনেকেই বলে থাকেন বিশেষ করে মেয়েরা। এখন আবার আদিবাসীদের মত বৌকেও বলছে, কী করে তোকে বলব! প্রশ্ন উঠবে, রিক্সাওলা বলে কি মানুষ নয়! নিশ্চয় মানুষ তবে সেইসঙ্গে রিক্সাওলাও বটে। বোধহয় একটু কম মানুষ। আপনি নিজেই অনুভব করতে পারবেন একজন রিক্সাওলার সঙ্গে এবং ওপরওলার সঙ্গে কথা বলার সময় আপনার বডি ল্যাঙ্গোয়েজ কীভাবে ভেতরে ভেতরে ফ্লাকচুয়েট করে! উন্নত দেশের লোকেরা বোধহয় আমাদের চেয়ে more equal. ঠিক জানি না house of lords আর house of commons এর তাৎপর্য কী !

যাই হোক আমার দুর্ভাগ্য যে আমাকে কোনদিন সুনীল গাঙ্গুলী তুই বলেন নি বা তাঁর সঙ্গে কোনদিন তুই তোকারি সম্পর্ক ছিল না।

অনুকূলকে চেনেন তো! সে বলত, তুই যদি আমাকে তুই তুই করে বলিস আমিও তোকে তুই তুই করে বলব।

সুতপা দাস
১৭ ডিসেম্বর

নেট-বন্দির রোজনামচা

গত পরশু রবিবার হলেও পেশাগত একটি জমায়েতে যোগদানের জন্যে বাড়ীর বাইরে যেতে হয়েছিল ঘরকুনো আমাকে। বিকেলে বাড়ীতে ঢোকার পর পরই দুঃসংবাদ, ইন্টারনেট সংযোগ অন্য আর পাঁচটি জেলার সাথে মালদাতেও বিচ্ছিন্ন থাকবে দুদিন!!

দুদিন আগে শেষ করেছি 'কালসন্দর্ভা', তারপর এত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে মন যে নতুন কিছু পড়তেই পারছি না।

রবিবার সন্ধ্যেবেলা, নটা'র পর, নেট সংযোগ পুরো বিচ্ছিন্ন হতে, খুলে বসলাম, দেবারতি মুখোপাধ্যায়ের 'দাশগুপ্ত ট্র্যাভেলস', শুক্রবার ডেলিভারি হলেও 'কালসন্দর্ভা' আবেশে আবরণ উন্মোচন করলেও বইটি আর খুলে দেখা হয় নি।

কর্পোরেট জগতের সাথে সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও প্রথম পরিচ্ছদ শেষ করতেই বুঝতে পারছিলাম ঐ জগতের পটভূমি হলেও সম্পূর্ণ অন্য স্বাদের একটি গল্প পড়তে চলেছি।

না, দুদিনে উপন্যাসটি শেষ করবার মনোবাসনা থাকলেও হয়ে ওঠেনি। চিটে গুড়ে মাছি পড়ার মত দেবারতি ঘাড় ধরে রাত সোয়াদুটো অব্দি পিঠ সোজা করে বসিয়ে রেখে পড়িয়ে নিয়েছেন তার আখ্যান, পাঠিকা তার ভগ্নস্বাস্থ্য, রাত জাগরনের সংবাদে পরিজন ও ডাক্তারের সম্ভাব্য রক্তচক্ষু সব আক্ষরিক অর্থেই ভুলে গিয়ে অতন্দ্র -আলোকপর্না- পিকলু- ফুলুমামা আর কেন্দ্রীয় চরিত্রের (নাম উহ্য থাক) সাথে ঘটনা প্রবাহে ভেসে গেছে।

সোমবার বহুবার চেষ্টা করলাম ইন্টারনেট সংযোগ ফিরলো কিনা পরীক্ষা করে দেখার। কাকস্য পরিবেদনা! কাকের মতোই পড়ে গিয়ে মনে ব্যথা, পড়ার মত বই হাতে নেই, অফিসের মেলে জ্বালাতন নেই, আর্থিক কাজ করবার যো নেই, ফেসবুকে হোয়াটস অ্যাপে ক্যালানো নেই করে ভি তো ক্যরে কোয়া! গ্যালারিতে জমে থাকা একগাদা রাবিশ সাফ করে 'নির্মল ফোন সন্ধ্যা' পালন করলাম।

সন্ধ্যেবেলার পরের ভাগে, কানেকশন বিনে বোকা ফোনের ডকুমেন্ট ফোল্ডার খুলে পেলাম ডাউনলোডিয়ে রাখা অরূপরতন! যারা এমন মায়াবী লেখার সাথে পরিচিত, তারা দুটো লাইন তুলে আনলেই বুঝে যাবেন এটি কার সৃষ্টি, এমনই স্বকীয় তার লেখনভঙ্গি আর শব্দচয়ন! আগে পড়ি নি তাঁকে, আমার বদ কিসমত! আমার আরও দুর্ভাগ্য তাঁর লেখা বিশ্লেষনের বৌদ্ধিক ক্ষমতা আমার নেই, আছে শুধু অনুভব যা চোখ বেয়ে উপচে পড়া ধারায় শ্রদ্ধার্ঘ্য রাখতে পারে বয়োকনিষ্ঠ লেখকের জন্যে!

"... এই হলো জগতের রীতি। এক অদ্ভুত চক্র। এই চক্র চলতেই থাকে। এই একই চক্র। কেবল মানুষগুলো ভিন্ন। এই চক্রের চালক হচ্ছে সময়। সময় তোমাকে বীজ করবে, চারা করবে, গাছ করবে, বিশাল ছায়াদায়ী বটবৃক্ষ করবে। তারপর ধীরে ধীরে বিস্তৃত শেকড় জুড়ে ঘুনপোকা ধরবে। ডালপালা পাতারা ক্রমশই শুকিয়ে ঝরে পড়বে। তারপর একসময় মৃত্যু। এই গল্প চলতেই থাকে। অসীম মহাকালের গল্প।..." (আরশিনগর)

কোথায় যেন শ্রদ্ধেয় কুলদা রায়ের লেখার কাব্যময়তা ছুঁয়ে যায়!

সাদাত হোসেইন, নতজানু হলাম!

খুচরো ডুয়ার্স

কিনো না

কোচরাজ্যে নধর কমলালেবু পাইয়া পাব্লিক লাফাইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু ফাইনালি ঠকিয়াছে। নাগপুর হইতে পেশিবহুল কমলা আসিয়া বাজার আলো করিয়াছে কোচরাজ্যে। দেখিলেই ছাড়াইয়া খাইতে সাধ হয়। তা খোসা ছাড়াইবার সময় সন্দেহ যে হয় নাই তাহা নহে। এত মোটা চামড়া হয় নাকি কমলালেবুর! ঠিক যেন গন্ডারের। পাব্লিক ভাবিল, নাগপুর হইতে আগত গন্ডারচর্মেই তো বাঙলা ছাইয়া গেল —কমলাই বা বাদ যায় কেন? খোসা ছাড়াইয়া পাব্লিক ইহার পর দিল কোয়ায় কামড়। উরিবাবা! এ কী রকম রস? নবরসের কোনোটার সঙ্গেই যে মিলিতেছে না! আর অমন ফোলা ফোলা কোয়ায় রস এত কম থাকে কী ভাবে? তখন কে জানি কহিল, আরে রামো! উহা তো কমলা নহে। উহাকে বলে কিনো। ভাল করিয়া চিনো। ডুয়ার্সে অতীতে বহু কমলাভোগীকে বোকা বানাইয়া কোচরাজ্যে আসিয়াছে। নাগপুরে কমলা ফলিবার কথা ভূগোলেও নাই, বেদেও নাই।

পাত্তামূল

জব্বর ঠান্ডা পড়িয়াছে। বৈকুণ্ঠপুরে শৈত্য প্রবাহ চলিতেছে। হিমেল হাওয়ায় গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব পর্যন্ত জমিয়া গিয়াছে। ইত্যবসরে জয়চাঁদবাবু ঠিক করিয়াছিলেন ‘পাত্তা প্রদান কর্মসূচি পালন’ করিবেন। আবার কহিতেছি, পাট্টা নহে, পাত্তা —যাহার অভাবে স্বয়ং রাজ্যপাল চৌধুরি হাহাকার করিতেছেন, সেই পাত্তা। বৈকুণ্ঠপুরে জোর ফিসফাস যে স্বয়ং জিলাধিপতিই পাত্তা পাইতেছেন না। এইরূপ পাত্তা না পাইবার তালিকা বেশ বড়। পাত্তা না পাইবার জ্বালা জয়চাঁদবাবু জানেন। ইন্দ্রদেবের নিকট অমাত্য পদখানি খোয়াইবার পর কেহই পাত্তা দেয় নাই। দলের রথীমহারথীর পাত্তা না পাইলে অন্যের জমিতে শিবির বসাইতে দেরি করিবে না। এই তো সেদিন পূণ্য প্রভাতে রাজ্যের মহাফুল শিরোমণি প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে ঘরে বাইরে উপন্যাস হইতে উঠিয়া আসিল নিখিলেশসখা। ছোটফুল শিরোমণি না হইলে সখা নির্বাচিত ব্যক্তি। বলা নাই কওয়া নাই জনসমক্ষে সে কিনা ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল মহাফুলের চরণপদ্মে! ইহার পরও যদি পাত্তা প্রদান অনুষ্ঠান না করা যায় তবে ফুলান্তর রোধ করিবে কে? ঋষি বলিয়াছেন, পাত্তাই মূলের মূল। জয়চাঁদ তাহা জানেন।

গোখাঁড়া

যখন এনার্সি ফুটিবে ফুটিবে তখন রাজুবাবু পাহাড়ে যেই সব অভয়বাণী শুনাইয়াছিলেন তাহা সব সভয়বাণী হইয়া দলীয় কার্যালয়ে ফিরিয়া আসিতেছে। এনার্সি তালিকা বাহির হইবার পর থেকেই রাজুবাবুর জোর ঠান্ডা লাগিয়াছে। এক লক্ষ গোর্খার নাম বাদ গিয়াছে যাহা মোটেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত করিতেছে না। স্বরাষ্ট্র কোটালের অমিতাক্ষর ছন্দে তিনি আতান্তরে পড়িয়াছেন। সকালে উঠিয়া চা খাইবার আগেই হোয়াটস আপ আসিতেছে যাহাতে লিখা, অদ্য কে কেদল ছাড়িবে। দেখিতে দেখিতে নাকি একশত পাঁচ জন দল ছাড়িয়া বিপক্ষ শিবির বসিয়া চা খাইতেছে। যদিও রাজুবাবুর সভাপতি কহিতেছে, দলত্যাগীরা সকলেই নিষ্ক্রিয়। তাহা শুনিয়া দলত্যাগীরা মোমো খাইতে খাইতে বলিতেছে, এইবার সক্রিয় হইব। অন্যদিকে গোর্খাল্যান্ডেরও কোন খবর নাই। রাজুবাবু জানিলেও তাঁহার প্রভূরা যেন গোর্খাল্যান্ড শব্দ শুনেই নাই! পরন্তু গোর্খারাই যদি বিদেশি হইয়া যায় তবে কেবল ল্যান্ড লইয়া কী হইবে? তাই রাজু বন গয়া কনফিউজড্। কবি পুরন্দর ভাট তাঁহাকে দিবার জন্য একখানি ক্লাসিকাল দ্বিপদী পাঠাইয়াছেন। উহা শুনুন — ‘ঝুলছে রাজু মাথার ওপর তোর খাঁড়া/ তোর ওপরেই চটল বলে গোর্খারা।’

ফ্রম ফড়ে টু দালাল

গর্ম্মেন্ট বলিয়াছে কৃষক ধান ফলাইলে তাহা কিনিবে। তাই শুনে কৃষক গিয়াছে ধান লইয়া। গর্ম্মেন্ট তাঁহাকে বলিয়াছে, জমির খতিয়ান কই? খতিয়ান দেখাও। খতিয়ান দেখালে ধান কিনিব। না দেখাইলে ভাগাইয়া দিব। শুনিয়া কৃষক গিয়াছে ভূমি আপিস খতিয়ান আনিতে। গিয়া দেখে দালাল দাঁড়াইয়া আছে। দালাল কহিছে, আইস কৃষকভাই। খতিয়ান দিব। তবে টাকা লাগিবে। মিউটেশন না থাকিলে বেশি লাগিবে। তবে কম লাগিলেও হাজার তো লাগিবেই! শুনিয়া কৃষকের মাথায় বজ্রাঘাত। ফড়ের হাত হইতে রক্ষা পাবে বলিয়া সে গিয়াছিল গর্ম্মেন্টকে ধান বেচিতে। গর্ম্মেন্ট বলিল, খতিয়ান আনো। খতিয়ান আনিতে খসিল হাজার। ডুয়ার্সের কৃষক তাই ভাবিতেছে, তবে কি ফড়েই তো ভাল ছিল? নাকি দালালিতে কম ঠকিব?

গন্ডারিয়া

এক দেশ, এক আইন, এক বিবাহ লইয়া লাফালাফি করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে গন্ডারের কী আসে যায়? জঙ্গলে গন্ডার পিছু তিনখানা গন্ডারী থাকিতেই হইবে। অনুপাত কমিলেই গোষ্ঠি, থুড়ি, শৃঙ্গদ্বন্দ্ব। এই তো কিছুদিন আগে গরুমারার সেলেব্রিটি গন্ডার ঘাড়মোটা পটল তুলিয়াছে। গার্লফ্রেন্ড লইয়া ঘোরতর শৃঙ্গদ্বন্দ্বে মরিয়াছে হতভাগা। ঘাড়মোটার শোক কমিতে না কমিতেই সদ্য সদ্য ‘লাভ জেহাদ’-এ আক্রান্ত হইয়া লাভ শহিদ হইয়াছে আরও একজন। অনুমান, গরুমারায় নতুন কোনও এইট প্যাক হিরো আসিয়াছে। গন্ডারীর দখল লইয়া এলাকার প্রবীণ নেতাদের ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া অচিরেই তিনি কেষ্ট ঠাকুরের রাইনো সংস্করণ হইয়া গোপিনী গন্ডারীদের বগলদাবা করিয়া কোচরাজ্যে রাস দেখিতে যাইবেন। লাভ শহিদের তালিকায় পর পর দুই গন্ডারের নাম উঠিতেই বনকর্তাদের চুল শৃঙ্গের ন্যায় খাড়া হইয়াছে। জঙ্গলে ‘তিন ফুল এক মালি’ নীতি বজায় রাখিবার জন্য তাহারা বিস্তর মিটিং করিতেছে। কিন্তু গন্ডার মিটিং বুঝে না। তিনখানা প্রেমিকা না পাইলে তাহারা গর্ম্মেন্টের অনুপ্রেরণায় শান্ত থাকিবে —এ কথা চিন্তা করিবার কোনও কারণ নাই। গন্ডারের চিন্তন শিবির হয় না।

হিসুমহল

দুই হাজার কোটি টাকা খর্চা করিয়া গাজলডোবায় ভোরের আলো ফুটাইবার কাজে মহোৎসাহ লক্ষ্য করা যাইতেছে কিন্তু দুই-চার লাখ খর্চা করিয়া পাব্লিকের হাগুমুতু করিবার আয়োজন নাই। পাব্লিক ভোরের আলোতে হৈ হৈ করিয়া সেলফি তুলিতেছে,

নৌকা চড়িতেছে, বোরলি খাইতেছে কিন্তু মুতিবার তরে ছুটিতেছে ফাঁকা জায়গার দিকে। ইহা অবশ্য নতুন কথা নহে। অনুপ্রেরণার জোয়ারে ঘড়িস্তম্ভ হয়, ত্রিফলা জ্বলে, ইয়া ইয়া বিল্ডিং উঠে, রামধনু আলো জ্বলে। পাব্লিক হিসু চাপিয়া হাসি হাসি মুখে সেই সব দেখিয়া আমোদিত হয়। তাহার পর আলোকিত ভবনের পিছনের গলিতে হিসুমহল খুঁজিয়া বেড়ায়। ভাবিয়া দেখিলাম, অনুপ্রাণিত শৌচাগার বলিয়া কিছু হয় না এবং বিরোধিমত মানিলে যদি গর্ম্মেন্ট উল্টায় তবে গোমাতার ন্যায় যত্রতত্র হিসু করিবার আইন পাস হইতে পারে। এত যে মহাপুরুষের কথা পড়িয়াছ —তাঁহাদের শৌচকর্ম করিতে হইতে এ কথা পড়িয়াছ কি? তবে? উন্নয়নের হস্ত ধরো/ হিসু চেপে ফুর্তি করো।

যাহা হউক। নতুন বৎসর পড়িয়াছে। বাজারে মহাতামাক অমিল হইতেছে। মহাকবি পুরন্দর ভাট আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছে, ‘ফেলিয়া হাতের হাজার কাজ/ পুলিশ পোড়ায় গাঁজার গাছ’। আমি তাঁহাকে ডুয়ার্সের কিছু সংবাদ অবলম্বনে নিউজ পোয়েট্রি লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি তাঁহার হোয়াটস আপ আসিল। কবিতাগুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

১) দিনহাটাতে প্রতিবাদ/ ঘোর জনশ্রুতি/ হিন্দু লুঙ্গি পরি হাঁটে/ মুসলিমেতে ধুতি।

২) বালুরঘাটে রোমিওরা ইলু ইলু কয়/ পুলিশ ঠ্যাঙানি দিলে ’পরে শান্ত হয়।

৩) ময়নাগুড়ির পথে বালুভরা ডাম্পার/ আটকায়ে কারা জানি তোলা তোলে বাম্পার।

৪) হাটবার আসে তবু শীত নাহি কমে/ মালবাজারেতে হাট মোটে নাহি জমে।

৫) জলপাইতে দেড়শো বছর/ পটকা ফাটে তাই/ এমেলে আর এমপি-কে/ কেহ ডাকে নাই।

কলম সিং

ধারাবাহিক প্রতিবেদন। তৃতীয় অধ্যায়। ১ম ভাগ

সার্জন রেনী'র ‘ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি’

ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের ঐতিহাসিক লিপি

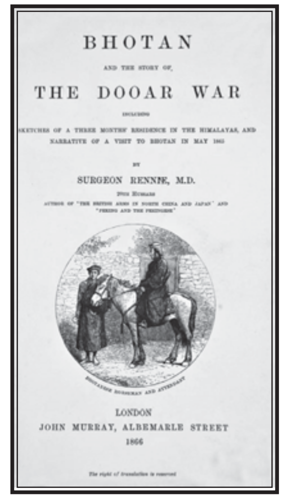
BHOTAN

AND THE STORY OF

THE DOOAR WAR

INCLUDING

SKETCHES OF A THREE MONTHS' RESIDENCE IN THE HIMALAYAS, AND NARRATIVE OF A VISIT TO BHOTAN IN MAY

BY

SURGEON RENNIE, M.D.

LONDON

JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET

1866

উমেশ শর্মা

ভারতে ব্রিটিশবাহিনিতে কর্মরত এক মিলিটারি সার্জন চারমাসের ছুটিতে দেশে ফিরেছিলেন। ভুটান নামক আজব দেশটির কথা ইওরোপের মানুষকে জানানোর ইচ্ছা ছিল তাঁর। ব্যস লিখে ফেললেন একটা বই। সার্জন রেনীর ‘ভুটান এন্ড দ্য স্টোরি অব্ দ্য ডুয়ার ওয়ার’ বইটি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। আজকের আগ্রহী বাংলাভাষীদের সুবিধার্থে এবং জনপদের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের তাগিদে ওই সুবিশাল গ্রন্থটি আক্ষরিক অনুবাদে নয়, ভাবানুবাদে মনস্ক পাঠকের দরবারে নিবেদিত হল, ধারাবাহিক হিসেবে।

পারোর পেনলো ২৩শে জানুয়ারিতে ছেবু লামাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। পেনলোর সঙ্গে ছিলেন পারোর প্রাক্তন পেনলো তথা তাঁর শ্বশুরমশাই। ছেবু লামা সেখানে যেতেই ইংরেজদের ওদেশে নিয়ে যাবার কাজে সহায়তা করার জন্য প্রচণ্ড ধমক দিয়েছিলেন। তবে, দু'জনের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর পেনলোর ধারণা হয়েছিল যে, মিশনের আগমনে ভাল ফল হবে। কিন্তু, তিনি জানান, ভুটান সরকার যেহেতু মিশনকে ওই দেশে প্রবেশের অনুমতি দেননি, তাই মি. ইডেনের উচিত হবে চারদিন পারোতেই থাকা। তাহলে, পেনলো যতটা সম্ভব মিশনকে সাহায্য করবেন। তিনি একথাও বলেছিলেন যে, মিশন পুনাখায় যেতে পারে কিন্তু কোনও লাভ হবে না। ভুটানে নামমাত্র রাজা, দেবরাজার কোনও কর্তৃত্বই নেই। পশ্চিম ভুটানের পারোর পেনলোই প্রকৃত শাসক। তিনিই ওই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবার যোগ্য আধিকারিক।

মি. ইডেন ওই যুক্তি ও পরামর্শ না মেনে বলেছিলেন যে, যিনি যত বড় আধিকারিকই হোন না কেন, সর্বোচ্চ আধিকারিক ছাড়া তিনি কারোর সঙ্গেই সমঝোতা করবেন না। আর, পেনলোর পরামর্শ মত তিনি পারোতে চারদিন অপেক্ষা করতেই পারেন।

দেবরাজা যে প্রকৃতপক্ষে পুতুলরাজা, কথাটা মিথ্যে নয়। মি. ইডেন যখন দার্জিলিং থেকে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ওই সময়ে আগদু ফোরাং-এর গর্ভনরশিপ পুনাখার জুঙ্পেনকে না দেওয়ার জন্য তিনি বিদ্রোহী হয়ে দেবরাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন।

পারোর পূর্ব প্রাক্তন পেনলোর পুত্র ছিলেন সদ্য প্রাক্তন পেনলো। তিনি তখন ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পূর্বতন প্রাক্তন পেনলোর মৃত্যুর পর তিনি পেনলো পদ লাভ করেছিলেন। বর্তমান পেনলো তখন ছিলেন অল্পবয়স্ক। ওই যুবক আগদু ফোরাং দুর্গের জুঙ্পেনের পক্ষে বিদ্রোহী হয়ে তার সৎ পিতা পারোর পেনলোকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন এবং পেনলো পদ লাভ করেছিলেন। সৎ পুত্রকে ক্ষমতায় বসিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজে ক্ষমতা ভোগ করতে থাকেন।

মিশনটি পারোতে অবস্থানকালে যে আতিথ্য ও সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েছিল, বাস্তবে সেটির বিপরীত ঘটনাই ঘটেছিল। মিশনের কোনও সেবাকর্মী মাথায় টুপি পরে বাইরে এলে তাকে জরিমানা করা হত। এমন কী মি. ইডেন ও অন্যান্য আধিকারিকেরা পুলিশকর্তার আবাসের কাছাকাছি টুপি পরে খচ্চরের পিঠে চড়ে উপস্থিত হলে, তাঁদেরকেও জরিমানা করার উপক্রম হয়েছিল। যে সব গ্রামবাসী শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছিল, তাদেরকেও শাস্তি প্রদান করা হতে থাকে। এমন দুর্ব্যবহার বাড়তেই থাকে। আবার বিপরীতভাবে পেনলোর সংবাদবাহকেরা মিশনকে পুনাখায় নিয়ে যাবার কথা মুখে বললেও, রওনা দেবার ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকে।

মি. ইডেন একজন কর্মকর্তাকে ডেকে জানিয়েছিলেন, এ রূপ ব্যবহার তারা বেশিক্ষণ সহ্য করবেন না। যদি পুনখায় নিয়ে যাবার জন্য কোনও উদ্যোগ কর্মকর্তারা গ্রহণ না করেন, তবে তিনি দার্জিলিং-এ ফিরে যাবেন।

ওই ধমকে কাজ হয়েছিল। পেনলো এসে দেখা করে জানিয়েছিলেন যে, তিনি সংবাদবাহকদের ওই দলটিকে নিয়ে পুনাখায় যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে, একথা জানা যায় যে, মিশনের সঙ্গে তারা যে অবন্ধুসুলভ আচরণ করেছিল, তা প্রাক্তন পেনলোর গুণধর্ম অনুসারে। আর তেমন হবে না।

ওই ব্যাখ্যাও মি. ইডেনের কাছে ছলনা বলেই মনে হয়েছিল। অবশ্য বিরক্তিকর পরিস্থিতি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। প্রাক্তন পেনলো একদিন এসে মি. ইডেনের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। আচরণ ছিল বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ। তিনি মি. ইডেনের অনেকটাই সহায়ক হয়েও উঠেছিলেন। ভুটান সরকারের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে তিনি কিছু তথ্যও প্রদান করেছিলেন।

তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, মিশনের আগমনকে নিয়ে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, তার মূল কারণ হল ভুটানের অরাজক অবস্থা। আগের দেবরাজাকে জোর করে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছিল। টংসোর পেনলো এখনও অন্যায়রূপে সব কর্তৃত্ব হস্তগত করে রাখবার চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁর হাতে বর্তমানের ধর্মরাজা ও দেবরাজা সামান্য পুতুলমাত্র। যোগ্যতা ও ক্ষমতা সম্পন্ন একজনও সংসদে নেই। টংসোর পেনলোর লোকজন আদালত থেকে সর্বত্রই ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছেন। ওই পেনলোর পরামর্শদাতা হলেন একজন হিন্দুস্তানী ভদ্রলোক। সিপাহী বিদ্রোহের পরে লোকটি ভুটানে এসেছিলেন। তিনি ‘দ্য কিংস অব দিল্লী, লাহোর অ্যান্ড নেপাল’ অর্থজ্ঞাপক সিলমোহর যুক্ত কিছু কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। উনি ভুটান সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, ভুটান থেকে ইংরেজ বিতাড়নের কাজে তাঁকেও যেন অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। মি. ইডেনকে তিনি আরও বলেন যে, তার সব কথা প্রমাণিত হবে। তবে মি. ইডেনকে মনে রাখতে হবে, ক্ষমতাসীন সরকার যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক না কেন, পেনলো তার জন্য দায়ী নন। তিনি তো মিশনকে জোর করে ফেরৎ পাঠানোর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিলেন। তবুও পুনাখায় যদি কোনও গন্ডগোল হয়, তবে তিনি মি. ইডেনকে সাহায্য করতে দ্বিধা করবেন না।

পারো দুর্গ

বর্তমান ও প্রাক্তন পেনলোর তৎকালীন আবাসস্থল পারো দুর্গটি একটি আকর্ষণীয় প্রাসাদ। অনেকটা স্থান জুড়ে ভুটানি স্থাপত্যকলার অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত

ওই প্রাসাদটি নির্মিত হয়েছিল। 'এটি একটি সমতল বর্গক্ষেত্রের চারদিকে চতুষ্কোণাকৃতি প্রাসাদ। মধ্যেকার ফাঁকা জায়গায় সাততলা উঁচু একটি টাওয়ার। ওই গম্বুজের চারপাশে তামার পাতে মোড়া, চূড়াটিও তামার। প্রাসাদের বহির্বিভাগ পাঁচতলা। উপরের তিনটি তলায় বসবাসের উপযোগী ঘরদুয়ার। নিচের তলা দুটি শষ্যাগার ও ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নিচতলার দেওয়ালে ছোট ফুটো রাখা হয়েছে, ওই ছিদ্রপথে গুলি বা তির বর্ষণ করে নিরাপত্তা রক্ষা করা হয়। উপরতলাগুলিতে বড় বড় জানালা। বেশিরভাগ ঘরের সামনে ছিল প্রশস্ত বারান্দাও। পুব দিক থেকে দুর্গে প্রবেশ পথ। একটা খালের উপরে ছোট সেতু পেরিয়ে দুর্গে ঢুকতে হয়। দুর্গের দ্বার রক্ষক বেশ তাগড়াই এক যুবক। দুর্গের বহির্বিভাগের ঘরগুলির চাইতে মূল অংশটি বেশ উঁচু। ওই দুর্গ প্রাসাদটিকে সুসজ্জিত ও রঙের পালিশে সমুজ্জল রাখা হয়েছে। লোহা ও পাথরের ফলকে সুন্দরভাবে ধর্মীয় বাণী খোদাই করে এবং সোনালি রঙে পালিশ করে রাখা হয়েছে। দুর্গদ্বারে বেশ কয়েকটি খাঁচায় কানঝোলা চারটে বড় বড় তিব্বতি বাঘা কুকুর রাখা হয়েছিল।' দুর্গে ঢুকে যে জিনিসটি প্রথমে নজর কেড়েছিল, সেটি হল দশ ফুট উঁচু গোলাকার একটা স্তম্ভব (সিলিন্ডার) যেটি একটা বড় হাতল দিয়ে ঘোরানো হয় এবং সেটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, একবার ঘোরালে একটা ঘণ্টা বেজে ওঠে। পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের সময়ে, প্রার্থনার সময়ে যান্ত্রিকভাবে ঘোরানো হয় সেটি।

একজন দর্শনার্থী যখন রাজদরবারে হাজির হবেন, তখন তিনি আবিষ্কার করবেন যে তিনি তিনতলায় হাজির হয়েছেন। 'কারণ দুর্গটি একটি ছোট পাহাড়ের উপর নির্মিত হওয়ায়, নিচতলার সিঁড়িগুলোর শেষ প্রান্তের উপরে আবার সিঁড়ি তুলে বাইরের উঠোন থেকে মিনারের মধ্যভাগে পৌঁছানো যেত।' বারান্দা থেকে নিচের যে কোনও জায়গায় গুলি চালানো যেত। কিন্তু রসদ ঘরের ভেতর দিয়ে না গিয়ে যদি অন্য পথে বেরিয়ে যাবার কেউ চেষ্টা করত, তবে অবধারিতভাবে তাকে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে হত।

অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকে প্রথমে বাঁ দিকে যেতে হবে এবং তারপর ডান দিকে একটা বড় সুসজ্জিত পাকা এবং কারুকার্যময় খোলা জায়গায় পৌঁছানো যেত। সেখান থেকে এক গুচ্ছ কক্ষ বাঁয়ে দেখা যাবে এবং সেগুলিতে প্রাসাদের ভদ্রমহিলাদের আত্মীয় স্বজনের থাকার ব্যবস্থা আছে। ওই ঘরগুলোর শেষে দ্বিতীয় একটি ছোট্ট প্রবেশপথ আছে এবং বাঁ দিকের ঘরগুলো প্রাক্তন পেনলোর দখলে। তারপরে পৌঁছে যাওয়া যাবে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে একটি সুপ্রশস্থ ঘরে। সেখানে তাঁর অনুগামীরা থাকেন। এর পরের একটি লম্বা ঘরে সৈনিকদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ওখানে পেনলোর একজন সেক্রেটারি সব সময়ে হাজির থাকেন। ওই হলঘরের নিচে পেনলোর সভাকক্ষ। আকারে বেশ বড় ও মনোহর। পুরনো ইতিহাস ঘাটলে জানা যাবে যে, তিব্বতি ও চিনা সংমিশ্রণে ভুটিয়াদের গৃহসজ্জার রীতি অত্যন্ত প্রাচীন।

ঘরের কড়িকাঠগুলো নীল, কমলা ও সোনালি রঙে রঞ্জিত এবং তাঁদের ধর্মীয় প্রিয় চিত্রণ চিনা ড্রাগনের মূর্তি সেখানে চিত্রিত। ধনুকাকৃতি সারি সারি খিলানের উপর ছাদটি স্থাপিত। গোটা ঘর জুড়ে খিলান থেকে ঝুলনো তির, তূণীর, লোহার পালিশ করা শিরস্ত্রাণ, তরবারি, বাজি-পটকা, বক্ষাবরণী বর্ম, চিনা লণ্ঠন, পতাকা, রেশমি রুমাল প্রভৃতি। সেগুলো তিব্বতের মহাধর্মগুরু লামার দ্বারা উৎসর্গীকৃত। সবগুলিই রুচিসম্মতভাবে সাজান ছিল।'

দুর্গের দেয়ালগুলি বেশ পুরু এবং ছোট ছোট পাথরে গাথা। সেগুলো গোড়ার দিকে চওড়া এবং ক্রমশ প্রস্থ কমে এসেছে। যে সময়ে মি. ইডেন সেখানে গিয়েছিলেন, ওই সময়ে শিবিরে ছিল ২৫০ জনের মত সৈন্য। যদিও সেখানে ৪০০ জন সৈনিকের থাকার কথা।

প্রত্যেক গ্রাম থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে লোককে সেনাদলে পাঠাতে হত। সেনবাহিনীতে কমপক্ষে সাত বছর থাকতেই হবে। যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার পূর্বে কেউ পালিয়ে যেত, তবে তাকে ৭০ টাকা জরিমানা দিতে হত। বাস্তবিক পক্ষে সেনাবাহিনী থেকে কেউ পালাতে চাইত না। সেনারা বেতন না পেলেও খাদ্য ও পোশাক পেত। আর পেত লুণ্ঠনের রাজকীয় অধিকার। এজন্য তারা সাধারণ প্রজাদেরও ভয় দেখিয়ে লুঠপাট করত।

সেনাদের কুচকাওয়াজের কোনও নিয়মনীতি ছিল না। এমনকি খারাপ ভাবে বলা যায় যে, যে বন্দুকটি তারা বহন করত, সেটি চালানোর উপযুক্ত শিক্ষা তাদের ছিল না। দুর্গ সংস্কারের কাজে, নির্মাণের কাজে, সেতু বা বাঁধ প্রদানের কাজে সেনারা নিয়োজিত হত। সত্যি কথা বলতে কী, ওই সব কাজে তাদের দক্ষতা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বেশ কয়েকটা সেতু দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করা যায়। প্রবেশ পথ পাথরের চাই দিয়ে সাজান। এর পরে সুবৃহৎ টাওয়ার। ওই টাওয়ারে রাতে সেতু রক্ষার জন্য একজন রক্ষী থাকে। সেতুগুলি কাঠের মোটা তক্তা দিয়ে তৈরি। পনের ফুট ধনুকাকৃতি খিলানে 'ওম্ মণিপদ্মে হুম্' বাণী খোদিত। রঞ্জিত খিলানের উপরে কাঠের ছাদ।

সেতু থেকে দুর্গ পর্যন্ত পথটুকু গোটাটাই পাথর বিছান এবং অর্ধপথে একটি পতাকা টাঙান ছিল। এর পরের পথটুকুতে কেউ ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারতেন না। এমনকি পেনলোও ওই নিয়ম মেনে চলতেন। একই ধরনের বিধিনিষেধ প্রাসাদ থেকে বের হবার সময়েও প্রযোজ্য হত। এ নিয়ম পিকিং (বেইজিং)-এর রাজকীয় প্রাসাদ ও বৌদ্ধ মঠগুলিতেও প্রচলিত ছিল। পাথরের চাঁইয়ের উপরে অশ্বারোহণের বিধিনিষেধগুলি লিপিবদ্ধ ছিল। সাধারণত চিনা, মাঞ্চু, মোঙ্গলিয়ান ও তিব্বতি ভাষায় ছিল ওইসব লিপি।

ঘরগুলোর শেষে দ্বিতীয় একটি ছোট্ট প্রবেশপথ আছে এবং বাঁ দিকের ঘরগুলো প্রাক্তন পেনলোর দখলে। তারপরে পৌঁছে যাওয়া যাবে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে একটি সুপ্রশস্থ ঘরে। সেখানে তাঁর অনুগামীরা থাকেন। এর পরের একটি লম্বা ঘরে সৈনিকদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ওখানে পেনলোর একজন সেক্রেটারি সব সময়ে হাজির থাকেন। ওই হলঘরের নিচে পেনলোর সভাকক্ষ। পুরনো ইতিহাস ঘাটলে জানা যাবে যে, তিব্বতি ও চিনা সংমিশ্রণে ভুটিয়াদের গৃহসজ্জার রীতি অত্যন্ত প্রাচীন।

দুর্গের ভেতরেও একটি বৌদ্ধমঠ ছিল। ওই মঠে ৭০ জনের মত ভিক্ষু ছিলেন এবং সবাই তাঁদের সম্মান জানাতেন। মিশন ওই সময়ে তাঁদেরকে পারোতে বার্ষিক অশ্বক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানে সাফল্য কামনার বাণী উচ্চারণ করতে দেখেছিল। সরকারি অনুদান হিসেবে তাঁরাও খাদ্য ও বস্ত্রাদি পেতেন। সুবৃহৎ দুর্গের সর্বোচ্চ তলায় ছয়টি ছোট ছোট নজরমিনারের কাজে ব্যবহৃত হত।

পারোর পরিবেশ

দুর্গ থেকে পারো নগর এক পোয়া মাইল দূরে ছিল। নগরে ছিল প্রায় তিরিশটি বাড়ি। চতুষ্কোণ বাড়িগুলি পাথর দিয়ে তৈরি ও তিনতলা। নদীর তীরে একটা সুপ্রশস্ত চৌকোণা চাতালে বসত বাজার। ওই বাজারে প্রতিদিন সন্ধেবেলায় দুই আড়াইশো লোক বেচাকেনা করতে আসতেন। ওই বর্গাকার বাজারের মাঝখানে একটি সুসজ্জিত ও অলংকৃত পাকা বাড়িতে একজন পুলিশ আধিকারিক বসতেন। বাজারের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখাই ছিল তাঁর কাজ।

ইডেন লিখেছেন, 'ওই বাজারে কেউ ঘোড়ায় চড়ে এবং টুপি মাথায় দিয়ে আসতে পারতেন না। দারোগার সাথে আমাদের কয়েকবার ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছিল। কারণ, আমরা ঘোড়া থেকে নামতে রাজি ছিলাম না। ওই ব্যবস্থায় যে যুক্তি দেখান হয়েছিল তা সভ্য সমাজে অচল। বিদেশি ইংরেজদের যা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাতে এরকম ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করাই রীতি। কিন্তু একথাও সত্যি যে, প্রাচ্য দেশের সনাতন সংস্কারকেও পদদলিত করা উচিত নয়। এটা যদি পারো নগরীর বাণিজ্যকেন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন হয়ে থাকে, তাহলে ওই আইন ভাঙা বিধেয় নয়। সুরক্ষাই যদি প্রধান বিবেচ্য হয়ে থাকে, তাহলে শারীরিক তল্লাশি চালানোটা বেশি যুক্তিযুক্ত। তাঁদের পদমর্যাদার সাথে সংহতির অভাবে যে ভান আছে, তা সংশোধন না করার ফলে অযথা গোলমাল সৃষ্টি হচ্ছে।

বাজারের লাগোয়া স্থানে একটি সুদৃশ্য প্রবেশ তোরণ আছে। ওই প্রবেশদ্বারের দেওয়ালে ও ছাদে চিনা প্রাচীন চিত্রাদি সুন্দরভাবে চিত্রিত ছিল। আপাতনজরে মনে হয়, সেগুলি বহু বছর আগে আঁকা হয়েছিল। তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র, ফাগ্রি যাবার রাস্তার উপরেও ছিল তেমন প্রবেশদ্বার। পাত ছু নদীর উপত্যকাভূমি দিয়ে ওই রাজপথটি ফাগ্রি গিয়েছে। ওই পথ ধরেই টার্নার মিশন তিব্বতে গিয়েছিল।'

মি. ইডেন এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'অবস্থানের কারণে পারো প্রাচ্যের অন্যতম বৃহৎ শহরে পরিণত হতে পারত। কারণ, সম্পূর্ণরূপে সমতলে অবস্থিত এই শহর। নিম্ন অঞ্চলের দেশগুলোর সহজে প্রবেশাধিকারের সুযোগ আছে এ শহরে। এ শহরের চারপাশের জনপদে প্রচুর পরিমাণে

ধান ও গমের ফলন হয়ে থাকে। তিব্বতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোর মধ্যে অন্যতম এই বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে দুটি সহজ পথ তিব্বত, চিন, তাতার ও ভারতে এটি করমুক্ত বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা এনে দিতে পারত। সাধারণ কাপড়-চোপড়, তুলা জাত সামগ্রী, ধান-চাল, ছুরি-কাঁচি, চা, প্রবাল, মশলাপাতি, দড়ি দড়া, চামরা এবং ইউরোপে প্রস্তুত বিভিন্ন বস্তুসামগ্রী এখানে এনে বিনিময়ে লবণ, মৃগনাভি, স্বর্ণরেণু, সোহাগা, পশম প্রভৃতি বিদেশে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু ভুটান সরকার একজন তিব্বতিকেও সীমান্ত অতিক্রম করে সে দেশে প্রবেশের ঝুঁকি গ্রহণে রাজি নয়। আর সেজন্য এখানে তেমন বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। পারোর সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগও নেই।

পারো থেকে তিব্বতগামী রাস্তায় সাত মাইল দূরে দাক্কা জঙ্ নামে একটি দুর্গ আছে। তিব্বত আক্রমণ করলে যাতে প্রতিরোধ করা যায়, সেজন্য সেটি স্থাপিত হয়েছিল। এখানে পার্বত্য ও সমতল ভূমিতে এত ধান উৎপন্ন হয় যে, তা পর্যাপ্ত পরিমাণে দু' টাকা মণ দরে কেনা যেতে পারে। মালভূমিতেও ভাল জাতের দানাদার গম ও বার্লি জন্মায়।

ইডেন জানান, 'আমরা ঘোড়ায় চড়ে মাইল দশেক দূরে পাত ছু ও চিন ছু (থিম্পু) নদীর সংযোগস্থলে হাজির হয়েছিলাম। ওই নদীর উপকূল ধরে পেম্বারটন ও টার্নার সাহেব বক্সাদুয়ারের রাস্তাটি ধরে ভুটানে এসেছিলেন। পারো উপত্যকাটি সম্পূর্ণভাবে সমতল ভূমি। নদীর তীর বেয়ে ঘাসে ঢাকা এবরো-খেবরো পথে ঘোড়ায় চড়ে উইলো গাছের ভেতর দিয়ে যাওয়া যায়। নদীর দু'পারে ঘন সন্নিবদ্ধ ছোট ছোট গ্রাম। ওই গ্রামগুলোর লোকজনের চোখমুখ দেখে আন্দাজ করা যায় যে, ওরা ওই দুর্গে সিপাহী বা আধিকারিকের কাজে নিযুক্ত। আমরা নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, দুর্গের সেনারা প্রতিদিন তাদের পরিবারে রাত কাটানোর অনুমতি পেত। অনেকে ছোট ছোট ছুটিতে কয়েকমাস কৃষিকাজের সময়ে বাড়িতে থাকতে পারত।

এ উপত্যকায় অবশ্যই ছয়-সাত শ' বাড়ি আছে। গ্রামে প্রচুর পরিমাণে গবাদি পশু আছে। ভুটানের অন্য অংশের লোকজনদের তুলনায় এখানকার অধিবাসীরা বেশি সমৃদ্ধ ও পরিতৃপ্ত বলে মনে করা যায়।'

ভূপ্রকৃতি

পারোর চারপাশের মৃত্তিকা অদ্ভুতরকমের লৌহমিশ্রিত। এক টুকরো চুম্বক যদি কোথাও রাখা হয়, মনে হয়, প্রচুর লৌহরেণু দিয়ে সেটি ঢেকে যাবে। আর সেজন্যই বালির ঢিপি করে সেখানে চুম্বকের সাহায্যে লৌহরেণু সংগ্রহ করা হয়। পরিমাণও কম নয়। পারো থেকে দু'দিনের যাত্রা দূরত্বে লৌহখনি আছে এবং সেখান থেকে একই পদ্ধতিতে লোহা সংগ্রহ করা হয়।

মি. ইডেনের বর্ণনায় জানা যায়, 'পারোর চারপাশের পর্বতের ঢালে অনেকগুলি বৌদ্ধ মঠ আছে। পূর্বপ্রান্তের পর্বতশ্রেণির ঢালে ডোংগলি নাম বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠটির অবস্থান। একথা বলা হয়ে থাকে যে, ওই মঠের দেওয়ালে তিব্বতি শিল্পীদের আঁকা প্রচুর পরিমাণে চিত্রাদি (ফ্রেসকো) আছে। আমরা যখন পারোতে ছিলাম, তখন যে পাহাড়ে ওই মঠটি ছিল, সেটি ছিল বরফে ঢাকা। তাই আমরা সেখানে যেতে পারিনি। পারোর পশ্চিমদিকের উপত্যকায় গোরিখা (গোরক্ষ) নামে একটি ছোট মঠ ছিল। সেখানে শ্রদ্ধা জানাতে বহু লোকের সমাগম হত। ওই মঠের আরও উপরে ৯০০০ ফুট উচ্চতায় ঘাসে ঢাকা একটি মনোরম মালভূমি আছে। সেখান থেকে তিব্বতের বরফাবৃত শৃঙ্গগুলি বেশ মনোরম দেখায়। আর চোখের সামনে ভেসে ওঠে অপূর্ব সুন্দর মোচাকৃতি চোমোলহরী পর্বতশৃঙ্গ। ওই পর্বতশৃঙ্গ ২৩,৯৪৪ ফুট উঁচু এবং তিব্বতে এটি অতি পবিত্র পর্বতশৃঙ্গ বলে পূজিত। এই পর্বতশৃঙ্গ সমতলে শত শত মাইল দূরে ভাগলপুর প্রভৃতি জায়গা থেকেও দেখা যায়।

এই মালভূমি প্রকৃতপক্ষে কোনও সরকারেরই অধীনে নয়। তবে, ভুটানের দখলে থাকা এ জনপদ ভুটান সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী এবং সেনাবাহিনীর গ্রীষ্মাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৭,৭৪১ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত পারো

মি. ইডেনের বর্ণনায় জানা যায়, 'পারোর চারপাশের পর্বতের ঢালে অনেকগুলি বৌদ্ধ মঠ আছে। পূর্বপ্রান্তের পর্বতশ্রেণির ঢালে ডোংগলি নাম বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠটির অবস্থান। একথা বলা হয়ে থাকে যে, ওই মঠের দেওয়ালে তিব্বতি শিল্পীদের আঁকা প্রচুর পরিমাণে চিত্রাদি (ফ্রেসকো) আছে। আমরা যখন পারোতে ছিলাম, তখন যে পাহাড়ে ওই মঠটি ছিল, সেটি ছিল বরফে ঢাকা। তাই আমরা সেখানে যেতে পারিনি।

আমাদের (ব্রিটিশ) যে কোনও স্বাস্থ্যনিবাস অপেক্ষা উচ্চতায় অবস্থিত। কারণ, ব্রিটিশদের স্বাস্থ্যনিবাস দার্জিলিং ৮,৬০০ ফুট উচ্চতায় এবং জলা পাহাড়ের সেনানিবাস সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। (প্রকৃতপক্ষে জলাপাহাড়ের উচ্চতা ৭,৬০০ ফুট)

এখানকার সূর্যতাপ বেশ প্রখর। এখানে কিন্তু নিয়মিতভাবে সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত প্রবলভাবে বাতাস বয়ে যায়। পারোর উত্তর-পশ্চিমে একটি ধূসর উপত্যকায় বৌদ্ধদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান আছে। সেখানে আছে 'টুক্‌সুঙ' (ব্যাঘ্র গহ্বর) নামে একটি মন্দির ও মঠ। পাহাড় কেটে এখানে মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দিরটি যেন একটি খাড়া পাহাড়ে ভীতিজনক অবস্থায় ঝুলে আছে। পরম শ্রদ্ধেয় গোরক্ষনাথ নাকি ওই মন্দিরে এসেছিলেন এবং বাঘেদের তাড়িয়ে (মন্ত্রবলে) সেখানে বসবাস করেছিলেন।

সিকিম নিবাসী ছেবু লামা ও তাঁর সিকিমি সঙ্গীরা এ স্থান পরিদর্শন করে অত্যন্ত পুলকিত ও আপ্লুত হয়েছিলেন। আমাদের দলের অনেক সর্দার (কুলিদের দলপতি) এখানে মাখন কিনে অনির্বাণ প্রদীপ শিখা জ্বালিয়ে রাখবার জন্য তাদের সঞ্চিত সব টাকা ব্যয় করতে দ্বিধা করেনি। এই পূণ্য মন্দির দর্শন করে পত্নী বিরহী এই স্বামীরা সন্তানলাভের প্রত্যাশা পূর্ণ হবার আশ্বাসী হয়ে ওঠেন।

পারোর উৎসব

পারোতে যেখানে মিশনের ছাউনি ফেলা হয়েছিল, তারই কাছাকাছি একটি মাঠে পারোর বার্ষিক ক্রীড়া উৎসব হয়েছিল। কিন্তু ওই উৎসবে ঘোড়দৌড় ছাড়া আর কিছু ইডেনের ভাল লাগেনি। তিনি লিখেছিলেন, 'লম্বা দড়ি বাঁধা অবস্থায় একদল টাট্টু ঘোড়া নিয়ে আসা হল। প্রত্যেকটি ঘোড়া রঙিন ফিতে এবং রংচঙে পতাকা দিয়ে সাজান হয়েছে। ওদের প্রত্যেকটির পিঠে সামান্য পোশাক পরা, মাথা থেকে রং-বেরঙের লম্বা চাদর ঝোলান লোক বসে আছে। প্রত্যেক অশ্বারোহীর সামনে ছিল এক একজন তা-পেন বা ঘোড়ার প্রশিক্ষক। রাজ সংসদের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মত এঁদেরও উচ্চপদমর্যাদা সূচক উপাধি থাকা উচিত ছিল। কিন্তু, এখানে দেখা গেল, একজন অশ্বপ্রশিক্ষকের তা-পেন উপাধি নয়, পদ জ্ঞাপক ভুটানি শব্দ। 'তা' শব্দের অর্থ 'অশ্ব' এবং 'পেন' শব্দের অর্থ হল 'প্রশিক্ষক'।

যে স্থান থেকে ঘোড়দৌড় শুরু হবে, সেখানে অশ্বারোহীরা ঘোড়াগুলোকে নিয়ে এসে ঘোড়া থেকে নামলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে লম্বা চাবুক হাতে সিপাহীরা জনতার দিকে তেড়ে গিয়ে ভয়ঙ্কর বর্বরতা ও চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে ঘোড়া দৌড়নোর পথ ফাঁকা করে দিলেন। সংকেত পাওয়া মাত্র উপস্থিত জনতার একাংশ টাট্টু ঘোড়াগুলোকে চাবুকপেটা করতে লাগল। ঘোড়াগুলো শুরু করে দিল লাফানি। অশ্বারোহীরা ছুটে এসে ঘোড়াগুলোর কেশর ধরে সেগুলোকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ঘোড়াগুলো কিছুটা শান্ত হলে, তারা লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে নানা চাতুরি দেখাতে থাকলেন। ঘোড়ার পিঠে বসেই কেউ লাফিয়ে পিছন দিকে ঘুরছে, আবার এক লাফে সামনের দিকে ঘুরছে। নরম বা শক্ত জিন কেউই ব্যবহার করছেন না। একটার পেছনে আর একটা ঘোড়া ছুটছে। তাদের গতিবেগ নিরীক্ষা করবার কোনও ব্যবস্থাই নেই। অশ্বারোহীদের দক্ষতা দেখানোটাই যেন মুখ্য উদ্দেশ্য। ঘোড়াগুলোকে কিছুটা দূরত্বে নিয়ে গিয়ে তারা থামালেন এবং সেখানেও একই কায়দা করতে লাগলেন। এভাবে কমপক্ষে ছয় বার ঘোড়া থামিয়ে কসরত দেখানোর পর দৌড় সমাপ্ত হল। দৌড় শেষে প্রত্যেক অশ্বারোহীকে পেনলো আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। সবার শেষ একই রকমের কায়দা দেখাতে দেখাতে অশ্বারোহীরা দুর্গ প্রাসাদে ফিরে গিয়েছিলেন। তা-পেন অর্থাৎ প্রশিক্ষকেরাও সেখানে নেমেছিলেন। এভাবে অশ্বারোহণ ও অবতরণের কসরত দেখানোটা ছিল ভুটিয়া সংস্কৃতির একটা মর্যাদাপূর্ণ কর্ম। প্রতিবছর মর্যাদার সঙ্গে তা পালিত হত।

প্রাক্তন পেনলোই সকল ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে হয়। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন যে, মি. ইডেন আগাগোড়া উৎসবটি উপভোগ করবেন। প্রথম অবস্থায় যদিও তিনি উৎসবের ছবি তুলতে বা দৃশ্য আঁকতে নিষেধ করেছিলেন, পরে অবশ্য দুর্গ থেকে ক্যামেরা এনে বহু দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মি. ইডেনকেও ছবি তোলবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

মি. ইডেন পুনাখায় অবস্থানকালের সম্ভাবনা এবং একই সঙ্গে বর্ষার পূর্বে ফিরে যাবার ব্যাপারে শঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন। দীর্ঘ ১৬ দিন অতিক্রান্ত হবার পরেও ভুটান সরকারের কাছে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। মাত্র দু'দিনের মধ্যেই যে কোনও সংবাদ আদানপ্রদান করা যেত। তাই তিনি পেনলোকে জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, হয় তিনি পুনাখাতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন, নতুবা তিনি দার্জিলিং-এ ফিরে যেতে বাধ্য হবেন। পেনলো অবশ্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, আর অজুহাতের মুখ নেই তাঁর। কিন্তু তিনি বলেছিলেন ভুটানের রাজদরবারের যে অবস্থা, তাতে এর অতিরিক্ত কোনও কিছু প্রত্যাশা করাটাই অমূলক। ওঁদের কাজকর্মেরও মূল্যায়ন করা নিরর্থক। তাই তিনি মি. ইডেনকে এগিয়ে যাবারই পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর মতে, মিশন যদি একবার পুনাখায় পৌঁছেই যায়, তখন সব ঠিক হতে বাধ্য।

মি. ইডেন তখন পেনলোর কাছে বিদায় নিয়ে রওনা দেবার কথা জানিয়ে এবং একই পথে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রাক্তন ওই পেনলো ওই মুহূর্তে ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল। তিনি মি. ইডেনকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, উনি যেন মন্ত্রীসভার আচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকেন। তাঁর মতে, ভুটানের মন্ত্রীসভা বিশ্বাসঘাতক ও মুর্খ লোক দিয়ে পরিচালিত।

ওই সতর্কবাণী অবশ্য সত্য বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। পরে জানা গিয়েছিল ভুটান সরকার পারোর পেনলোকে মৌখিকভাবে বলেছিলেন, যেন পেনলো ছেবু লামাকে বন্দি করে বাকি মিশনকে ফেরৎ পাঠান। কিন্তু পেনলো কোনও লিখিত নির্দেশ না পেলে ওই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবেন না বলে জানিয়েছিলেন। ভুটান সরকার অবশ্য কোনও লিখিত নির্দেশ প্রদান করেনি।

পুনাখার পথে বৈইয়েলা জঙ্‌ ও ফাঁকা দুর্গ

মিশন ১০ মার্চ পারো ত্যাগ করেছিল। একটা খাড়া পাহাড়ের উপরে ঘুরে ঘুরে যাবার প্রশস্ত পথে বাতাসের ঝাপটা কম ছিল না। ওই পথটি উপরে একটি দুর্গে উঠেছে। স্থানটির উচ্চতা ১১,১৬৪ ফুট এবং উপরে সামান্য বরফও পড়েছে। দুর্গটির নাম বৈইয়েলা জঙ্‌। সঙ্গে একটা সেনাশিবিরও ছিল।

সেখান থেকে দুর্গের বিপরীত দিকের রাস্তা ধরে নামতে নামতে ৮ মাইল দূরে শিকারের উপযোগী নরম ঘাস ও পাইন বন আচ্ছাদিত উপত্যকার ভিতর দিয়ে মিশন এগিয়ে যেতে থাকে। গ্রামটিতে সামান্য সংখ্যক ঘরবাড়ি ও একটি ফাঁকা মঠ ও ছোট্ট একটি দুর্গ ছিল। মিশন সেখানে একটি সুপ্রশস্ত প্রান্তরে সেদিনকার মত যাত্রাবিরতি ঘোষণা করেছিল। স্থানটির উচ্চতা ছিল ৮,৪৯৯ ফুট। সেখানে বহু সংখ্যক বাঙালির বসবাস। এঁরা হয়ত প্রধানত কোচবিহার থেকে অপহরণ করা অধিবাসী। বহু বছর আগে অপহৃত ওই বাঙালিরা তাদের স্বভূমির কথাই ভুলে গিয়েছিলেন। (ড. অমিয়ভূষণ মজুমদার, মনে হয় এঁদেরকেই দোভাষীয়া বলে উল্লেখ করেছিলেন।)

মিশন যখন ওই স্থানে অবস্থান করছিল, ওই সময়ে পূর্বের হা-তামপিয়েনে যেমন ভুটানি সংবাদবাহকেরা এসেছিল, তেমনই একটি সংবাদবাহকের দল মি. ইডেনের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। তারা জানায় যে, দেবরাজার নির্দেশ নিয়ে তারা মিশনকে পুনরায় পারোতে ফিরে যাবার নির্দেশ জানাচ্ছে। ওই কথা শুনে মি. ইডেন জানান যে, তারা ফিরে যাবেন, কিন্তু কোনও সরকারি আধিকারিকের উপস্থিতি দরকার এবং একই সঙ্গে সরকারি নির্দেশনামাও দরকার। গত ২রা ফেব্রুয়ারিতে হা-তামপিয়েনেও তো একই কথা বলা হয়েছিল। যদি দেবরাজা কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিকের মাধ্যমে নিষেধনামা না পাঠান, তবে মিশন পুনাখার পথেই যাত্রা করবে। সংবাদবাহকেরা যেন তাদের সঙ্গী হন। নতুবা ওরা পুনাখায় ফিরে গিয়ে যেন মিশনের আগমনবার্তা পৌঁছে দেন। ওই প্রস্তাব খারিজ করে দেয় তারা।

মি. ইডেন পরে জানতে পেরেছিলেন যে, ওই সংবাদবাহকের দলটি পারোর পেনলোকে শাস্তি স্বরূপ জরিমানা করতে যাচ্ছিল। কারণ পেনলো মিশনকে আটকে রাখতে পারেনি। আসলে, অক্ষম সরকার নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে এমন শাস্তি স্থানীয় আধিকারিকদের দিয়েই থাকেন।

বক্সা, থিম্পু, তাসিশু জঙ্‌

পেমেথং দুর্গ থেকে রওনা দিয়ে মিশন বক্সাদুয়ারের রাস্তায় এসে হাজির হয়েছিল। ওই পথটি থিম্পু নদীর উপত্যকা তাসিশু জঙ্‌ (থিম্পু জেলার অন্তর্গত) নামক প্রধান শহরে গিয়েছিল।

ওই উপত্যকার সব ঘরবাড়িই তুলনামূলকভাবে ভাল। পুনাখাও তাসিশু জঙ্‌ যাবার রাস্তায় তেলাগঙ্‌ নামক স্থানে মিশন বিরতি নিয়েছিল। সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাই প্রধান বাসিন্দা। গম, বার্লি, শালগম, সরষে, লঙ্কা প্রভৃতি নানা ফসলে গ্রামটি সমৃদ্ধ। তাসিশু জঙ্‌ সেখান থেকে মাইল দুয়েক দূরত্বে অবস্থিত।

সেদিনের যাত্রারম্ভের কিছুক্ষণ পরেই মিশন সিমতোগা নামক একটি বৌদ্ধমঠে হাজির হয়েছিল। কিছুদিন আগে বিদ্রোহের সময়ে যে দেবরাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছিল, তিনি তখন সেখানেই বসবাস করছিলেন। ছেবু লামা তাঁর সঙ্গে দেখা করে মি. ইডেনের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে অনুরোধ করেছিলেন। প্রাক্তন দেবরাজা দেখা করতে রাজি হননি। তিনি জানান যে, তাঁর সঙ্গে যদি কেউ যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন, তাহলে তাকে শাস্তির মুখে পড়তে হবে। তাছাড়া মিশনকে সাহায্য করার মত কোনও ক্ষমতাই তাঁর নেই।

সিমতোগা থেকে অবতরণের সময়ে গিরিপথে একটি দুর্গ, চারকোণা সূচিমুখ কিছু থাম এবং পবিত্র মন্ত্রে উৎকীর্ণ একটি দেওয়াল দেখেছিল মিশনটি। সেখানকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের কয়েক গজ দূরে একটা ছোট্ট খাঁজ ছিল, যেটিকে ভুটানিরা অতি পবিত্র স্থান বলে মনে করে থাকেন। ভুটানি ঐতিহ্য অনুসারে ভুটানে যে ধর্মগুরু রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই ডুপগেন শেপ্টুনের ঘোড়ার পায়ের খুরের চিহ্ন সেটি। স্থানটির নাম ডোকিলা। এই ডোকিলা গিরিপথ থেকে চারদিকের দৃশ্য চোখকে পরিতৃপ্ত করে।

যা হোক তেলাগঙ্‌ থেকে পুনাখার উপত্যকায় ঢালু পথে নামতে হয়। একটা ছোট্ট নদী পেরিয়ে বিপরীত প্রান্তে সামান্য কিছুটা উপরে উঠে সমতলের রাস্তা ধরে পৌঁছানো যায় পুনাখায়। ওই স্থানটি ৫০০০ ফুট উচ্চতায়। গোটা জনপদটির চারদিক খোলা, পথের ধারে তেমন গাছপালা নেই। মিশন পৌঁছে যায় পুনাখায়।

(আগামী সংখ্যায়)

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page

Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩

উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

আসামের চিঠি

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে জ্বলছে অসম

সমর দেব

এনআরসি করে বিদেশী মুসলমান তাড়াব এমন ভাবনা এবং ঘোষণার পেছনে বিজেপি তথা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যে হিসেব ছিল বাস্তবটা ঠিক তার উল্টো। ফলে, দেখা গেল, এনআরসি থেকে বাদ পড়েছে যে প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষ তাদের মধ্যে বারো লক্ষের মতই বাঙালি হিন্দু। স্বভাবতই নিজেদের ছোঁড়া অস্ত্র ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে তাঁদের কাছে। আর, উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় তাঁদের হাতে নতুন অস্ত্র হয়ে উঠে এসেছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এবং সেই বিল তড়িঘড়ি তারা পাশ করিয়েও নিয়েছে। তার জেরে সমগ্র দেশ তুমুল প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে। অসমের ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে এসেছে। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে পুলিশের গুলি চলেছে এবং পাঁচজনের প্রাণহানি ঘটেছে। উজান অসমের অন্তত তিনটি রেল স্টেশন জ্বালিয়ে দিয়েছে উত্তেজিত জনতা। রাজধানী গুয়াহাটি সহ বিভিন্ন শহরে ব্যাপক ভাঙচুর হয়েছে। বিজেপির অনেক মন্ত্রী, বিধায়কের বাড়িতেও হানাদারি চালানো হয়েছে। সরকারও নানাভাবে পরিস্থিতি সামলাতে চাইছে। নানা প্রতিশ্রুতি এবং আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের দু'হাজার শিল্পীকে এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু, সে প্রস্তাবেও সাড়া দেন নি অসমের শিল্পী সমাজ।

এদিকে, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা অখিল গগৈকে মাওবাদী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁকে কেন্দ্রীয় সংস্থা 'নিয়া'র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পরে, অখিলকে কোমরে দড়ি বেঁধে, হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে হাত পিছমোড়া করে যেভাবে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাতেও তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, কৃষক মুক্তি নেতার ওপরে নির্যাতন চালিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। ফলে, আরও জোরালো হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। সাধারণ মানুষের তুমুল বিক্ষোভে কার্যত জ্বলছে অসম। নাগরিকত্ব আইনটি (সংশোধনী) প্রয়োগের জেরে অসমে অসমিয়া ভাষা, সংস্কৃতি বিপন্ন হবে। ভূমিপুত্ররা সব ধরনের অধিকারে বঞ্চিত হবে। এই আশঙ্কার প্রেক্ষিতে রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে। প্রশাসন বাধ্য হয়ে ১৪৪ ধারা জারি করেছে, কার্ফু বলবৎ করেছে অনেক স্থানে। মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী। রাজধানী গুয়াহাটিতে সেনাবাহিনী ফ্ল্যাগমার্চ করেছে। সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠা পরিস্থিতি সামলাতে আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম ইন্টারনেট সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বন্ধ রাখা হয় ইন্টারনেট। এমনকি, গুয়াহাটি হাইকোর্টে পেশ করা একটি জনস্বার্থ মামলার রায়ে প্রথমে বলা হয়েছিল ১৮ ডিসেম্বর বিকাল থেকে ইন্টারনেট ফের চালু করতে পারে সরকার। কিন্তু হাইকোর্টের সেই রায়ে গুরুত্ব দেয়নি সরকার। পরদিন, ১৯ ডিসেম্বর ফের হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে বিকাল পাঁচটায় ইন্টারনেট চালু করার। কিন্তু তাতেও গা করেনি সরকার। অবশেষে ২০ ডিসেম্বর সকালে চালু হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট। আর, সঙ্গে সঙ্গেই ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে আন্দোলনের নানা ভিডিও। সাধারণ মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় খোলামেলা মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেছে। কড়া নজর রাখছে প্রশাসন। এক সপ্তাহের বেশি জোরদার আন্দোলনে প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে সমগ্র রাজ্য। তবে, ব্যতিক্রম নিম্ন অসম আর বরাক উপত্যকা। নিম্ন অসম, বিটিসি প্রশাসনের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় আন্দোলনের আঁচ লাগেনি।

এদিকে, ইতিমধ্যেই বিতর্কিত আইনটি বাতিলের দাবিতে ৫৯টি মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিমকোর্টে। প্রতিদিনই রাজধানী গুয়াহাটি সহ রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে বিক্ষোভে সামিল হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। বিজেপির রাজ্য নেতারা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রয়েছেন। নিজেদের এলাকায় ঢুকতেও তাঁরা শঙ্কিত। সেকথা মিডিয়ার সামনে তাঁরা কেউ কেউ কবুলও করেছেন। নিম্ন অসম ও বরাক উপত্যকা ছাড়া বাকি অসম জুড়ে প্রতিদিনই আইনটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। আর, এবারের আন্দোলনে সব জনগোষ্ঠীর মানুষ সামিল হওয়ায় এক জোরালো ঐক্যের ছবি ফুটে উঠেছে। শক্তিশালী হয়ে উঠেছে নাগরিকবিরোধী নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদী আন্দোলন। শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, কবি-লেখক-সাংবাদিক থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষ স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনে নেমেছেন। আন্দোলনে, বিক্ষোভে দেখা যাচ্ছে একেবারে কিশোর বয়সী থেকে শুরু করে বৃদ্ধবৃদ্ধাদেরও। অসমের সমাজ জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্র। এসব সত্রের সত্রাধিকাররাও আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। অসমে নতুন আইনটি বলবৎ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। নিশ্চিতই এই আইন কোনও ভাবেই মেনে নেবে না অসমের মানুষ। সেটা তারা নানা সময়ে নানা ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। কারণ, অসমের সাধারণ মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস আইনটি অসমের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করবে। ধ্বংস হয়ে যাবে অসমিয়া ভাষা, সংস্কৃতি। ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডার মত বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী অসমিয়ারাও প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। এই জোরদার আন্দোলনের জেরে বিজেপি বনাম অসমের আপামর মানুষ স্পষ্ট বিভাজিত হয়ে পড়েছে।

এক সময় আইএমডিটি আইন বাতিলের দাবিতে সুপ্রিমকোর্টে সফলভাবে লড়েছিলেন সর্বানন্দ সানোয়াল। আইএমডিটি বাতিলে মুখ্য ভূমিকার জন্য অসমের জনগণ তাঁকে মুক্তির দূত ভেবেছিলেন। তিনি রাজ্যে প্রায় 'জাতীয় নায়কের' সম্মান পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে নির্বাচনে তাঁর জয় সেই সূত্রেই। এবারে, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিজস্ব হিসেবে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নের প্রেক্ষিতে মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে। একদার 'জাতীয় নায়ক' এখন হয়ে পড়েছেন খলনায়ক, 'জাতির শত্রু'। অসমে বিজেপির সমর্থনের ভিত এই মুহূর্তে তলানিতে এসে ঠেকেছে।

জাতি-ধর্মের নামে এবারে আর বিভেদ আনা যাচ্ছে না আন্দোলনরত মানুষের জোটে। আন্দোলনে সামিল হয়েছে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অসমের বাঙালি, বিহারী, মাড়োয়ারি জনগোষ্ঠীও। তুমুল বিক্ষোভের জেরে সপ্তাহখানেক ধরে বন্ধ রাখা হয়েছিল সমস্ত ডাউন এবং আপ ট্রেন। ফলে, রাজ্যের সঙ্গে বাকি ভারতের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এই মুহূর্তে সমগ্র অসমের পরিস্থিতি রীতিমত উত্তেজনাপূর্ণ, অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। আন্দোলনকে যাতে কোনও ভাবেই কেউ বিপথে পরিচালিত না করতে পারে সেজন্য আগাম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। কোনও ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে সতর্ক নজর রাখা হয়েছে। আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি যদিও ছাত্র সংগঠন আসু, কিন্তু এবারের আন্দোলন একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত। সুপ্রিমকোর্টে মামলা উঠেছে। ফলে, অপেক্ষা করতে হবে আদালতের রায়ের। তবে, অসমের মানুষ আইনটি

মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তাদের বক্তব্য, ১৯৫১ সাল দেশে নাগরিকত্ব নির্ধারণের নির্দিষ্ট তারিখ। অসম চুক্তির প্রেক্ষিতে অসমের ক্ষেত্রে সেটা ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ। অর্থাৎ অতিরিক্ত কুড়ি বছর ধরে যারা রাজ্যে এসেছে তাদের নাগরিকত্ব মেনে নিয়েছে অসম। ফলে, আর বিদেশীর বোঝা বইবে না তারা। প্রশ্ন উঠেছে, সুপ্রিমকোর্ট আইনটি বাতিলের নির্দেশ দেবে কিনা। সমস্যাটি যে জটিল সেটা মানছে সব পক্ষই। তবে, আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, লড়াই হবে দীর্ঘ এবং তার জন্য প্রস্তুত মানুষ। জল এখন কোথায় গড়ায় সেটাই দেখার।

এদিকে, সারা দেশে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূল কারণ, আইনটি সংবিধান বিরোধী। সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে আঘাত করেছে এই আইন। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে নস্যাৎ করে ক্ষমতাসীন সংঘ পরিবার হিন্দু রাষ্ট্র বানাবার লক্ষ্যে আইনটি প্রণয়ন করেছে। বহু ভাষা, বহু ধর্মের দেশ ভারতবর্ষকে 'হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তান বানাতে চাইছে বিজেপি। কিন্তু, অসমের ক্ষেত্রে এই মতামতের ক্ষীণ কণ্ঠ এখনও জোরালো হয়ে উঠতে পারে নি অসমের নিজস্ব সমস্যা, জটিলতার ঐতিহাসিক কারণেই। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনটি অসমে অসমিয়াদের অস্তিত্ব বিপন্ন করবে এই আশঙ্কাই প্রবল হয়ে উঠেছে। সারা দেশ যেখানে বিজেপি সরকারের ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার, সেখানে অসমে পাওয়া যাচ্ছে জাতীয়তাবাদী সুর। ফলে, শেষ অবধি আন্দোলন কোন পথ যাবে তা নিয়ে নানা মহলে সংশয়ও দেখা গেছে। আগামী ২২ জানুয়ারি সুপ্রিমকোর্টে শুনানি শুরু হলে এই চিত্রটি খানিকটা পরিষ্কার হতে পারে। এই যুগসন্ধিক্ষণে অসম জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণা বহন করবে, নাকি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আরও সংহত হবে সেটা জটিল প্রশ্ন। কারণ, অসমের জনসমাজে আর্থ-সামাজিক মননে জাতীয়তাবাদ এখনও প্রবল।

শিলচরে শীত আসে

শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। না, শিলচরে শীত পড়ে না , শীত আসে। তাই শুদ্ধ করে বললে শিলচরে শীত এসেছে জাঁকিয়ে। আমাদের এই উপত্যকায় কোনও ঋতুই একা আসে না। প্রতিটি ঋতুই নিজস্ব রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, আভিজাত্যে স্বতন্ত্র চেহারায় ভিন্ন আমেজে মাতিয়ে তোলে দারুণ আমুদে শিলচরিয়ানদের। লিঙ্গ, বয়স, পেশা, নেশা, নির্বিচারে শীত যেন এক আস্ত হুজুগ-আড্ডার কম্বোপ্যাক।

আমাদের শৈশবে শীতকাল মানে ছিল সকালবেলার মিষ্টিরোদে জাটিঙ্গার কমলালেবু, দুপুরবেলায় জমে যাওয়া নারকেল তেলের টিন রোদে রেখে উলেরকাটা ফুটোয় ঢুকিয়ে তেল বের করে আনা, বিকেলবেলা খেলা শেষে ফাটা গালে মায়ের হাতে পুরু বরোলিনের প্রলেপ, সন্ধ্যের দিকে মাঝেমধ্যে উঠোনে আগুন জ্বালিয়ে গোল হয়ে বসে চুংগা পিঠের সুঘ্রাণ টানা, নতুন গুড়ের পায়েস, মায়ের হাতে বোনা সোয়েটার...। হারিয়ে গেছে শৈশব, সেই সঙ্গে হারিয়েছে শৈশবের সেসব মুহূর্তের ধারাবাহিকতাও।

মায়ের হাতে বোনা সোয়েটার বলতে মনে পড়ল সে সময়ে শীতকালে আমাদের আরেক আকর্ষণ ছিল শিলচর ভুটিয়া মার্কেট। প্রতি শীতে ভুটানি পুরুষ মহিলারা আসতেন উলের নানা শীতবস্ত্রের পসরা সাজিয়ে। শীতের সময়টুকু ব্যবসা করে তারা ফিরে যেতেন নিজের দেশে। এই ভুটিয়া মার্কেট তখন খুব জনপ্রিয় ছিল ফ্যাশনেবল সোয়েটার এবং অবাধ দরদাম কষার জন্য। আজও আসেন তাঁরা নানা রঙের নানা ডিজাইনের উষ্ণতা নিয়ে। দুবছর আগে একদিন মুগ্ধ দৃষ্টিতে লাল নীল সবুজ হলুদ নস্টালজিক আলোয় দেখি আমাদের ছোটবেলার সাধের ভুটানি মার্কেট কখন যে নাম পালটে হয়ে গেছে 'টিবেটান রিফ্যুজি মার্কেট', দোকানে দোকানে ঝুলছে ছোট্ট ছোট্ট বোর্ড 'ফিক্সড প্রাইস'। ভাল লাগে নি, আজও লাগে না। রিফ্যুজি শব্দটির সঙ্গে যে অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য পুঞ্জীভূত জেনেছি আজন্ম তা-ই বোধহয় কোথাও কাঁটার মতো বিঁধে থাকে ভাললাগার অনুভূতি জুড়ে। হোক না তা কিছুদিনের অতিথি বিদেশীদের জন্য। জানি এই বিশেষণ শুধুই বৈধভাবে কয়েকদিন নির্বিঘ্নে ব্যবসা করে যাবার আইনি মারপ্যাচের শর্তমাত্র। তবুও...। আর ফিক্সড প্রাইস শব্দটি তো ঝাঁ চকচক শপিংমলগুলোর গলার হার। ৫০০ টাকার কম্ফর্টার অনেক দরদাম শেষে ৪০০ টাকায় গলায় জড়ানোতে বিশ্বজয়ের যে আনন্দ তা শপিং মলে ৩০০ টাকায় কিনেও কোথায়? সঙ্গে বোনাস ভুটিয়া দাদা দিদি, দাদু দিদার সঙ্গে আধো আধো হিন্দিতে দরদাম এবং দরদাম বহির্ভূত কিছু প্রাণের কথা। সেই মধুরালাপের সুযোগ আর এখন নেই। তবু তাঁরা আসেন, কিছুদিনের জন্য ক্ষুদিরাম মূর্তির পেছন দিকটা আলো করে উষ্ণতা ছড়ান আমাদের শহরে তা-ই বা কম কী!

শীত মানেই মেলা। নিত্য নতুন সাজগোজে অভিনব বিষয়ের বাহারি মেলা আর প্রদর্শনী। বইমেলা, শিল্পমেলা, পৌষমেলা, গানমেলা, খাদ্যমেলা, পিঠে পার্বণ, পুষ্প প্রদর্শনী, সারমেয় প্রদর্শনী, আরও কত কত ...কত কিছু পেরিয়ে সব শেষে গান্ধীমেলা। শীত পেরিয়ে সকালের মিষ্টি রোদে যখন হালকা সোয়েটারটাও গায়ে কুটকুট করে, কপালে জমে ওঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম তখন আস্তে আস্তে আড়মোড়া ভাঙে গান্ধিমেলা। বসন্ত বাতাসে বিদায়বেলা হয় সমাগত। শীতকালের এই মেলা উৎসবের সূচনাটি হয় বরাক বঙ্গের বইমেলার হাত ধরে। এই উপত্যকার সমস্ত বইপ্রেমীদের ক'দিনের নিত্য পার্বণ এই বইমেলা। থরে থরে বই দিয়ে সাজানো বুকস্টলগুলোয় ঘেরা মাঠ, মাঝখানে মুক্তমঞ্চ। প্রতিদিন দুপুর থেকে রাত অবধি চলছে ছাত্রদের ছবি আঁকা, কুইজ। সঙ্গে লেখক পাঠক সমালোচক সংস্কৃতি কর্মীদের আড্ডা, বিতর্ক, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বই উন্মোচন, কবিতা, গল্পপাঠ, বক্তৃতা। গরম চা আর নানারকম পিঠেপুলিতে সেরে নেওয়া হচ্ছে পৌষ সংক্রান্তির একপ্রস্থ মহড়া। মুখর মুক্তমঞ্চ নীরব হতে না হতেই একটু দূরে স্লোগানে স্লোগানে উত্তপ্ত ক্ষুদিরামতলা। চলছে প্রতিবাদ প্রতিরোধকথা। প্রিয়াংকা রেড্ডি হত্যার বিচার চাই... সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল চাই না...।

এভাবেই মিটিং মিছিল মেলা সাহিত্য সংস্কৃতি নাটক নিয়ে শীতযাপনে বুঁদ আমরা।

আমাদের বরাক উপত্যকায় প্রতিবার শীতের শেষ ছক্কাটি হচ্ছে রূপম আয়োজিত সর্বভারতীয় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। শিলচর শহর কবির শহর, গানের শহর এবং অতি অবশ্যই নাটকের শহর। রূপম সাংস্কৃতিক সংস্থার এই নাট্য প্রতিযোগিতা যেন আমাদের সমস্ত বছরের সঞ্জিবনীসুধাস্বরূপ। আমরা বলি, 'নাটক আমাদের প্রতিবাদের ভাষা'। প্রতিমাসে আমরা বঙ্গভবনে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী পালা করে এমাসের নাটক করি, পথনাটিকা করি, একক নাট্যোৎসব করি। নাটকের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের বঞ্চনা, যন্ত্রণা, শোষণ, প্রতিবাদের কথা বলি।

তবু মাঝেমাঝে সময় মুখ ঘুরিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়ায়, ব্যর্থ হয় আমাদের যাবতীয় প্রবলভাবে না মানা, না চাওয়ার সমস্ত আকুতি। ঠিক যেভাবে আমাদের সমস্ত না চাওয়ার শ্লোগান, চীতকার, কান্না সমস্তকিছুর ব্যর্থতা বুকে নিয়ে নিস্তব্ধ জমাট একটা অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের একসময়ের বড়ো সাধের, গর্বের কাছাড় কাগজকল। তিনবছর হল মরে গেছে কাগজকলের চিমনির ধোঁয়া, বন্ধ মেসিনে জং ধরেছে কবেই। আগাছায় ভরা গোটা টাউনশিপ এখন বাঁদরের রাজত্ব। একসময় এই ছোট্ট কারখানা নগরীটিকে দূর থেকে হাজার আলোর হাতছানিতে স্বপ্নপুরীর মতো মনে হতো। কিছুই নেই। একে একে নিভেছে সব দেউটি। কারখানার শ্রমিক কর্মচারীরাও কেউ আর আগের মানুষ নেই। বুকের শূণ্যতা, যন্ত্রণা, পেটে খিদের মরণ কামড়, মস্তিষ্কে অসহায় রক্তক্ষরণের পালাও বোধহয় ফুরিয়ে এল। এখন শুধুই স্তব্ধতার পালা। নিরাশার চরম বিন্দুতে পৌঁছে এখন শুধুই নৈঃশব্দের পালা। আমাদের শিরদাঁড়া বেয়ে এক প্রবল শৈত্যপ্রবাহ স্থায়ী হচ্ছে ধীরে ধীরে।

শীত সত্যিই বড় জাঁকিয়ে এসেছে শিলচরে।

মেঘমালা দে মহন্ত

গান্ধী ও কোচবিহার রাজপরিবার

দেবায়ন চৌধুরী

ইংরেজের করদমিত্র কোচবিহার রাজ্যে উপনিবেশবিরোধী চেতনার লালন করা সহজসাধ্য ছিল না। আমরা জানি, মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ইন্ডিয়া ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি হল— 'ভারতবর্ষীয়দের জন্য প্রথম ভারতীয় ক্লাব'। জাতীয় কংগ্রেস আয়োজিত শিল্প প্রদর্শনীতে তিনি পৌরোহিত্য করেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্রাহ্ম প্রভাব সম্বন্ধে আমরা অবগত আছি। এ প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বিশ্বনাথ দাস তাঁর 'মহারানি সুনীতি দেবী' বইতে লিখছেন "প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী মহাত্মা গান্ধীকেও অতিথিরূপে বরণ করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন সুনীতি দেবী। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজী লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'গোল টেবিল' বৈঠকে যোগদানের জন্য গমন করেন। উক্ত বৈঠকে ভারতের দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে কয়েকজন রাজা-মহারাজাও উপস্থিত ছিলেন। ...সুনীতি দেবী ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে বেশী আগ্রহী ছিলেন বলে জানা যায়। আড়ম্বরহীন এই গোপন সাক্ষাৎকার ইংল্যান্ডের পন্ট স্ট্রীটের (Pont Street) বাসভবনে সুনীতি দেবীর উৎসাহেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।" শুভেন্দু মজুমদার 'আধুনিক শিক্ষা ও কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ' গ্রন্থে 'মুক্তির আহ্বান' অধ্যায়ে বলেছেন "মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে কোচবিহার রাজ্য প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মোটের উপর রাজ্য সরকার অসহযোগ আন্দোলনের না পক্ষে না বিপক্ষে একপ্রকার 'মধ্যপন্থা' অবলম্বন করেছিল। রাজ্য সরকারের মতে কোচবিহারের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যেখানে 'স্বরাজ'ই হল শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি; সেখানে এই আন্দোলনের কোনও মূল্য নেই।" ১৯৪৫ সালের আগে কোচবিহারে বড় ধরনের আন্দোলনের প্রভাব অনুভূত হয় নি। মহারানি গায়ত্রী দেবীর আত্মজীবনীতে গান্ধীজীর উল্লেখ ও চরকা কাটার কথা আমরা পেয়েছি। এবার আসব রাণী নিরুপমা দেবীর প্রসঙ্গে, যিনি জীবনের সমস্ত ভোগবিলাস ত্যাগ করে গান্ধীজীর আদর্শে চরম কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছিলেন।

(২)

নিরুপমাদেবীর জন্ম ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে সুদূর মধ্যপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদে। বাল্যকাল কেটেছে সেখানেই। নিরুপমার কাকা হাজারিবাগে থাকতেন। সেখানে এক অনুষ্ঠানে সুনীতি দেবীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কেশবকন্যা নিরুপমাকে পুত্রবধূ করবার প্রস্তাব দেন। এবং প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে নিরুপমা দেবী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন আনুমানিক ১৯১৫ সালে। এইবছর কোচবিহার সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সভাপতির দায়িত্ব ন্যস্ত হয় রাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের ওপর। নববিধান ব্রাহ্মসমাজ থেকে একসময় প্রকাশিত 'পরিচারিকা' পত্রিকাটিকে নবপর্যায়ে সাহিত্যসভার মুখপত্র হিসেবে শুরু করবার সিদ্ধান্ত নেয় কোচবিহার রাজপরিবার। নিরুপমা দেবীর সম্পাদনায় 'পরিচারিকা নব পর্য্যায়'-এর প্রথম সংখ্যার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে এই পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা মুদ্রিত হয়। মাঝখানে পত্রিকা অনিয়মিতভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। নবম

"গোরক্ষা হিন্দুধর্মরে প্রধান কথা, সকল সম্প্রদায় এবং সমগ্র হিন্দুসমাজই উহা চায়, তবুও এই কারণে মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষের ভাব আমি উপলব্ধি করিতে পারি না। ইংরেজদিগের জন্য প্রত্যহ যে গোবধ হইতেছে, সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলি না। কিন্তু কোনও মুসলমান গোহত্যা করিলেই আমরা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠি। গো-মাতার নামে যেসব দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, উহা দ্বারা বৃথাই শক্তি অপচয় হইয়াছে। ...গো-রক্ষা আমাদের নিজেদের ভিতর হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত।"

বর্ষে সম্পাদনার ভার নেন জানকীবল্লভ বিশ্বাস। আমরা জানি নিরুপমা দেবীর দাম্পত্যজীবন সুখের হয় নি। তিনি বিবাহবিচ্ছেদ করে কলকাতা চলে যান। পরবর্তীকালে আড়াই বছরের জন্য শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসান্নিধ্য লাভ করেন। ১৯২৫ সাল নাগাদ তিনি বিয়ে করেন গান্ধীবাদী শিশিরকুমার সেনকে। তাঁরা কলকাতায় শিশু বিদ্যাপীঠ চালাতেন। এবং এই প্রতিষ্ঠানকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য প্রতি বছর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হত। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এসে পৌঁছায় "অভ্যুদয় গীতিনাট্যের ভিতর দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অর্থাৎ ইংরাজদের ভারতে বণিক বেশে আসার পর থেকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা সংগ্রাম কেমনভাবে বর্তমান রূপ ধারণ করল সেই পর্যন্ত এক একটি দৃশ্যের বর্ণনা নাচ গান ও পাঠের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে এই ছিল পরিকল্পনা।" তিনি এই পরিকল্পনাকে সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত করেন; অবশ্য তাঁর লেখা অনেকগুলি গান সজনীকান্ত দাস পাল্টে দিয়েছিলেন। এই ঘটনায় নিরুপমা দেবী হতাশ হন। যাইহোক, নিরুপমা দেবী তাঁর 'আমার জীবন: সাহিত্যসাধনার স্মৃতি'তে সেই গানগুলি উদ্ধৃত করেছেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে তিনি লিখেছিলেন- "বিদেশীর সংস্রব বর্জন করো/ এক সুরে এক তালে এক গান ধরো/ ভাই ভাই এক ঠাঁই/ ভেদ নাই ভেদ নাই'..."। বিদেশীদ্রব্য বর্জনকে সমর্থন করে লেখা হল: "(মোদের) পাপের সাথে নাই কোন যোগ নাই/ ঐ ভ্রূকুটির ভয় করি না ভাই।/ তোমার পথে আর যাব না/ তোমার খাতির আর চাব না/ সরল সোজা নিজের পথে যাই/ (মোরা) ভয় করি না ভাই!" গান্ধীজীর আদর্শের প্রতি আবেগ নিরুপমা দেবীর লেখায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে "গান্ধিজীর পরিচালনায় তখন দেশের মন নূতন মন্ত্র গ্রহণ করেছে অহিংস সত্যাগ্রহ! নারী জাতির মাঝে নূতন জাগৃতি এসেছে, তুচ্ছ ধন, তুচ্ছ অলংকার, তুচ্ছ প্রাণ! দলে দলে নারী কারাবরণ করছে! অদম্য উৎসাহ, চোখেমুখে সত্যের জ্যোতি বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে! সেই দৃশ্যের জন্য গান লিখেছিলাম: চল্ চল্ চল্ মুক্তির সংগ্রামে/ শক্তি রূপিণী চল্/ চল্ সহোদরা চল্ গো জননী জায়া/ সংগ্রামিকার দল!/ বাহিরে এবার জ্বলিল আরতি শিখা/ চল্ গো গ্রামিকা চল্ নব সাহসিকা/ অঙ্কিত কর দিয়ে নব জয় টীকা/ নব ভারতের রণাঙ্গনের তল/ চল্ চল্ চল্ সংগ্রামিকার দল।"

১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনের পর কংগ্রেস নেতারা যখন সব কারারুদ্ধ, তখন 'কংগ্রেসের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানগুলি পালন করাবার' দায়িত্ব পড়ে নিরুপমা দেবীর কাঁধে। পুলিশ নজর রাখতে থাকে তাঁর ওপর এবং 'থানা দর্শনও ভাগ্যে ঘটে।' সেখানে জেরা করবার সময়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় "আপনার তো সাহিত্যিক মহলে কবি বলে খ্যাতি আছে, আপনি সে পথ ছেড়ে এ পথে এলেন কেন?" এর উত্তরে নিরুপমা দেবী বলেছিলেন "কে বলছে সে পথ ছেড়েছি? আচ্ছা কেন বলুন তো, এ পথের সঙ্গে ও পথের বিরোধ আছে নাকি?"

১৯৪৪-৪৫ সনে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা হয় নিরুপমা দেবীর। এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখছেন "লক্ষ লক্ষ লোক তীর্থ দর্শন ক'রে তৃপ্ত হয়ে পবিত্র হয়ে ফিরে আসে, কিন্তু আমি মনে করি এই মহামানবকে দর্শন ক'রে আমি যে শান্তি পেয়েছিলাম এমন বুঝি কেউ পায় না। আমার সমস্ত জীবন যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল।" সেবাগ্রামে নিখিল ভারত বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনে গান্ধীজীর সঙ্গে ১০ মিনিটের জন্য দেখা হয়েছিল নিরুপমার। এই সাক্ষাৎকারের কথা তাঁর নিজের মুখেই শোনা যাক "তাঁর ছোট ঘরখানিতে মাটিতে কম্বল পেতে তিনি বসেছিলেন, সেই ঘরে আমরা দু'জন বাঙালি মেয়ে ছাড়া আরো ২/৪ জন অবাঙালি মহিলাও বসেছিলেন। দেখলাম এর চেয়ে নিরালায় তাঁকে আর পাব না। এদিকে গোণাগুন্তি মিনিট ফুরিয়ে আসছে। সংকোচের এই বিহ্বলতা কাটিয়ে বললাম, 'বাপুজী আপনি দুর্নীতি দমনের জন্য যে আমরণ অনশনের সংকল্পের কথা বললেন আজ তা শুনে পর্যন্ত আমি স্থির থাকতে পারছি না। আমরা বাঙালি মেয়েরা এর প্রতিকারের জন্য কি করতে পারি বলে দিন।' এই কথা বলতে বলতে হৃদয়াবেগে আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল।

তিনি আমার চোখের দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখ অনশন করা তো সুখের ব্যাপার নয়। কিন্তু আমার ভগবান যদি আমায় আদেশ দেন তুই অনশন কর (তুই উপাস কর) তাহলে তো আমায় করতেই হবে! তুমি আজ যে কথা বললে এ যদি সকলে বলে তবে তো আমায় অনশন করতেই হয় না।' আমি বলি, 'আমি অন্যের কথা বলতে পারি না বাপু, কিন্তু নিজের কথা আমি বলতে পারি। আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।'

বলতে বলতে তখন আমার দু'চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। তিনি বলেন, 'তুমি সহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে কাজ কর, সহরের কাজের ভার উপযুক্ত মেয়ের হাতে দিয়ে চলে যাও।'

আমি তাঁর আদেশ শিরোধার্য ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হতেই তিনি তাড়াতাড়ি আমার দু'হাত ধরে বললেন, 'পায়ে কেন? হাতে হাত দাও!' বলে যে মিষ্টি হাসি হেসেছিলেন তা আমার মনে এক নূতন উদ্যম এনে দিল।' "

এই সাক্ষাৎকারের পরেই নিরুপমা দেবী কলকাতা ছেড়ে গ্রামে কাজ করতে চলে যান এবং সাহেবনগরে নিজের আশ্রমে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গান্ধীজীর আদর্শেই গ্রামোন্নয়নের কাজে ব্যাপ্ত ছিলেন।

(৩)

রাজ আমলে প্রকাশিত 'পরিচারিকা নব পর্য্যায়' পত্রিকার ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৩১) 'সাময়িক প্রসঙ্গ' বিভাগে 'গো-হত্যা সম্বন্ধে মহাত্মার বাণী' উদ্ধৃত হয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়েও তাঁর কথাগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে "গোরক্ষা হিন্দুধর্মের প্রধান কথা, সকল সম্প্রদায় এবং সমগ্র হিন্দুসমাজই উহা চায়, তবুও এই কারণে মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষের ভাব আমি উপলব্ধি করিতে পারি না। ইংরেজদিগের জন্য প্রত্যহ যে গোবধ হইতেছে, সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলি না। কিন্তু কোনও মুসলমান গোহত্যা করিলেই আমরা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠি। গো-মাতার নামে যেসব দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, উহা দ্বারা বৃথাই শক্তি অপচয় হইয়াছে। ...গো-রক্ষা আমাদের নিজেদের ভিতর হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত। ... গো-মহিষাদির খাদ্য, পশুক্লেশ নিবারণ লুপ্তপ্রায় গো-চারণ মাঠগুলির পুনরুদ্ধার, গো-প্রজননের উন্নতিবিধান, দরিদ্র গো-পালকদিগের নিকট গো-ক্রয় এবং পিঁজরাপোলগুলিকে আদর্শ গোশালায় পরিণত করার দিকেই গোরক্ষা সমিতিগুলিকে বেশী মনোযোগ দিতে হইবে।" সর্বোপরি মনে করিয়ে দিয়েছেন "...গো-রক্ষা করিতে করিতে যাইয়া তাহারা যদি মুসলমানদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের গুরুতর পাপ হইবে।" 'মহাত্মাজীর বাঙলা-ভ্রমণ'- এর সংবাদ উঠে এসেছে পরিচারিকার পাতায় 'সবচেয়ে বড় সাময়িক খবর হিসেবে।' (আষাঢ় ১৩৩২, ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা) দিনাজপুরে তিনি সাঁওতালদের যেসমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন, দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার সৌজন্যে তা তুলে ধরা হয়েছে। 'পরিচারিকা নব পর্য্যায়' পত্রিকাতে 'মহাত্মাজীর আত্মজীবনী'-র অংশবিশেষ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। শেষ সংখ্যাতে পরিসর বরাদ্দ হয়েছিল বেশি। তথ্য হিসেবে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের আমন্ত্রণে কলকাতার উডল্যান্ড প্রাসাদ সংলগ্ন ময়দানে মহাত্মা গান্ধী এক প্রার্থনাসভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। একথা জানিয়েছেন দেবব্রত চাকী তাঁর 'মহাত্মাজী ও কোচবিহার রাজপরিবার' (শারদছন্দ, ১৩২৬) নিবন্ধে। আমরা 'কোচবিহার দর্পণ' পত্রিকার পৌষ ১৩৫২ সংখ্যায় 'সাময়িকসংবাদ' বিভাগে পাচ্ছি নিম্নোদ্ধৃত প্রতিবেদন—

মহাত্মা গান্ধীর বাংলায় আগমন

গত ১লা ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতার সন্নিকটে সোদপুরস্থ খাদি-প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করিতেছেন। বহুদিন পরে মহাত্মাজী এই বাংলায় আসিলেন। প্রত্যহ বহু নরনারী তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সোদপুরে যাইতেছেন। সন্ধ্যায় মহাত্মাজীর প্রার্থনাসভায় বহু লোক সমবেত হইতেছেন। প্রত্যহই প্রার্থনান্তে তিনি জনগণকে উদ্দেশ করিয়া প্রার্থনার উদ্দেশ্য ও মর্ম বুঝাইয়া দিতেছেন। একদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মাজী বলেন, "পৃথিবীতে আজ সর্বব্যাপী অন্ধকার, এই অন্ধকারে মানুষকে ভগবানের নিকট আলোকের প্রার্থনা করিতেই হইবে। কেবল ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র পৃথিবীর আজ শান্তি চাই। এই পৃথিবীতে হিংসা আছে অহিংসাও আছে, সত্য আছে, মিথ্যাও আছে, আলো আছে অন্ধকারও আছে। কিন্তু মানুষকে অহিংসার আশ্রয় করিয়া সত্য ও আলোকের সন্ধান করিতে হইবে।"

বাংলার গভর্ণর মিস্টার কেরী চারদিন মহাত্মা গান্ধীর সহিত গভর্ণমেন্ট হাউসে দেখা করিয়াছেন। প্রকাশ যে উভয়ের মধ্যে নানাবিষয়ে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। বড়লাট লর্ড ও য়াভেলের সহিতও একদিন মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎকার হইয়াছে। এই সকল সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে একটি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে কোনওরূপ দলগত রাজনৈতিক আলোচনার জন্য মহাত্মা গান্ধীর সহিত গভর্ণর বা বড়লাটের সাক্ষাৎকার হয় নাই; নির্বাচনের পূর্বে এইরূপ কোন আলোচনা চালান হইবে না, তবে ব্যক্তিগতভাবে ভারতীয় নেতৃগণের সংস্পর্শে আসিতে তাঁহারা সর্বদাই প্রস্তুত।

দলতন্ত্র শিক্ষার সর্বনাশ ঘটিয়েছে ক্ষমতায় থাকতেই মেনে নিয়েছিলেন বামেরা

জয়ন্ত গুহ

অধুনা বিজেপিতে যোগ দেওয়া একদা তৃণমূল যুব নেতা শঙ্কুদেব পাণ্ডা যদি শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতিতে কৃশানু দে হন, তাহলে শিক্ষাঙ্গনে দলতন্ত্র কায়েম করতে অনিল বিশ্বাস ছিলেন দিয়েগো মারাদোনা। ২০১৫ সালে, তৃণমূল জমানায় শিক্ষায় চরম নৈরাজ্য নিয়ে যখন প্রতিদিন প্রতিবাদ জোরদার হচ্ছে, বিকাশ সিংহের মতো বিজ্ঞানী মুখ খুলছেন, সেই সময়ে দলের মধ্যে 'অনিলায়নে'র ভুল কবুল করে পাপস্খালনের চেষ্টা করেছিলেন একদা অনিলবাবুর একান্ত ঘনিষ্ঠ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। পার্টি দলিলে তাঁর স্বীকারোক্তি 'শিক্ষায় রাজনীতিকরণ সব ক্ষেত্রে এড়ানো যায় নি। কিছু অবাঞ্ছিত পদক্ষেপও ছিল'। গোপন দলিল প্রকাশ্যে নিয়ে আসায় সে সময় সিপিএমের অন্দরে বহু বাদানুবাদও হয়েছিল।

নিজেদের দোষ ঢাকতে সিপিএম বরাবর অন্যের দোষ নিয়ে সরব হয়। পুরনো অভ্যাস। সিপিএমের দাবি, —বাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ণগ্রাস সম্পন্ন হয়েছে। কলেজে ভর্তি হতে গেলে মেধা এখন আর একমাত্র বিষয় নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা দেখেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভায় উপস্থিত শিক্ষাবিদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাথায় শাসকদলের শিক্ষা সেলের নেতা। স্কুল সার্ভিস কমিশনের সভাপতি পদত্যাগপত্র বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে না পাঠিয়ে পাঠাচ্ছেন শাসক দলের মহাসচিবের কাছে। আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতিতে শাসকদল ঘনিষ্ঠ জ্যোতিষী। রায়গঞ্জ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে কলার ধরে টানতে টানতে মারা, ইটাহার কলেজে শাসক দলের নেতার স্ত্রীকে ঢুকতে বাধা দিয়ে কলেজের অধ্যক্ষার আক্রান্ত হওয়া, যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষকের হেনস্থা, কিংবা ভাঙড় কলেজে অধ্যাপিকাকে শাসক দলের প্রাক্তন বিধায়কের জগ ছুঁড়ে মারার ঘটনা নিয়ে বারবার সরব হয়েছে সিপিএম। বারেবারেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল। এ ধরনের কোনও ঘটনাই সমর্থনযোগ্য নয় কিন্তু ক্ষমতার গৌরবে একদা 'বাহুবলী সিপিএম'-ও গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা নয়।

সিপিএমের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের হাত ধরে বাম জমানায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদে দলের ঘনিষ্ঠদের নিয়োগ করার 'অনিলায়ন' পর্বের সাক্ষী থেকেছে এই বাংলা। আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকেই পরিচালিত হত, কোন খাতে বইবে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা এবং কারা বসবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে। শুভঙ্কর চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার বা জ্যোতি বসুর জীবনীকার সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ নিয়ে সে সময় কম বিতর্ক হয়নি। ২০০৬ সালে সুদর্শন রায়চৌধুরী উচ্চশিক্ষামন্ত্রী হওয়ার পরে সিপিএম

বাম জমানায় শিক্ষায় অবনতির যে অভিযোগ, তার মূলে ছিল রাজনীতির অনুপ্রবেশ। যা শিক্ষার 'অনিলায়ন' নামে পরিচিত। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে অনিলবাবুর হাতিয়ার ছিল তাদের পরিচালন সমিতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যা সেনেট-সিন্ডিকেট, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্ট। নিয়মবিধির বলে এই সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটির অর্ধেকের বেশি সদস্য যাদের হওয়ার কথা তাঁদের হয় শিক্ষাকর্মী, না-হয় ছাত্র-ছাত্রী, না-হয় রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কেন্দ্রের ভোটে জিতে আসা ব্যক্তি হতে হবে, বাম আমলের বেশির ভাগ সময় জুড়ে যাঁরা ছিলেন শাসক দলের সমর্থক।

দলগত ভাবে নেতাদের কলেজ পরিচালন সমিতির মাথায় থাকা নিয়ে আপত্তি তোলে। যদিও রায়দিঘি কলেজের পরিচালন সমিতিতে বহাল তবিয়তে থেকে গিয়েছিলেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। বীরভূমের একটি কলেজে দীর্ঘদিন পরিচালন সমিতিতে ছিলেন লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। কলকাতার প্রাক্তন মেয়র প্রশান্ত শূর একটা সময় সাতটি কলেজের পরিচালন সমিতিতে ছিলেন। আরামবাগ গার্লস কলেজে রীতিমতো স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ ছিল প্রাক্তন সিপিএম নেতা অনিল বসুর বিরুদ্ধে। পালাবদলের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের নেতারা বারবারই বলেছিলেন, শিক্ষায় রাজনীতির অনুপ্রবেশ যে কোনও মূল্যে আটকানো হবে। যদিও বাস্তবে এমনটা ঘটেনি। সিপিএমের দলতন্ত্রের বদলে এসেছে 'পছন্দতন্ত্র'।

বাম জমানায় শিক্ষায় অবনতির যে অভিযোগ, তার মূলে ছিল রাজনীতির অনুপ্রবেশ। যা শিক্ষার 'অনিলায়ন' নামে পরিচিত। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে অনিলবাবুর হাতিয়ার ছিল তাদের পরিচালন সমিতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যা সেনেট-সিন্ডিকেট, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্ট। নিয়মবিধির বলে এই সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটির অর্ধেকের বেশি সদস্য যাদের হওয়ার কথা তাঁদের হয় শিক্ষাকর্মী, না-হয় ছাত্র-ছাত্রী, না-হয় রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কেন্দ্রের ভোটে জিতে আসা ব্যক্তি হতে

হবে, বাম আমলের বেশির ভাগ সময় জুড়ে যাঁরা ছিলেন শাসক দলের সমর্থক।

১৯৬৬ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে কিন্তু উপাচার্য, সহ উপাচার্য, ডিন এবং কলেজে অধ্যক্ষ-রাই ছিলেন শেষ কথা। সরকার এ নিয়ে মাথা ঘামাতে যেত না। ১৯৭৭-এ রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টায়। বামপন্থীরা তাঁদের কার্যত স্বৈরাচারী বলে দাগিয়ে দিতে শুরু করেন। এরই পাল্টা হিসাবে শুরু হয় শিক্ষাক্ষেত্রে 'গণতন্ত্রীকরণ'-এর প্রক্রিয়া। যার সূত্রপাত সন্তোষ মিত্রের হাত ধরে। কলেজ শিক্ষক ছিলেন বটে, তবে দলে তাঁর প্রবল প্রভাব ছিল অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার কৃষক আন্দোলনের নেতা হিসাবে। কার্যত তাঁর হাত ধরেই এল ১৯৭৯-এর নতুন আইন। ওই আইনে গণতন্ত্রীকরণের নামে সংখ্যার দাপট শুরু হল। শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নন, এমন ব্যক্তিদেরও ভোটাধিকার দেওয়া হল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি গড়ার জন্য।

শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তি কেন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবেন বা উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে মত দেবেন, সেই প্রশ্ন অতীতে বহুবার উঠেছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই সেই সমালোচনায় কান দেয় নি সিপিএম। পরিচালন সমিতিতে সমর্থক প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্যের জোরে উপাচার্য থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে অনিলবাবু 'নিজের লোক' বসাতেন, এমন অভিযোগও ছিল শিক্ষা মহলের। বস্তুত, বাম আমলেই ঘটনাচক্রে আলিমুদ্দিনের পছন্দের উপাচার্য না পেয়ে ছাত্র ও কর্মচারী সংগঠনকে দিয়ে দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে রাখার সাক্ষী কলকাতা শহর।

শিক্ষানুরাগীদের অনেকের মতেই, সন্তোষ মিত্রের হাত ধরে গণতন্ত্রের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেওয়াকে, প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যান সিপিএমের তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। যার ফল ভুগতে হয় উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্যকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর মেয়াদের প্রায় অধিকাংশ সময় কার্যত তাঁকে বাড়িতে বসে অফিস চালাতে হয়েছিল আলিমুদ্দিনের দাপাদাপিতে। তবে প্রতিকূলতার মধ্যেও সন্তোষ ভট্টাচার্য (সিপিআই মতাদর্শে বিশ্বাসী) মহাশয় মেরুদণ্ড সোজা রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনকে যথাসাধ্য আগলে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। যা থেকে হাত পুড়িয়ে শিক্ষা নেয় আলিমুদ্দিন। এরপর উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে শুরু করে সিপিএম। সেক্ষেত্রে যোগ্যতা বা দক্ষতা নয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দলের প্রতি আনুগত্য। আর এই পথ ধরে যাঁরা উপাচার্য পদে এলেন, তাঁদের অনেকেই প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকারকে কার্যত বন্ধক রাখলেন রাজনৈতিক আনুগত্যের কাছে। এবং সেই সিস্টেমের এমনই জোর যে ২০১১তে সিপিএম পরিবর্তনের হাওয়ায় সরে গেলেও, অনিলায়নের সেই ধারা কিন্তু সরানো গেল না। ক্ষমতায় আসার পর চেষ্টা একটা করেছিলেন বটে 'কালীঘাটের অগ্নিকন্যা' যদিও শেষ রক্ষা হয় নি। অনিলায়নের প্রবল ধারায় ভেসে গেছে উপাচার্য নিয়োগ এবং শিক্ষাক্ষেত্রকে রাজনীতি মুক্ত করার প্রবল ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা। কিন্তু এনিয়ে বামপন্থীদের কিচ্ছু বলার নেই। কেননা বাম আমলে উপাচার্য বাছাই হতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা কোর্ট বা সেনেট-এর মাধ্যমে। তখন অহরহ অভিযোগ উঠত যে, সেনেটে বাম-ঘনিষ্ঠ প্রতিনিধিরাই সর্বেসর্বা। তাঁরাই পার্টির কথা শুনে ঠিক করতেন, কে উপাচার্য হবেন। এর পরও সেনেট ঐকমত্যে পৌঁছতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে তিন সদস্যের নাম পাঠানো হত আচার্য তথা রাজ্যপালের কাছে। তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা

"রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে কী কী করেছে, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। শিক্ষকদের যেখানে খুশি, সেখানে বদলি করে দেওয়ার চল ছিল। তখন কলেজে অনুদান পৌঁছত যৎসামান্য। আজেবাজে লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ আলো করে বসানো হত। এই নিয়ে আমার বাবা নিজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। সব আমার জানা আছে।"

—অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করেই উপাচার্য নিয়োগ করতেন। এমনটাই ছিল 'অনিলায়ন' ঘরানার রীতিনীতি।

এখানেই শেষ নয়। বামজমানার শুরুতে অসংখ্য 'ভাল মাস্টারমশাই' থাকলেও আশির দশক থেকে চেহারাটা পাল্টে যায়। পার্টি করলেই তখন ইশকুলে চাকরি। দলের প্রতি আনুগত্যই ছিল সেক্ষেত্রে একমাত্র যোগ্যতা। শিক্ষক পরিচয় নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ এবং রাজনৈতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নানা সুযোগ-সুবিধা অর্জনের যে অভ্যাস বাম আমলের অন্তত শেষ দুই যুগে দেখা গিয়েছিল, সম্ভবত বাংলার শিক্ষাজগতকে রসাতলে পাঠানোর ক্ষেত্রে তার তুলনা মেলা ভার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ইউনেসকো পরিচালিত 'গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৭' জানিয়েছিল যে-কোনওদিন পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলিতে ঢুঁ মারলে দেখা যাবে ২৫-৩০ শতাংশ শিক্ষক অনুপস্থিত। এমনিতেই ছাত্র-শিক্ষক আদর্শ অনুপাতের তুলনায় অনেক কম সংখ্যক শিক্ষক পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা। তার ওপর শিক্ষকদের দৈনিক অনুপস্থিতি শিক্ষাজগতে তৈরি করেছিল সঙ্কট। স্কুলে গিয়ে এই শিক্ষকদের একটা বড় অংশের দেখা না মিললেও, ইশকুলের খাতায় অফিসিয়ালি তাদের উপস্থিতির সুবন্দোবস্ত ছিল। কারণ তারা তো শাসকদলের 'কাজে' বেরোতেন। আর কোনও শিক্ষক যদি জনপ্রতিনিধি হন তা হলে সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাকে নিয়ে একেবারে ল্যাজেগোবরে! চতুর্দিকে অনর্গল সমালোচনার মুখে ২০০১ সালে সিপিআইএম-এর তদানীন্তন রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস মহাশয় বলতে বাধ্য হয়েছিলেন— 'আমরা শিক্ষকদের বলছি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আপনার যা কাজ সেটাই আপনার প্রধান দায়িত্ব। সেটা ঠিকঠাক করাটাকেই আমরা রাজনৈতিক কর্তব্য পালন করা বলে মনে করব।'

২০০৩ সালে, বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ-এর তরফে রাজ্যে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিধানসভায় যে নথি পেশ করা হয়েছিল তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল শিক্ষাক্ষেত্রকে রাজনীতিমুক্ত করার কথা। ২০০৭ সাল নাগাদ বিমান বসুকে পুনরায় বলতে হয়— 'দুটো (প্রতিনিধিমূলক রাজনীতি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান) একসঙ্গে চালানো উচিত নয়। ...নিশ্চয়ই একটায় ফাঁকি দিতে হয়। রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যেহেতু রাজনৈতিক কাজকেই বেশি গুরুত্ব দেন, তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি থাকে।' এরপর ২০০৮ থেকেই বামফ্রন্ট জমানায় ভাটার টান। কিন্তু ততক্ষণে শিক্ষাক্ষেত্রে যা ক্ষতি হওয়ার ছিল তা হয়ে গিয়েছে।

শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত অনেকের অভিজ্ঞতাই বলছে, কার্যক্ষেত্রে সিপিএমের জুতোয় পা গলিয়েই হাঁটা শুরু করেছে তৃণমূল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তি, পরীক্ষা, ফল প্রকাশ, ছাত্র সংসদ নির্বাচন সবেতেই টিএমসিপি-র দাদাগিরি মনে করিয়ে দিয়েছে বিগত জমানাকেই। বাম আমলের মতই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট-ইসিতে শাসক ঘনিষ্ঠদের বসানোর অভিযোগ উঠছে বর্তমান শাসক দলের বিরুদ্ধে। যদিও তা নিয়ে সিপিএম নিয়মরক্ষার প্রতিবাদ করেছে। কড়া নয়, নরম ছিল সেই প্রতিবাদ। আসলে বাম জমানায় একই অভিযোগের এত ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে যে, বামেদের পক্ষে এই নিয়ে বিরাট প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে নৈতিক কিছু অসুবিধা আছে। সাম্প্রতিকতম উদাহরণ বা বলা ভাল বামপন্থীদের 'সাজানো বাগান' তছনছ করে দিয়েছে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ, "রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে কী কী করেছে, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। শিক্ষকদের যেখানে খুশি, সেখানে বদলি করে দেওয়ার চল ছিল। তখন কলেজে অনুদান পৌঁছত যৎসামান্য। আজেবাজে লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ আলো করে বসানো হত। এই নিয়ে আমার বাবা নিজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। সব আমার জানা আছে।"

কিন্তু এসব নিয়ে কংগ্রেসের তো কোনও মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। তাঁরা তো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন সরকার বিরোধী আন্দোলনে। হতে পারে বিগতযৌবন অশক্ত বৃদ্ধ সব নেতা কিন্তু একবার তো অন্তত গলাখাঁকারিও দিতে পারেন। কিন্তু না, তাঁহারা 'রবে নীরবে' বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। কী আশ্চর্য! আটত্রিশ বছর আগে, শিক্ষায় রাজনীতিকরণের প্রতিবাদ জানাতে বাম আমলে তাঁরাই পথে নেমেছিলেন। যার জেরে ১৯৮১ সালের ৩০ মার্চ তিন জন কংগ্রেসকর্মী নিহত হন। তার প্রতিবাদে সেই বছরের ৩ এপ্রিল বাংলা বন্ধও হয়েছিল।

রাজনগরের রাজনীতি

রাজ্য থেকে জেলায় রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে যাত্রার সুফল কি মিলেছে?

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

রাজার দেশ কোচবিহার। আমি কোচবিহারের ভূমিপুত্র। রাজনগর কোচবিহারে আমার জন্ম কর্ম বেড়ে ওঠা, একটু একটু করে। আমার কৈশোর কেটেছে রাজপ্রাসাদের খুব কাছেই। চোখের আলো ফুটতেই যাকে দেখে মুগ্ধ হতাম, আমার নবীন দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর। মাঝেই মাঝেই তিনি কালো ঘোড়ায় চেপে প্রাসাদ প্রাঙ্গণের বিস্তীর্ণ ময়দানে প্রাতঃভ্রমণে বের হতেন। কোনও কোনও দিন গল্ফ স্টিক হাতে নিয়ে গল্ফ খেলতেন তাঁর বিদেশী বন্ধুদের সাথে। হাজার হাজার মানুষের মত আমিও ওই সৌম্যদর্শন রাজপুরুষকে দেখে মুগ্ধ হতাম। সেটা ছিল বিগত শতাব্দীর ছয়ের দশক। শুধু ক্রীড়াপ্রেমী নন, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ক্রীড়াবিদ। ক্রিকেট এবং ফুটবল দুটোতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এক সময় তিনি বাংলা ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্বও করেছেন। মূলত তাঁর সৌজন্যে স্কুল জীবনেই দেখে ফেলেছি ভারতীয় ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক মনসুর আলি খান পতৌদি, ভারতীয় দলের ওপেনার এমএল জয়সীমা, ইংল্যান্ড-এর উইকেটরক্ষক জন মারে, বাংলা দলের ক্রিকেটার চুনি গোস্বামী ও সন্তোষ রেড্ডির মত ক্রিকেটারদের অনবদ্য খেলা। ব্যক্তি জীবনে পণ্ডিত নেহরুর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন মহারাজা। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের সাথেও সম্পর্ক ছিল মধুর। কোচবিহারের ভারতভুক্তির পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মহারাজাকে কোচবিহার আসনে দাঁড়ানোর জন্য তাঁর ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধুবান্ধব ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাবে তিনি সাড়া দেন নি। রাজ ঐশ্বর্যে গরিমান্বিত রাজাধিরাজ মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর রাজা থেকে সাংসদ বা মন্ত্রিত্বে অবতরণে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না।

যাইহোক, আমার আলোচনার পরিসর মূলত কোচবিহারের ভারতভুক্তির অব্যবহিত পূর্ব ও পরবর্তী সময়ের রাজনীতি, অতি অবশ্যই সেটা সমকালীন সমাজকে বাদ দিয়ে নয়। কোচবিহার কখনও পরাধীন ছিল না। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ভুটান যুদ্ধের পর থেকে ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মত স্বাধীন কোচবিহারও ছিল ব্রিটিশের অন্যতম করদ মিত্র রাজ্য। তাই পরাধীন ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ছোঁয়া কোচবিহারের মাটিকে খুব একটা স্পর্শ করতে পারে নি। পাশের জেলা জলপাইগুড়ি বা রংপুর যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে টগবগ করে জ্বলছে। রাজন্যশাসিত কোচবিহার তখন কার্যত ছিল শান্ত নিরুত্তাপ। চারের দশকের প্রজামণ্ডল আন্দোলন আর ১৯৪৬ এ রাজার সেনার বিরুদ্ধে অসংগঠিত স্বতস্ফুর্ত ছাত্র আন্দোলন ছাড়া রাজ আমলে তেমন কোনও গণ আন্দোলন বা বিদ্রোহের ইতিহাস আমার জানা নেই। নিপীড়িত রাজবংশী জাতির সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকে রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার সংগ্রাম ও আন্দোলনের শুরুটা কোচবিহারের হলেও রাজরোষে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁকে কোচবিহার ত্যাগ করতে হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁর আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু মূলত হয়ে ওঠে অধুনা বাংলাদেশের রংপুর জেলা।

তবে ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে যে সব বিপ্লবীরা রাজন্যশাসিত কোচবিহারে গা ঢাকা দিয়ে থাকতেন তাদের মধ্যে অনেকেই এখানে গোপনে বামপন্থী সংগঠন গড়ার কাজে জড়িয়ে গেছেন। চারের দশকে ফরিদপুর আর ঢাকা থেকে এখানে পালিয়ে আসেন দুই বিপ্লবী জীবন কৃষ্ণ দে আর প্রবোধ পাল। জীবনবাবু স্থানীয় কমিউনিষ্টি নেতা দেবী নিয়োগী আর বীরেন দে সরকারকে সাথে নিয়ে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ভিত গড়ে তোলেন এই জেলায়। আর নেতাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রবোধ পাল স্থানীয় নেতা নরেশ বসুকে সঙ্গে নিয়ে কোচবিহারে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই চলত গোপনে। পরে জীবন কৃষ্ণ দে ১৯৬২ সালে সিপিআই প্রার্থী হিসেবে তুফানগঞ্জ কেন্দ্র থেকে বিধায়কও নির্বাচিত হন। জীবন সায়াহ্নে জীবনবাবু স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন। জমিদার/জোতদারদের বিরুদ্ধে কৃষক আর ভাগচাষীদের সংগঠিত করতে গিয়ে আমরা গান বেঁধে ছিলাম, "ধনীর বাড়ি চাকরি করে কোন শালা// ধনী খায় মাছ মাংস গরিবক দেয় কাঁচ কলা..."। তিনি বলেছেন, "আমরা কাজ করতাম খুব সাবধানে। কিন্তু মাঝে মধ্যে আমাদের কিছু কমরেডের হটকারি কার্যকলাপ বিপদ ডেকে আনত। একবার মাথাভাঙার নয়ারহাটে আমাদের একটা গোপন সভা চলছিল। সে সময় পাশ দিয়ে রাজার পুলিশ একটা চোরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। ওরা ওদের মত যাচ্ছে। হঠাৎ করে কমরেড দেবী নিয়োগী বলে উঠলেন, পুলিশ কেন লোকটাকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে? সভার মানুষজন বললেন, কমরেড ও এক গৃহস্থের ছাগল চুরি করে ধরা পড়েছে। দেবীবাবু বললেন, ওতো গরীব বেচারা পেটের জন্য হয়ত কিছু চুরি করেছে, আর রাজা যে খাজনা বাড়িয়ে কৃষকের ঘরে ডাকাতি করছে! ধর শালাদের। সভা ভেঙে গেল। কয়েকশ মানুষ দৌড়ে গিয়ে পুলিশগুলোকে দে ধোলাই। চোরটাকে ছেড়ে দিয়ে পুলিশগুলো কোনওমতে পালিয়ে প্রাণে বাঁচল। আমরাও গা ঢাকা দিলাম। কিন্তু পরিণতি হল ভয়াবহ। প্রায় এক মাস ধরে নয়ারহাট আর আশপাশের এলাকায় পুলিশের দমন পীড়ন চলল। অনেক নিরীহ মানুষ ধরা পড়লেন। ঐ এলাকায় আমাদের ঢোকা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।"

চারের দশকের শেষ দিকে কোচবিহারের ভারতভুক্তির প্রাক্কালে কোচবিহারের তৎকালীন আদি বাসিন্দাদের হিতার্থে সংগঠিত হিতসাধনী আন্দোলন সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। মূলত নিজেদের সত্তা বা অস্তিত্ব হারানোর আশঙ্কা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এই আন্দোলন। আন্দোলনের কাণ্ডারীদের মধ্যে কিছু মুসলিম নেতা আবেগতাড়িত হয়ে কোচবিহারকে পাকিস্তানের সাথে সংযুক্তিকরণের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং তারা গোপনে মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সুরাবর্দির সাথে দেখা করে তাঁকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেন। আর এখানকার আদি বাসিন্দাদের একটি গোষ্ঠী নৃতত্ত্বগত ও কিছুটা সামাজিক সামঞ্জস্যের কারণে কোচবিহারকে অসমের সাথে সংযুক্তিকরণের পক্ষে জোর সওয়াল শুরু করেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য আসলে আদি বাসিন্দাদের হিতসাধন হলেও, কিছু উগ্র সমর্থকের সৌজন্যে আন্দোলন কার্যত হিতে বিপরীত হয়ে 'ভাটিয়া খেদাও' আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ গোটা আন্দোলন সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি নিজে কোচবিহারকে স্বাধীন ভারতের সাথে সংযুক্তিকরণের পক্ষপাতি ছিলেন। এই সময় পাকিস্তানপন্থী বেশ কিছু নেতাকে তিনি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোচবিহার ত্যাগের ('কুইট কোচবিহার') আদেশ দেন। কোচবিহার ত্যাগ করে তারা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। এদের কেউই আজ আর বেঁচে নেই। তাই সঙ্গত কারণেই এইসব নেতা বা মন্ত্রীদের নাম আমি উল্লেখ করলাম না। তবে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৪৯-এর ২০ আগস্ট পর্যন্ত এই দুবছর ধরে নীরবে নিভৃতে তোর্ষা দিয়ে অনেক ইতিহাস গড়িয়ে গেছে। বলা বাহুল্য সে ইতিহাস অজ্ঞাতই থেকে গেছে। কোচবিহারের মানুষের স্বার্থে

কোচবিহারের ভারতভুক্তির পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মহারাজাকে কোচবিহার আসনে দাঁড়ানোর জন্য তাঁর ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধুবান্ধব ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাবে তিনি সাড়া দেন নি।

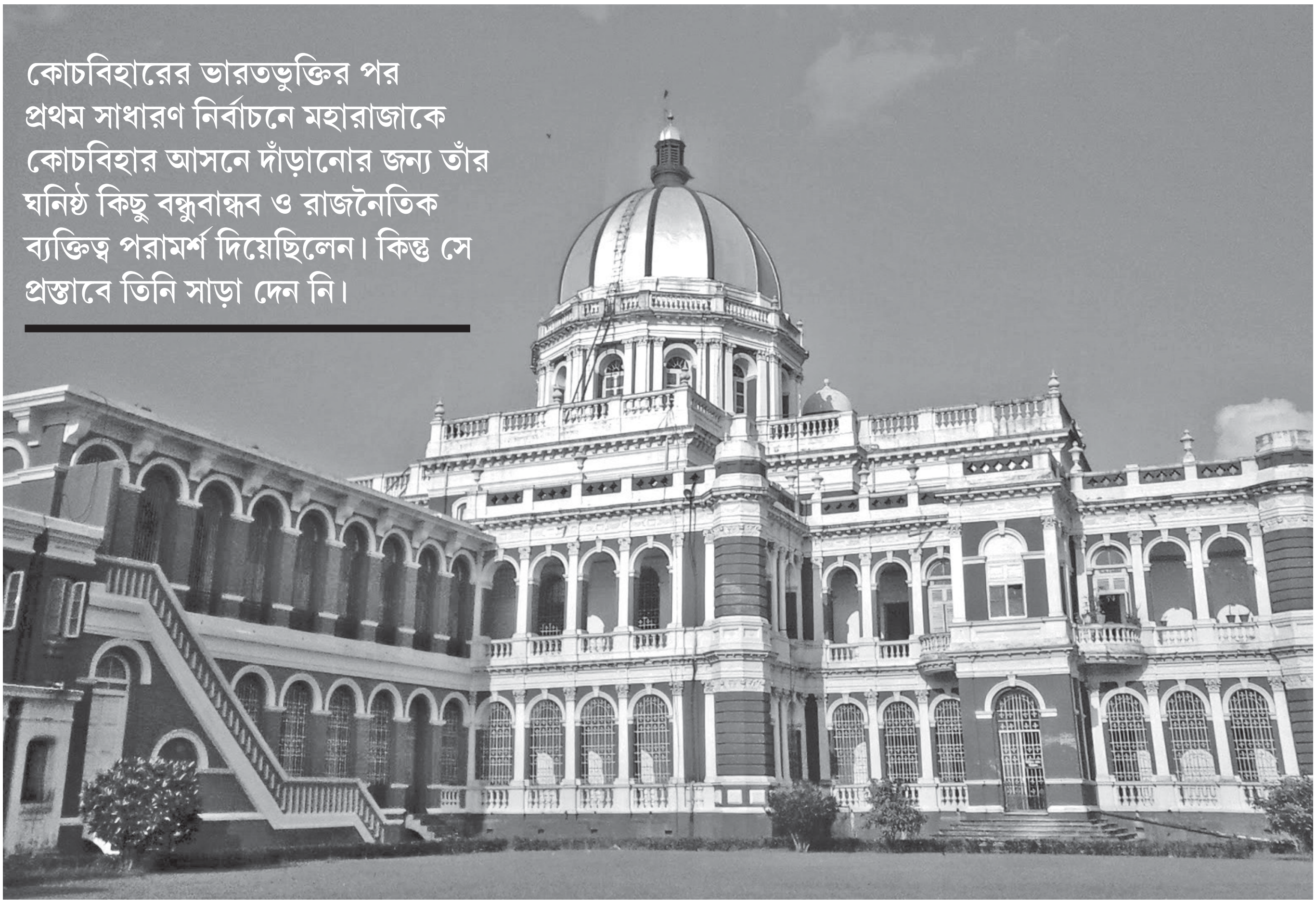

সেই ইতিহাস উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন।

মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ খুবই নমনীয় প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুজ রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ নারায়ণ ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও জেদি প্রকৃতির মানুষ। দক্ষ প্রশাসক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি ছিলেন কোচবিহারের সংযুক্তিকরণের ঘোরতর বিরোধী। প্রয়োজনে যুদ্ধ করতেও রাজি আছেন বলে তিনি দাদাকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। শান্ত ধীর স্থির প্রকৃতির বাস্তববাদী মহারাজা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছোট ভাইকে নিরস্ত করেন। এমনি এক টালমাটাল অবস্থায় গোটা কোচবিহার রাজ্যবাসী যখন ভবিষ্যত চিন্তায় জলের পাতিলে হাত ডুবিয়ে প্রহর গুনছেন, ঠিক সেই সময় খুব গোপনে রাজার গুপ্তচর বাহিনী পাকিস্তানের প্রবক্তাদের সভা সমিতির খোঁজখবর নেওয়া শুরু করে দিয়েছে।

আমাদের সুনীতি রোডের হোমিওপ্যাথিক দোকান 'উত্তরবঙ্গ হোমিও হলে' তখন বসত জমজমাট দাবার আসর। রাজ কর্মচারী বীরু বোস, রামভোলা স্কুলের শিক্ষক সুনীল রায় বাবার সাথে নিয়মিত দাবা খেলতেন। রোজ রাতে সেখানে সাদা পোশাকে দাবা খেলতে হাজির হতেন সুধীর দারোগা। সঙ্গে আসতেন সাদা পোশাকের পুলিশ সন্তোষ নন্দনাবাসী। কোথায় কী সভা হল, সেখানে কে কী বক্তব্য রাখলেন সে সব খবর নিয়ে যেতেন তারা। সারা দিন ধরে গ্রামগঞ্জ থেকে যে সব রুগীরা চিকিৎসা করাতে আসতেন দোকানে, বাবা আর বাবার বন্ধু বীরেশ্বর কাকু তাদের কাছ থেকে সেই সব খবর সংগ্রহ করে রাখতেন। শনি রবি বারে বীরু (বীরু বোস) জ্যেঠু বাবার কাজটা করতেন। পরিমল বলে একজন বেঁটে বামন ছিলেন। ছেলে ছোকরা ওর পেছনে লাগত। তিনি ছিলেন রাজকুমার ইন্দ্রজিৎনারায়ণের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ব্যক্তি। ওকে নিয়ে রাজকুমার হাসি তামাশা করতেন। আসলে ভাঁড়ামির আড়ালে ও ছিল ইন্দ্রজিৎ নারায়ণের খাস ইনফর্মার। কোন অফিসার ঘুষ খাচ্ছে, কোন গোয়ালা দুধে জল মেশাচ্ছে, কোন ব্যবসায়ী চাল ডাল মজুত করেছে, সেই সব খবর সময়মত রাজকুমারকে পৌছে দিত পরিমলদা। তারপর হান্টার (চাবুক) হাতে রাজকুমার মাঠে নামতেন। ইন্দ্রজিৎনারায়ণের ভয়ে অসাধু ব্যক্তিরা তটস্থ থাকত। মাঝে মাঝেই দাবার আসরে হাজির হতেন পরিমলদা। উনিও খবর পৌছে দিতেন রাজকুমারকে। আমাদের একটা লটারির এজেন্সি ছিল। দিল্লি থেকে আইএন চোপড়া বলে একজন ভদ্রলোক আসতেন। সবাই জানত উনি লটারি ডিস্ট্রিবিউটর। উনি বাবার সাথে ইংরাজী হিন্দীতে অনেক কথা বলতেন। আসলে ওই ভদ্রলোক ছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার একজন পদস্থ অফিসার। এই দাবার আসরটা আমাদের ছোটবেলাতেও জমজমাট ছিল। বড় হয়ে বীরু জ্যেঠুর মুখে এই সব কাহিনী শুনেছি। এদের সবাইকে আমি ছোটবেলায় দেখেছি। সুধীর দারোগার ছিলেন রাশভারী চেহারা। গোঁফটা ছিল হিটলারের মতো। একটু পান দোষ ছিল ওনার। ব্যান্ডপার্টির ব্যাগপাইপের মতো উনিও ছিলেন আমার কাছে প্রচণ্ড ভয়ের বস্তু।

অনেক টানাপোড়েনের পর ২০ আগস্ট ১৯৪৯-এ কোচবিহারের তদানীন্তন মহারাজার সাথে ভারত সরকারের সম্পাদিত এক চুক্তি অনুসারের ওই বছর ১২ সেপ্টেম্বর কোচবিহার রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ বিষয়ে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা-পূর্ব ব্রিটিশ ভারতে কোচবিহারের সাথে মূলত কলকাতার যোগাযোগই ছিল সব থেকে বেশি। পরবর্তী সময়ে, ১৯৫০ সালের ১৯ জানুয়ারী কোচবিহার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু কোচবিহারের অর্ধেক জনসংখ্যা আর মাত্র ৩১৫ বর্গ কিলোমিটার বেশি আয়তন নিয়ে গোয়া রাজ্যের মর্যাদা পেলেও কী কারণে কোচবিহার স্বাধীন ভারতে রাজ্যের মর্যাদা পেল না, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা। তাছাড়া পুদুচেরী (৪৯০ ব. কিমি), দমন ও দিউ (১১১ ব. কিমি), এমন কি মাত্র ৩০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন আর ৬৫ হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত লাক্ষাদ্বীপের ভাগ্যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তকমা জুটলেও কোচবিহারের ভাগ্যে সেটাও কেন জুটল না, স্বাধীন ভারতে কোচবিহারের ভাগ্য বিধাতারাই সেটা বলতে পারতেন। জনসংখ্যার অনুপাতে এইসব রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলো কোচবিহারের ধারে কাছেও আসে না।

যাইহোক রাজ্য থেকে জেলাতে রূপান্তরিত হয়ে কোচবিহারের ভাগ্য খুলেছে না কপাল পুড়েছে সেটা তো ভুক্তভোগীরাই জানেন! এ নিয়ে বিশ্লেষণ করাও আমার এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য নয়। কালের নিরিখে আমি শুধু বলতে পারি রাজতন্ত্র অস্তমিত, গণতন্ত্র ভাস্বর। আমরা এখন সবাই রাজা!

(চলবে)

ইটিং @ সাগর দিঘি স্কোয়ার

কোচবিহার স্পেশাল

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

তখন বিকেলের শেষ সূর্য তোর্ষার বুকে ঘুমোতে গেলে অফিস-কাচারি পাড়ায় নিঝুম সন্ধ্যা নামে। সারাদিনের শশব্যস্ত মানুষের ভিড় আর শয়ে শয়ে দুই-তিন-চার চাকাদের মিছিল কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। তারপর কোনও এক জাদুকাঠির ছোঁয়ায় দিনের শশব্যস্ত সরকারি অফিস চত্বর এক লহমায় বদলে যায় আলো ঝলমলে ফুড বুলেভার্ডে। কোচবিহারের প্রাণকেন্দ্র সাগর দিঘির চারপাশ ভরে ওঠে নানান ধরনের অস্থায়ী খাবার স্টলে। প্রাচীন রাজনগরের ফুসফুস থেকে প্রাণবায়ু ভরে নিতে হাজির হয় তাজা ফুসফুসের দল, আর তাদের পরিসেবায় শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মাথায় নিয়ে স্বনির্ভরতার লড়াই চালায় আরেক দল তরুণ। সন্ধ্যার পর হেরিটেজ বিজড়িত সাগর দিঘি স্কোয়্যার যেন রূপকথার কোনও জাদুপুরী। না, শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক বা জলপাইগুড়ির রাজবাড়ি দিঘির সান্ধ্য সমাবেশ বর্ণে বৈচিত্রে এর ধারে কাছে আসে না। সন্ধের এই কয়েক ঘন্টা সাগর দিঘির যাবতীয় অবহেলা অভিমান কোথাও হারিয়ে যায় ঝকঝকে তারুণ্যের উচ্ছাসে।

সন্ধ্যে ঘনাতেই তাই ডেস্টিনেশন সাগর দিঘি। দিঘির ঘাট আর অফিসের সিঁড়ি ভরে ওঠে নানান বয়সী মানুষের ভিড়ে, সান্ধ্যকালীন রোয়াকি আড্ডায়। প্রবীনদের আড্ডার ফাঁকে চলে লাল চা অথবা লেবু চায়ের মৌতাত। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষেরা রসনার অমোঘ টান এড়িয়ে এক মনে দ্রুত পায়ে কয়েক পাক সাগর দিঘি প্রদক্ষিণ করে বাড়ির পথ ধরে। স্কুল বা কলেজ পড়ুয়ারা হাত খরচের পয়সা বাঁচিয়ে মাঝে মধ্যে ঢুঁ মেরে যায় এসব স্টলগুলোতে। তারপর আড্ডাবাজ খাদ্য রসিকদের ভিড়ে ব্যস্ততা বাড়তে থাকে সাগর দিঘি স্কোয়ারের খাবারের দোকানগুলোতে।

একমাত্র পশ্চিম পাড়ের দিকটা বাদ দিয়ে বাকি তিনটে দিকেই বসে থাকে খাবারের স্টল। বেশিরভাগ দোকানই হয় মোবাইল ভ্যান। সুন্দর করে সাজানো গাড়িগুলোই এককেটা চলতি ফিরতি দোকান। কিছু ঠেলা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে স্বল্প পুঁজির কয়েকটি দোকান, যারা ছোট্ট টেবিলের উপর সাজিয়ে বসে তাদের খাদ্যের পসরা। খুব খারাপ বিক্রিবাট্টা না হলে এরা ক্রেতা সামলাতে হিমশিম খেয়ে যায়। সাগরদিঘির তিন দিক মিলে প্রায় ৩০ টির মত দোকান খাদ্যরসিকের রসনা তৃপ্ত করে। এই সাগর দিঘির ফুড হাবের সামনে কোথায় লাগে বিভিন্ন শপিং মলের ফুড হাব বা ফুড কোর্ট ! কী নেই কোচবিহার সাগর দিঘির পারের এই ফুড হাবে ! এক দিকে লাল চা, লেবু চা টু ক্যাফে কফি ডে, অন্যদিকে বাঙ্গালী ,মুঘলাই, চাইনিজ থেকে কন্টিনেন্টাল — সবকিছুরই পকেট ফ্রেন্ডলি সংস্করণ পাওয়া যাবে এখানে।

সন্ধেবেলায় সাগর দিঘির দক্ষিণ পারে গেলেই চোখে পড়বে শহীদ বেদির সামনে রাস্তার ধারে মাটিতে বসে ছোট ছোট লোহার কড়াইতে কাঠ কয়লার গনগনে আঁচে চলছে ভুট্টা সেঁকা। ১০ টাকা দিয়ে কিনে নুন লেবু মাখানো হালকা গরম ভুট্টার গায়ে একটা কামড় দিন, হলফ করে বলতে পারি মন ভাল হয়ে যাবে। ঘটি গরম, বাদাম ভাজা, ছোলা ভাজা, বারো ভাজার সাথে আইসক্রিমের বিক্রিও কিন্তু মন্দ হয় না। তবেঁ সবকিছু ফিকে হয়ে যায় ফুচকার চাহিদার কাছে। এখানে সাধারনত কম বয়েসিদের ভিড়। এমনি ফুচকার সাথে দই ফুচকার পাবলিক ডিমান্ড খারাপ নয়। সাথে থাকে পাপড়ি চাট। ফুচকার এই দোকানটা বসে পুরসভার সামনে চিলা রায়ের মূর্তির নীচে। সপ্তাহে মাত্র দুদিন শনি রবি বারে এর দেখা মেলে। কথায় কথায় জানা গেল এই দুটো ছুটির দিনেই আয় হাজার বারোশো টাকা ছাড়িয়ে যায়।

দিনের বেলা পুরসভার সামনের খোলা জায়গাটা ভরে থাকে বিভিন্ন গাড়ি, বাইক, সাইকেল আর পুরসভায় নানান কাজে আসা মানুষের ভিড়ে। সন্ধেবেলা সেখানেই আলো ঝলমলে ফুড হাবের হরেক স্টল। ছোট বড় মিলিয়ে ৯-১০ খানা খাবার স্টল থাকে এই জায়গায়। একটি ঠেলায় পুরোনো দিনের হিন্দি গান শুনতে শুনতে খেতে পারেন ঘটি গরম, বারোভাজা বা ফুচকা। পাশের ঠেলাতে মাত্র ১০ টাকায় পেয়ে যাবেন মুম্বাইয়ের বিখ্যাত বড়াপাও। সম্পূর্ণ নিরামিষ এই দোকানে ভেজ কাটলেটের সাথে ২০ টাঁকায় লঙ্কার চপও পাওয়া যায়। শীতের সন্ধ্যায় গরমাগরম ঝাল ঝাল লঙ্কার চপে কামড় দিন, তারপর এক কাপ কফি। ব্যাপারটা জাস্ট জমে যাবে। সন্ধ্যে থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত গড়ে ৩০০ বড়াপাও বিক্রি হয় এই স্টল থেকে। এগুলো খেতে ইচ্ছে না করলে কোনও অসুবিধা নেই। পাশেই আছে গরমাগরম ভাপা পিঠে। একটু দক্ষিণ ভারতীয় খাবার ট্রাই করতে চাইলে চলে যান ধোসার স্টলে। প্লেন ধোসা, মসালা ধোসা, পানীর ধোসা, চিজ ধোসা, পিৎজা ধোসা — এ ধরনের নানান স্বাদের ২৫ রকমের ধোসা পাবেন এখানে, দাম ৩০ টাকা থেকে শুরু করে ১১০ টাকা। গড়ে রোজ ৭০ পিস ধোসার বিক্রি আছে এখানে। ক্ষুদের জনপ্রিয়তম আইটেম ৯০ টাকায় পনীর চিজ ধোসা।

. হঠাৎই মনমাতানো বিরিয়ানির গন্ধ আপনার নাকে এসে লাগতে পারে। গন্ধের উৎপত্তিস্থলের খোঁজে গিয়ে দেখবেন, 'হাউ মাউ খাউ'-এর ফুড ট্রাক তৈরি আপনার টিফিন টু ডিনার এর নানান আইটেম নিয়ে। আছে তন্দুরের মোবাইল গাড়ি। দৈনিক গড়ে ১৫ হাজার টাঁকার খাবার বিক্রি হয় এই স্টলে। তন্দুরের হরেক আইটেম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের রোল পাওয়া যাবে এদের ছোট গাড়িটাতে। সেই সাথে ৯০ টাকায় চিকেন বিরিয়ানি। কপাল ভাল থাকলে পোলাও, মাটন কষা বা মাটন বিরিয়ানিও জুটে যেতে পারে কোনও বিশেষ দিনে। একমাত্র এখানেই পাবেন বিভিন্ন ধরনের কাবাব — চিকেন বটি কাবাব, রেশমী কাবাব, শিক কাবাব, টিক্কা কাবাব, টেংরি কাবাব ছাড়াও এখানে পাবেন চিকেন তন্দুরি ৩০০ টাকা এক প্লেট। দিন কয়েক হল এদের নতুন সংযোজন মাটন শিক কাবাব। এদেরই বড় গাড়িতে ভীষণ ডিমান্ড ৪০ টাকায় এক প্লেট ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এর। ৭০ টাকা থেকে শুরু করে ১৪০ টাকা প্লেটএ পাবেন নানা ধরনের চাওমিন। ৮০ থেকে ১৪০ টাকা প্লেট হিসেবে পাওয়া যাবে ফ্রায়েড রাইস ও পাস্তা। বার্গার শুরু ৩০ টাকা থেকে। দু পিস চিকেন ললিপপ ৪০ টাকা হওয়াতে পকেটেও চাপ পড়ে না। এই দোকানের স্টিম চিকেন টেস্ট করে দেখতে পারেন, দাম পড়বে ৫০ টাকা। ততবে এদের সিগনেচার ডিশটির নাম অ্যাংগ্রি উইংস। দু পিস পাবেন ৫০ টাকায়। এছাড়াও ক্রিস্পি চিকেন, চিকেন পকোড়া, চিকেন ফিঙ্গার, এগুলোতো পেয়েই যাবেন এই হাউ মাউ খাউ-তে। ডিনার নিতে চাইলে ফ্রাইড রাইস বা চাওমিনের সাথে নিয়ে নিন ১২০ থেকে ১৪০ টাঁকার মধ্যে চিকেন সিক্সটি ফাইভ, চিলি চিকেন, চিকেন মাঞ্চুরিয়ান, সুইট এন্ড সাওয়ার চিকেন বা সেজওয়ান চিকেন। মোমোরও বেশ কিছু ভ্যারাইটি এখানে পাবেন। তার মধ্যে এক প্লেট ফ্রায়েড মোমো ৬০ টাকা দিয়ে টেস্ট করা যেতেই পারে। এছাড়াও কফি আর কোল্ড ড্রিংক্স তো আছেই। গড়ে ২০০ প্লেটের মত খাবার বিক্রি হয় এখানে। ৯ জন ছেলে চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও হাসিমুখে দোকান ও ভোজন রসিকদের সামলে চলছে সমান তালে।

এখানেই দেখা মেলে আর একটি ফুড ট্রাকের — জায়কা। এদের কাছেও চিকেনের বিভিন্ন স্ন্যাক্স আইটেম, তন্দুরি, বিরিয়ানি পাওয়া যায়। এরও ফ্যান ফলোয়ার মন্দ না।

পাহাড়ের কাছাকাছি হওয়ার কারনে এই অঞ্চলে মোমো বেশ সুপরিচিত। ফুড হাবের প্রায় সব দোকানে মোমো পাওয়া গেলেও বেশ কয়েকটি এক্সক্লুসিভ মোমোর দোকান এখানে দেখা যায়। যা

চালায় মূলতঃ নেপালি মহিলারা। ভেজ ও চিকেন, দু ধরনের মোমোই এই দোকান গুলোতে পাওয়া যায়। চাহিদা এতোটাই, একটু রাতের দিকে গেলে এদের কাছে মোমো যে পাওয়া যাবে তার গ্যারান্টি নেই। স্বল্প পুঁজিতে এই ব্যবসা করে তারা রীতিমত তাদের সংসার চালাচ্ছে। এমনই একটি দোকানের দেখা মিলবে দিঘির পূর্ব পারে এস ডি ও অফিসের কাছে। একটি নেপালি দম্পতি এই দোকানটা চালায়। ভেজ মোমো ৩০ টাকা, চিকেন মোমো ৪০ টাকা প্লেট। মোমো ছাড়াও এই দোকানে পাওয়া যায় 'টাইফো', একেকটার দাম ৫০ টাকা। অল্প মোমো দিয়ে শুরু করে আজকের দিনে তাদের দোকানে প্রায় ১৫০০ মোমো বিক্রি হয়। আগে টাইফো বানাতো মাত্র ৫টি , এখন চাহিদা বাড়ার জন্য টাইফো বানায় ২০টি। শীত কালে এদের স্পেশাল আইটেম থুকপা। দু বছর আগে একটি ছোট্ট টেবিল নিয়ে দোকান করা শুরু করেছিল তারা। আয় বাড়ার সাথে সাথে আগের ছোট্ট টেবিল ছেড়ে আর পাঁচ জনের মত একটা ঠেলা নিয়েছে।

সাগর দিঘির পূর্ব পাড়ে কাচারির মোড়ে সন্ধে থেকেই বসে কানাইয়ের 'সুরুচি ফাস্ট ফুড সেন্টার'। ১০ টাকা থেকে ৪০ টাকার মধ্যে এখানে পাওয়া যায় আলুর পরোটা, মোগলাই পরোটা, ভেজ, এগ, চিকেন চপ, চিকেন পকোড়া, চিকেন লালিপপ, এগরোল, মোমো, চাওমিন। এখানে চাইলে পরে আপনি ওমলেটও পেতে পারেন। একটু এগিয়ে গেলেই দুটো ঠেলা নিয়ে দেখা মিলবে বড়ভাই ফাস্ট ফুড সেন্টারের। এখানে ৭ টাকা থেকে ১০০ টাঁকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আগের দোকানের মত সব আইটেম। উপরি পাওনা কাটলেট আর চিংড়ির চপ । এই দোকানের ৭ টাঁকার মাংসের সিঙ্গারার কিন্তু ভাল চাহিদা। ভালো সিজিনে সব আইটেম মিলিয়ে দৈনিক বিক্রি আছে ৫০০০ টাকার মত।

সম্পূর্ণ নিরামিষ আর একটি ফুড ট্রাক 'চটর পটর'। আলু টিক্কি চাট, দই চাট, পাপড়ি চাট, টমাটো চাট, ফ্রাইড আলু চাট এখানের বিশেষ আকর্ষণ। মূলতঃ চাটের জন্য পরিচিত হলেও এই স্টলে পনীর স্প্রিং রোল, মোমো, বার্গার, পিৎজা, চাওমিন এবং পাওভাজিও পাওয়া যায়। স্টলটির বৈশিষ্ট্য হল এখানে পরিবেশ-এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। তাই প্লাস্টিক নয়, এখানে দেখা মেলে মাটির পাত্রের। বিভিন্ন ধরনের চাট মাটির পাত্রে সাজিয়ে পরিবেশন করা হয় চটর পটরে খেতে আসা মানুষদের। ভালো সময়ে দৈনিক সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকার ব্যবসা হয় স্টলে। এযা ফাস্ট ফুডে পাওয়া যাবে রকমারি ধোসার সাথে ডাল বড়া।

একই লাইনে ট্রেজারির সামনে রয়েছে আরেকটি প্লাস্টিক ফ্রি স্টল 'ভাই ভাই ফাস্ট ফুড সেন্টার'। একটি মেয়ে একা হাতে চালাচ্ছে এই স্টলটি। ভেজ ননভেজ দু রকমেরই আইটেম আছে এখানে। ২০ টাকা থেকে ১০০ টাকার মধ্যে নুডুলস, চাওমিন, মোমোর সাথে এই স্টলে পেয়ে যাবেন নানা ধরনের সুপের আইটেম। এই রাস্তায় 'লাভ বাইটস' সহ এ ধরনের আরও কয়েকটি স্টল আছে।

শীতের দু তিন মাস পাওয়া না গেলেও গরমকালে অবশ্যই পেয়ে যাবেন বেশ কয়েক রকমের ঠাণ্ডা পানীয় সোডা শপ। একটি মারুতি ভ্যানের মধ্যেই আপনার পছন্দের নানা রকম ভ্যারাইটির ড্রিংস নিয়ে হাজির এরা। প্রতি গ্লাস ১০ টাকা। আরও একটু এগিয়ে গেলেই পেয়ে যাবেন একই ধরনের

আইটেমের তিনটে স্টল। মোমো, চাওমিন, চিকেন লেগ ফ্রাই, চিকেন পকোড়া এসব নিয়ে হাজির আপনার রসনার তৃপ্তির জন্য। দোকানগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় সারাবছর লেগেই থাকে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের উল্টোদিকে বসে কয়েকটি চাট ভাণ্ডার। এই চত্বরের মধ্যে এই চাটের দোকানগুলিই সবচাইতে পুরনো।

গোটা সাগরদিঘির এই ফুড হাবের মধ্যে আলাদা করে যার কথা না বললে এই লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তা হল সি এফ সি। পুরো নাম কোচবিহার ফ্রায়েড চিকেন। সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক এই ফুড ট্রাকে আপনি পেয়ে যাবেন নতুনত্বের স্বাদ। কোচবিহারে ফ্রায়েড চিকেনকে জনপ্রিয় করার পেছনে এদের অবদান অনস্বীকার্য। এখন বিভিন্ন জায়গায় স্টিম চিকেন পাওয়া গেলেও এই আইটেমটা কিন্তু প্রথম সিএফসির হাত ধরেই রাজনগরে এসেছিল। মুঘলাই কন্টিনেন্টাল দু ধরনের ফুড আইটেমই এখানে পেয়ে যাবেন। জনপ্রিয় আইটেমগুলোর মধ্যে ৪০ টাকায় পাবেন হট ব্রেড। একটা খেলেই পেট ভরে যাবে। ৬০ টাকায় টেস্ট করতে পারেন ক্রিস্পি চিকেন, ক্রিস্পি ফিশ, জালি কাবাব, চিজ রোল। স্টিম চিকেন, চিকেন ননদু ৭০ টাকায়। নতুন আইটেম চাইলে দেখতে পারেন ৮০ টাকায় চিকেন সাসলিক বা বাফেলো উইংস। মন্দ লাগবে না। বাড়িতে ডিনারের একঘেয়েমি কাটাতে এখানের মুর্গ পোলাও, মাটন রেজালা পোলাও ও চিকেন তেহারি মাঝেমধ্যে চলতেই পারে। একমাত্র এখানেই পাবেন 'ক্যাফে কফি ডে' র কফি। যেহেতু এই স্টলের শেফের রয়েছে ১৬ বছরেরও বেশি ফাইভ স্টার হোটেল এবং রিসর্টে কাজের অভিজ্ঞতা, সেই কারণে এদের খাবার পরিবেশনে একটা আলাদা আর্ট আছে। খাবারে নতুনত্বও আছে। এছাড়া হাইজিনের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এখানে। সিএফসি-র কর্মী সংখ্যা ১২ জন। ৮ জন বাইরের আর নিজের বাড়ির ৪ জন সদস্য মিলে রাজনগরের ভোজন রসিকদের রসনা তৃপ্ত করে চলছে সিএফসি। সাধারণত দৈনিক গড়ে ১২ হাজার টাকার মত ব্যবসা হলেও খারাপ আবহাওয়ায় তা ৩ হাজারেও নেমে আসে বলে জানালেন এই স্টলের কর্ণধার।

এই দোকানের পাশেই রয়েছে দই ফুচকার একটি স্টল। সাগর দিঘির উত্তর পাড়ে এই দুটো স্টল ছাড়া খাবারের আর কোনও দোকান আজকাল আর দেখা যাচ্ছে না। তবে ৪-৫ টা ফলের দোকান দেখা যায় রাতের দিকেও।

সাগর দিঘির তিন পাশের প্রতিটি স্টলেই কিছু না কিছু ইউনিক ব্যাপার রয়েছে। সকল বিক্রেতারই লক্ষ্য তাদের কাছে আসা মানুষদের ভাল জিনিসটা তুলে দেওয়ার। মুখ্যমন্ত্রী হালে 'চপ শিল্প' নিয়ে বেকার বা শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের উৎসাহ দিলেও সাগর দিঘির এই চত্বরে কিন্তু তেলে ভাজা, চপ বা এই জাতীয় খাবারের ব্যবসা চলছে বহু বছর ধরে। যার শুরু হয়েছিল কয়েকটি চাটের দোকান দিয়ে। পরবর্তীতে বেনফিশের একটা ফুড ট্রাক বসত কিছুদিন। বর্তমানে সন্ধে ৬টা থেকে রাত ১০টা, এই চার ঘন্টায় খাবার নিয়ে সৎ পরিশ্রমী পথে রোজগার করে ডজন তিনেক স্টল যেমন হাজার হাজার মানুষের রসনা তৃপ্ত করছে, তেমনি শ খানেক তরুণ খুঁজে পেয়েছেন কর্মসংস্থানের পথ। তেমনই ব্যবসায়িকভাবে স্টলগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে আরও কত জন তার কোনও হিসাব কেউ রাখে না।

স্টল যারা চালাচ্ছেন তাদের অনেকেই শিক্ষিত, অনেকেই উচ্চমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। চটর পটরের কর্ণধার রান্নার দৌলতে মাস্টার শেফ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে, তেমনি 'হাউ মাউ খাউ'-এর কর্ণধারের আছে কলকাতায় বেশ কয়েক বছরের ফুড সেক্টরে থাকার অভিজ্ঞতা। এখানে এমন অনেকেই আছেন যারা রান্নাবান্নাকে প্যাশান হিসেবে নিয়ে সেটা দিয়েই জীবনে এগিয়ে যেতে চাইছে। গোটা ডুয়ার্সে এত বড় ফুড হাব আর কোথাও দেখা যায় না। এখানে যাদের স্টল, তারা প্রত্যেকে একটি বিষয়ে একমত, খাবারের কোয়ালিটি যদি ঠিক থাকে, তাহলে মানুষ খেতে আসবেই। এই ফুড সেক্টরে আরও শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসুক। তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত বলে জানালেন সি এফ সি এবং হাউ মাউ খাউ এর কর্ণধারেরা। তাদের বক্তব্য, কাজের প্রতি ভালবাসা থাকতে হবে, আর মনে এই ভাবনাটা রাখতে হবে যে আমি একটু অন্যরকম ভাবে করব। তবে কোনও কিছুই আর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কাঠ বেকারত্ব যেখানে আজ এক অনিবার্য ডেস্টিনি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে কোচবিহারের সাগর দিঘি স্কোয়্যার কর্মসংস্থানের এক স্বতঃস্ফূর্ত মহা আয়োজন বলা যেতেই পারে।

বউ সাথে পথে পথে। পর্ব-৮

তরাই-ডুয়ার্সের এলোমেলো গল্প

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

বেড়ানোর বীজ, নেশা, অচেনার আনন্দকে দেখার জন্য আকুলি বিকুলি কৈশোর থেকে। সেইসময় বেড়ানোর পরিধি বেশি দূরে নয়। দুয়ার হতে অদূরে। হাকিমপাড়ার বাড়ি থেকে দু'পা গেলেই ধানখেত, জঙ্গল, রাজবংশী সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি। শোনা যেত ঢেঁকিপাট, ছামগায়েনের শব্দ। শান্ত নিরিবিলি দিনযাপন। ডাব গ্রাম বিট, ফারাবাড়ি ফরেস্ট, ঘন শালবন। ফুলেশ্বরী জোড়াপানি শাহু নদী আমবাড়ি বেলাকোবা ধু ধু মাঠ। শীতে ঝরাপাতা গান, পাখিদের সমবেত কলতান জঙ্গলের সরু পথে আপনমনে হেঁটে বেড়ানোর আনন্দ। সে যুগে খোঁয়াড় ছিল মেলা। গরু, ছাগল, গেরস্ত বাড়িতে অত্যাচার করলে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দিত। সন্ধ্যা হলেই শিয়ালের হুক্কাহুয়া, আর সুমধুর মোরগের ডাক। তারপর কৈশোর থেকে যৌবনে পা রাখতে রাখতে ছুটোছুটি দ্বিগুণ হল বন্ধু জুটিয়ে হাকিমপাড়ার বাড়ি থেকে পদব্রজে মাল্লাগুড়ি। পঞ্চনৈ দাগাপুর সুকনা হয়ে অরণ্য ভেদ করে লুকোচুরি খেলতে খেলতে সুকনা লেক। দিনভর কাঠবেড়ালির মতন তিড়িং বিড়িং করে বেড়ানোর জবর আনন্দ। ধীরে ধীরে বেড়ানোর মাদকতা দিনকে দিন বাড়তেই থাকে। একবার শালুগাড়া হয়ে সরস্বতীপুর চা-বাগানের দিকে শেয়ালের গর্ত খুঁজে বেড়ানো। পাগলামির শেষ নাই। আমার সব থেকে পছন্দের প্রিয় জায়গা যেখানে বারংবার গিয়েও আশ মেটেনি নাম বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলমহল, পরবর্তীকালে নামকরণ হয় মহানন্দা অভয়ারণ্য। যার মুখ্য কার্যালয় এবং প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয় হিলকার্ট রোডে সুকনাতে হেরিটেজ বনবাংলোর পেছনে। যৌবনে বন্ধুরা মিলে তৈরি করি ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ডলাইফ। আমাদেরকে বুদ্ধি পরামর্শ, ফ্লোরা ও ফনা বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতেন দিল্লির দেবনাথ মুখোপাধ্যায়। এই সমিতিতে অনেকে যুক্ত হল। উদ্দেশ্য একটাই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। বলা যায় উত্তেজনার আগুন পোহানো।

শিলিগুড়ির কাছেই সেবক রোড ধরে একটু এগলেই সারি সারি দেবদারু গাছের শোভা। পাশাপাশি আম, জাম, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া, ছাতিম— চারিদিক সবুজে সবুজ। চমকডাঙি, লালটং, চকলং, ঘোড়ামারা, গুলমাখোলা, নন্দীখোল, সেবক পাহাড়, বাঘপুল। তখন সেবক ছিল শান্ত, নির্জন— এখন ভয়ঙ্কর ঘিঞ্জি ও দূষণে আক্রান্ত। আমরা দল বেঁধে নদী খোলা হয়ে অরণ্যপথে বেরিয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে গুলমাখোলা স্টেশনে আশ্রয় নিই। আমাদের দলে তখন দলপতি ছিলেন উপেনকাকা, শিবশ্যামদা, শঙ্কর দত্ত, অমল, কমল, বিশু মহারাজ। সে বড় সুখের দিন, আনন্দের ঝর্নাধারায় ভেসে চলা। পিছুটান কিছুই ছিল না। তবে গুরুজনদের বকুনি তিরস্কার জুটত অবিরাম। ১৯৮০ সালে একপাল হাতি গুলমাখোলা রেলস্টেশন, রেল কোয়ার্টার গুঁড়িয়ে তছনছ করে দেয়। পরদিন আমরা দেখতে যাই হাতিদের আক্রমণের চিহ্ন। স্টেশনমাস্টার লুঙ্গি পরে সঙ্গীদের নিয়ে কেবিনঘরে। গুলমাখোলা এখন পরিত্যক্ত। কেবিনঘর, মহানন্দা অভয়ারণ্যের নজরমিনারে পরিণত। শেষ বয়সে স্মৃতিরোমন্থন আর জাবর কাটা।

বেশ ছিলাম। গুরুগিরি আর মন চলো বনে। বিয়ে-থা'র পর বনেবাদাড়ে বেড়াবার নেশা এতটুকু কমে নাই। গিন্নি বলে, জঙ্গলে ভয় নাইকো? এই যেমন ভূতপ্রেত, সাপ, হাতি, বাঘ, দুষ্টু লোক। বললাম থাকতেই পারে। তাতে ভয়টা কীসের? মানুষের চেয়ে ওরা শতগুণে ভাল। আমার সঙ্গে চল নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে। মা বলত, 'জঙ্গল ছাড়া বেড়ানোর আর জায়গা খুঁইজা পাস না'। গুরুজনেরা কেউ পছন্দই করত না আমার বাউন্ডুলেপনা। বিকেল বেলায় গোপালের মা, মনা ঠাকুমা, ভোলার মা, আরও অনেক সদবা বিধবা আসতেন মা'র সঙ্গে গপ্পো করতে। গিন্নি বলত, তোমার এই ধুতি শার্ট পাঞ্জাবি আর কাঁধে ঝোলা কবে থেকে পথ চলা এবং বিড়ি সিগারেট খাওয়া? অ্যাসট্রে উপচে পড়ত। মধ্যরাত পর্যন্ত ছাইভস্ম লেখা যার মাথামুণ্ডু নাই। শনি রবি এলে চলে যাই কাছেপিঠে কোথাও। কত অচেনার স্বর্গে পরিক্রমা করেছি। অপরূপ শিশির বিন্দুর রূপ। দু'দিন আগে রাজাভাতখাওয়ার গ্রাফিলিস ইস্টিকুটুমে ছিলাম। একদিন ভোরে গিন্নি খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তোলে, দেখে যাও সবুজ মাঠ শিশির জমে রোদের আলোয় মুক্তোর মতন ঝলমল করছে।

ভ্রমণে কত বিভ্রম। কত ব্যাঘাত, ঝামেলা। একবার কী হল পঞ্চবটীতে দু'জনে আছি বেশ আনন্দে। বিকেলবেলায় দু'জনে একটু আড্ডা দিতে যাব তপনের বাড়ি হয়ে পরাণের বাড়ি। আমি বাইরে বসে আছি। গিন্নির মেকআপ চলছে। ওমা হঠাৎ চিৎকার। কী হল আবার! অনন্ত, রবীন, মায়াদিরা ছুটে আসে। চপ্পলে সাপ গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে। অনন্ত বলে, 'বৌদি ওটা হেলে সাপ'। হেলেদুলে সাপ চলে গেল শান্তনুদের টাসকার ডেনের দিকে। তাতে কী! গিন্নি খেপচুরিয়াস। বলে, 'আমি থাকব না'। বললাম কোথায় যাবে? তোতন, না সিভার লজে না অন্য কোথায়; শেষ পর্যন্ত লোটাকম্বল নিয়ে সটান মানুদের কাঠের দোতালায়। মানুর স্ত্রী গোপাকে বললাম, রাতের অতিথি আমরা। মানু ছুটল সমরের দোকানে গরম সিঙারা, মিষ্টি আনতে। এখন চঞ্চলকে দেখতে পাচ্ছি নিত্য সাপ ধরছে কেঁচোর মতন। ভয়ডর নাই। তাই বলছি গিন্নিকে সঙ্গে করে যেখানে যাই সমস্যা ওই থাকার ব্যবস্থাপনা— যেমন তোশক বালিশ কোণ খুনচি, তক্তাপোশের নিচে একটুও ফাঁকফোকর থাকলে চলবে না। মাঝে মাঝে বিরক্ত প্রকাশ করলে দু'জনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেঁধে যায়। শান্ত হতে একটু সময় নেয়। যাইহোক প্রদোষ বাবাজীর ভাষায় বউ সাথে পথে পথে তো ঘুরছি। আর অভিজ্ঞতা তিক্ত কটু মিষ্টি যা কহতব্য নয়। যখন একাকী ঘুরে বেড়িয়েছি ধর্মশালা, মন্দির চাতালে, বারান্দায়, ধাবায়, খাটিয়ায় মেটেলির কালী মন্দিরের বেঞ্চে বিশ্রাম করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। বাকিটুকু দীর্ঘ ইতিহাস।

জঙ্গলের প্রতি প্রেম-ভালবাসার কথাই আগেই বলেছি। এখনও ফুরসৎ পেলে চলে যাই। যৌবনে প্রায়শ চলে যেতাম দশ মাইল সেবক বনবিশ্রামগৃহ। কাচে ঘেরা অসাধারণ বাংলো। ঘোর শালবনের

ভেতর ছোট্ট বাংলোটিকে ঘিরে কত স্মৃতি। এক শ্রাবণের বর্ষণমুখর দ্বিপ্রহরে চুপচাপ বসেছিলাম। শালবনে বৃষ্টির বাজনা শোনা বড় মোহময়। আবার জ্যোৎস্নায় যেন রূপকথার দেশ। সেই বাংলো নেই, নেই আরণ্যক সৌন্দর্য।

পুরাতন স্মৃতিরেখা থেকে ফিরে আসি। গতবছর হঠাৎ করে যোগাযোগ হল প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে ফেসবুকে। নাম মনে আসছে না কিছুতেই। গোঁসাইপুরে বাড়ি। —'স্যার আপনি ও কাকীমা একবার আসুন আমাদের ব্যাঙডুবি হোমস্টেতে। কবে আসবেন? গাড়ি পাঠিয়ে দেব।' বললাম, 'গাড়ি পাঠাতে হবে না। বাগডোগরার পৌঁছে তোকে খবর দিব। সত্যি বলছি চেনা যায় না, জাঁকজমক শূন্য শিব মন্দির। ফাঁসিদেওয়া মোড়, উড়ালপুল, নগরায়নের ঝলকানি তেমনই বিহার মোড়। দু'জনে নেমে পড়ি গৌড়নিতাই মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কাছে। শ্রীমান গাড়ি নিয়ে আমাদের অপেক্ষায়। দু'হাতে মাছ, মিষ্টি, শাকসবজির পোটলা। আমাদের দু'জনকে অরণ্যবেষ্টিত জংলীবাবার মন্দিরে নামিয়ে দিয়ে হোমস্টেতে চলে গেল। রান্না হবে, তদারকির প্রয়োজন। চমৎকার আরণ্যক পরিবেশ। পাশ দিয়ে ছোট্ট নদী টিপু খোলা, শালবন, টিয়া, ময়না, ছাতারে পাখি আরও নানারকমের পাখিদের চেঁচামেচিতে মুখর। ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে চলে আসি ব্যাঙডুবি হোমস্টে। সত্যি যেন পটে আঁকা ছবি। যেমন গ্রাম, চা-বাগান, জঙ্গল। গোধুলিবেলায় যখন ধনেশ পাখিরা ফিরছে চা-পান করে ঘরে ফেরা এবং জংলীবাবা মন্দিরের অনুভূতি লিখেছিলাম 'এখন ডুয়ার্স'-এর পাতায়। ঘরে ফেরার পথে দু'জনে আবার ঢুঁ মারি আমাদের শিব মন্দিরের কাছে নিউ রংগিয়ায় হিমালয়ান ফুটহিলস নামক হোমস্টেতে। মা, মেয়ে দু'জনে চমৎকার পরিচালনা করছে। আজকাল হোমস্টের আতিথেয়তা অনেক পর্যটকের কাছে জনপ্রিয়। আমার অনুরোধ অন্তত একবার ব্যাঙডুবি হোমস্টে এবং হিমালয়ান হোমস্টেতে থাকুন। আর একটা দিন যদি বাড়তি রাখেন তাহলে ওর্ড, ত্রিহানা, বেলগাছি, মারাপুর, মানঝা হয়ে লোহারগড়। ডানদিকে টিলার উপরে খয়ের বনা বনবাংলো। সম্মুখে নেপাল, মেচি নদী। অরণ্যের সিল্যুট ছবি।

তরাইয়ের চেয়ে অনেক বিশাল, বিরাট ব্যাপ্ত, অন্তহীন সৌন্দর্যের সম্ভার সবুজেমোড়া ক্যানভাস আমার প্রিয় মোহময়ী এনচ্যান্টিং রূপবতী ডুয়ার্স। মনে হয় সব তো দেখা হল না। নিত্যনতুন সৌন্দর্যের হাতছানি প্রতিনিয়ত উদ্বেল করে তোলে। দুঃখ হয় ডুয়ার্সকে আমরা সেভাবে বিকশিত করতে পারলাম না। দু'জনে ডুয়ার্সের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছি তার সামান্যই লিখতে পেরেছি যা আমার অক্ষমতা। মনে পড়ছে সেবক পাহাড়ের ঘাট পেরিয়ে মংপং বনবাংলো। এপারে চমকডাঙা ওপারে মংপং চমৎকার অ্যাম্বিয়েন্স। তিস্তা নদী অনেক নিচে দিয়ে বয়ে চলেছে। সম্মুখে সবুজে মোড়া পাহাড় যার গা দিয়ে মখমলের ঝালরের মতন ঝুলে পড়েছে। আহা মনে পড়ে সেই সন্ধ্যা, রাতের মুহূর্তগুলি। কী গাঢ় নৈঃশব্দের সুর মূর্চ্ছণা। যতদূর মনে পড়ে দোলপূর্ণিমা। ফিনকি দিয়ে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছে। প্যাঁচা, তক্ষকের ডাক, মাঝে মাঝে শঙ্খ ফুঁ দিতে দিতে চলে যাচ্ছে মেল ট্রেন। পাহাড়ের বুকে দাবানল। দাউ দাউ শিখায় পুরনো পাতা পুড়ছে। ভোরে হাতির ডাকে জেগে ওঠা। চৌকিদার ডাকে, হোজুর চিয়া। আমরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকি রৌদ্রস্নাত পাহাড়ের দিকে।

মংপং থেকে এলেনবাড়ি, ওয়াশাবাড়ি। ট্রেনে কিংবা বাসে যেতে যেতে শরতে মেঘমুক্ত আকাশে ঝকমকে নীল পাহাড়, সবুজ বন, আঁকাবাঁকা নদী। দুর্ধর্ষ ছবি। চোখের পলক পড়ে না। ওয়াশাবাড়ি চা-বাগানে সুদীপের কোয়ার্টারে একবার রাত্রি যাপন করি। তারপর চা-বাগান, চোরবাটর, জংলাপথে বাগরাকোটে চুনাভাটির ছোট্ট বনবাংলো। কয়েকবছর আগে ওখানে উত্তরবঙ্গ নাট্য জগতের আসর বসেছিল। মনে পড়ে বছর ৫০ আগে বাগরাকোট থেকে আদার ট্রাকে চেপে আমরা ক'জন মিলে বেড়াতে গেছিলাম কাফের বনবাংলো। আজকের বিখ্যাত লোলেগাঁও কাফের থেকে পায়ে পায়ে উৎরাই রেলী নদী হয়ে কালিংপঙ। বাগরাকোটের উল্টোদিকে সীসা রিভার চা-বাগান শাঁওগাঁও। বাগরাকোটের সঙ্গে যেন নিবিড় সম্পর্ক। এখান

ভ্রমণে কত বিভ্রম। কত ব্যাঘাত, ঝামেলা। একবার কী হল পঞ্চবটীতে দু'জনে আছি বেশ আনন্দে। বিকেলবেলায় দু'জনে একটু আড্ডা দিতে যাব তপনের বাড়ি হয়ে পরাণের বাড়ি। আমি বাইরে বসে আছি। গিন্নির মেকআপ চলছে। ওমা হঠাৎ চিৎকার। কী হল আবার! অনন্ত, রবীন, মায়াদিরা ছুটে আসে। চপ্পলে সাপ গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে। অনন্ত বলে, 'বৌদি ওটা হেলে সাপ'। হেলেদুলে সাপ চলে গেল শান্তনুদের টাসকার ডেনের দিকে।

থেকেই কতবার গেছি চুইখিম, নিমবং, পাবরিংটার। লোলেগাঁও চারখোল, পাবুং, সামতাহার। সস্ত্রীক বেড়াতে যাই চুইখিম। গৌতমবাবুদের চারখোল, গুরুংদের পাবুং-এ। বাগরাকোটের রাস্তা ছিল বোল্ডার বিছান এখন মসৃণ সুন্দর। স্মৃতি সতত সুখের। লিখতে বসে একটু এলোমেলো হয়ে যায়। পাঠক মার্জনা করবেন।

পাবুং থেকে ডামডিম চা-বাংলো, আর সদ্য গড়ে ওঠা রূপকথার দেশ পশ্চিম ডামডিম। পশ্চিম ডামডিমের কর্ণধার শ্রীমান তারক আমাদের দু'জনকে রাক্ষসপুরীতে রেখে যাবার সময় বলে গেল, 'স্যার আপনি তো নিরিবিলি নির্জন শান্ত বেড়ানোর জায়গা খুঁজছিলেন। এখানে অঢেল শান্তি। আপনি আর কাকীমা দু'জনে থাকবেন। সব ব্যবস্থা করা আছে। চা-টা খেয়ে তারক টাটা বাই বাই। চারিপাশ দেখে গিন্নির চোখ কপালে ওঠে। ওমা আমরা দু'জনে এখানে থাকব? আর তো কাউকে দেখছি না। কেন ম্যানেজার, কুক, নিরাপত্তা রক্ষী সবাই আছে। তারক তো বলেই গেল যাহা চাইবেন তাহাই পাইবেন। বটে। একদিকে চা-বাগান অন্যদিকে নদী চর। জায়গাটা আমার ভীষণ পছন্দ হলে কী হবে সঙ্গিনীর ভাল লাগছে না। এই আরেক সমস্যা। নির্জনতা অনেকের কাছে অসহ্য। ম্যানেজারকে গিয়ে বলে, 'জানেন আমার কর্তা লাউ লবণ শূন্য মানুষ। গাছতলায় শুয়ে থাকলেও তার কোনও তাপ উত্তাপ নাই।' নিরাপত্তা রক্ষী বলে, 'কাকীমা টেনশান করবেন না, রাতে আমি আপনাদের দরজার পাশে ভোজালি নিয়ে শুয়ে থাকব। সিটং-এর কাছে আহালদারাতে গিয়েও একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। দু'দিন পশ্চিম ডামডিম, ওদলাবাড়ি, পাথরঝোরা কাটিয়ে চলে আসি মালবাজারে।

মালবাজারের গল্পগাথা শেষ হবার নয়। গ্রাম্যতার খোলস মুক্ত, চা-বাগানের গন্ধ যুক্ত মালের গ্ল্যামারই আলাদা। একদা মালবাজারে রাত্রিযাপনের সুবন্দোবস্ত ছিল না। সে সমস্যা মিটিল টুরিস্ট লজ তৈরি হবার পর। মালবাজারের রূপকার পরিমল মিত্রের নাম মালবাজারবাসী চিরকাল মনে রাখবেন। মালবাজারে আমার প্রথম রাত্রি যাপন যখন আদর্শ বিদ্যাভবনের শিক্ষক নিবাসে। মালের পুরাতন অঞ্চল বানোয়ার বস্তি। মাখনবাবুর দোকান ঐতিহ্য, কিংবদন্তী গবেষণার বিষয়। বাস আড্ডা, স্টেশন পাশাপাশি। আমি প্রায়শঃ যেতাম সাংবাদিক মহাবীর প্রসাদ ছড়ছড়িয়ার বাড়িতে। গেছি নানুবাবুর বাড়ি, টুরিস্ট লজের প্রদীপের কাছে। হারু ঘোষ, মীনাক্ষী ঘোষ, শক্তি ভট্টাচার্য, আমার পুরনো ছাত্রদের বাড়িতে রামপ্রাসাদের গ্রামের বাড়ি আলিশানে, রাজা চা-বাগানে। তবে স্মরণীয় স্মৃতি যা কিনা জীবনে ভোলার নয় তা হল মাল আদর্শ বিদ্যাপীঠের নিচে হলঘরে সারারাত্রি ব্যাপি কবিতা পাঠের আসর। আয়োজক মৈনাক পত্রিকা বাগডোগরা, বিপদভঞ্জনবাবু। মনিভূষণবাবু, দেবুদা, সঞ্চিতা, প্রবীর, জলপাইগুড়ির কবি লেখকদের অনেকে যাদের নাম কিছুতেই মনে পড়ছে না। তবে মাল থেকে দেবুদা, মনিভূষণদা এবং সঞ্চিতাদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম বড়দীঘি, নেপুচাপুর চা-বাগান হয়ে সেন পাড়াতে। সত্যি মনে রাখার মত ঘটনা। দুঃখ হয় দেবুদা, মনিদা কেউ বেঁচে নেই। বেঁচে নেই মৈনাকের কর্ণধার। আমরা বেঁচে আছি। বেঁচে আছি ফেসবুকে। কথা নাই বোবা, ফসিলের মতন। মালবাজার থেকে সোনগাছি। নাখাটি হয়ে বেড়াতে যাই সস্ত্রীক সাকাম ফরেস্ট, মিশন হিল। একদা ঘোরবর্ষায় রয় এন্ড কাজিনের সৃষ্টি টি মোমেন্টস-এ বসে দু'জনে সুরভিত চা পান। ফাগুন চা-বাগানে। একদা মালবাজার থেকে মেটেলি পর্যন্ত ট্রেন যেত। এখন খাগরী হয়ে, লাটাগুড়ি হয়ে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসে যায় চ্যাংরাবান্ধা পর্যন্ত। মাল এখন মহকুমা। ঝলমলে রূপ। রীতিমতন শহুরে ছোঁয়া, হনুমান মন্দির মহাদেবের মূর্তি প্রচুর হোটেল, লজ, রেস্তোরাঁ, কানন উদ্যান তো আছেই। আমি উদ্‌বোধন করেছিলাম সবুজের কোলে। কবিবন্ধু সমীরণ ঘোষ মাল ডাকঘরে কাজ করত। সে-ও চিরতরে চলে গেল। তবে জীবনের মধুময় স্মৃতি মাল কানন উদ্যানের ভিতরে ফুলের জলসাতে মাধবীকুঞ্জে দু'জনের রাত্রি যাপন। মাল নিয়ে বিস্তর লেখালেখি করেছি। ক'দিন আগে রামপ্রসাদের ফোন পাই —দাদা আমাকে ভুলে গেছেন। আবার আসুন আমার নূতন ঠেকে কুমাই চা-বাগানের গায়ে। প্রকৃতির উজার করা সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করবে। কথা দিলাম রামপ্রসাদ এই শীতে না হলেও বসন্তে তোমার কাছে যাব, মিয়া বিবি দু'জনে এক সাথে।

(ক্রমশ)

অনুপম অবসর

জাহির রায়হান

সোশ্যাল মিডিয়া জন্ম দেয় নানা সম্ভাবনার। সম্ভাবনা সৃষ্টি করে উদ্যোগ আর সেই উদ্যোগে উপকৃত হয় অসংখ্য মানুষ। আমাদের সন্টু সেদিন পোষ্ট করল তার অভিনব ভাবনার কথা। সাধারণভাবে আম খেয়ে, আমের আঁটিটাকে ফেলে দেওয়াই দস্তুর। সন্টু'র বক্তব্য অন্যরকম। তাঁর কথায়, 'এঁটো আঁটি পরিস্কার করে সামান্য শুকিয়ে জমা করুন। তারপর যেদিন বেড়াতে যাবেন অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে, ব্যাগে একটা প্যান্ট বা দুটো জামা কম নিয়ে, ভরে নেন সেই জমিয়ে রাখা আমের আঁটিগুলি। ট্রেন বাসের জানালা দিয়ে ছড়িয়ে দেন মাঠেঘাটে। তাৎক্ষণিক লাভে হালকা হয়ে যাবে আপনার ব্যাগ। আর আগামী'র লাভে? মাটি ও জলের সংস্পর্শ পেয়ে একদিন বৃক্ষ হয়ে মাথা তুলবে আমের আঁটিগুলি। পৃথিবী পাবে বৃক্ষরাজি, পরিবেশ পাবে সবুজ এবং মনুষ্য ও পক্ষীকুল ফলমূলের পাশাপাশি পাবে বেঁচে থাকার অক্সিজেন। অলক্ষ্যে চিত্রগুপ্তের গাবদা খাতায় আপনার নামে জমা পড়বে 'পুণ্য'।

আর এক ভদ্রলোকের কথা পড়লাম ফেসবুকেই, তিনি সপরিবার বেড়াতে যান আমাদেরই মত, নানা জায়গায়, নানা স্থানে। তবে তাঁদের বেড়ানোর ভঙ্গিমাটি ভারী মিষ্টি। বেড়াতে বেরিয়ে হাঁটাহাঁটির সময় হাতে রাখা ব্যাগে তাঁরা জমা করেন পথে পথে কুড়িয়ে পাওয়া প্লাষ্টিক, তারপর ডাষ্টবিনে জমা করেন সেই বিষ। কেউ তাঁদের করতে বলে নি একাজ, তাঁরা নিজেরাই মানুষের সেবা করেন নিজেদের মত করে। ভ্রমণকালে এভাবেই তাঁরা খেয়াল রাখেন পরিবেশ এবং পৃথিবীর। তাঁদের এই অসামান্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ সৃষ্টিশীল মনে দাগ কাটে, বহু মানুষ অনুপ্রাণিত হন, শুরু করেন নিজেদের মতো করে ছোটখাট কাজ যাতে ভাল থাকে পারিপার্শ্বিকতা, ভাল থাকে মানুষ।

লেখালেখির সূত্রে আমার সাথে আলাপ হল কলকাতা নিবাসী এক ডাক্তারবাবু'র। সে আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হতে সময় নেয় নি। কর্মসূত্রে কলকাতা নিবাসী হলেও তাঁর মন সর্বদা পড়ে থাকে বড় সাধের উত্তরবঙ্গে। ডুয়ার্সে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেন তিনি, ঠিক আমারই মত। সবুজ বনানী, চিকচিকে পাহাড়ি নদীর রূপালি বালুবক্ষ, তিরতিরে জলপ্রবাহে কুচিকুচি মাছেদের জলকেলি, দূরের উচ্চ-অনুচ্চ পাহাড় প্রাচীর, বিরামহীন ঝিঁঝিঁর ডাক, অভয়ারণ্যের নৈঃশব্দ এবং সর্বোপরি ডুয়ার্সের সরল সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে পাকাপাকি ভাবে কাটাতে চান তাঁর অবসর জীবন। সে অবসরের দিন গোনা শুরু হয়েছে তাঁর, পাশাপাশি চলছে উপযুক্ত

প্রস্তুতিও।

অবসর যাপন যেন শুধুই আলসে কালক্ষেপন না হয় তার জন্য তাঁর চিন্তাভাবনাও সুদূর প্রসারী। সেই চিন্তাভাবনার মধ্যে আমিও রয়েছি কিয়দংশ, বিন্দুবৎ। ডেরা বাঁধার জায়গা কেনা থেকে আস্তানা গড়ে তোলা, সবটারই আমি সাক্ষী কমবেশি। ডুয়ার্সের প্রান্তিক গ্রামের মানুষদের জন্য বিনা খরচে মেডিক্যাল ক্যাম্প, উৎসব লগ্নে বস্ত্র বিতরণ, সাধারণ মানুষের পান যোগ্য পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থাপনা, এবং সম্বৎসর চিকিৎসা প্রদানের পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে সময় কাটে তাঁর। তিনি বলেন, প্রাথমিক কিছু বিষয় মেনে চললেই অনেক রোগভোগ থেকে মুক্তি মেলে জাহির, অবসর গ্রহণের পর ডুয়ার্সের গ্রামবাসীকে সে সচেতনতার পাঠই দেব আমি, তুমি ওদের বাচ্চাদের একটু পড়িও। বিনা বাক্যব্যয়ে অযথা কালক্ষেপ না করে জানিয়ে রেখেছি আমার সম্মতি।

একদিন বললাম, সবই তো হল দাদা, কিন্তু দীর্ঘদিনের এই কর্মকাণ্ডে খরচ যোগাবেন কোত্থেকে? তাই তো! বলে শুরু করলেন মস্তিকের খনন। গরুমারা অভয়ারণ্যের পিছনে দক্ষিণ ধুপঝোরা গ্রামে কেনা বিরাট প্রশস্ত জায়গার একপাশে গড়ে উঠল হোম-স্টে, সেই খনন কার্যের ফলশ্রুতিতে। রাজ্যের বহু মানুষ ডুয়ার্স বেড়াতে আসছেন রোজদিন। বহু মানুষের এখন অবসর যাপনের পছন্দের গন্তব্য সকলের প্রিয় ডুয়ার্স। বহু লোক নিত্যদিন প্রেমে পড়ছেন আত্মমগ্ন ডুয়ার্সের। তাঁদের কথা ভেবেই নির্মিত হলো 'অবসর'। তবে এই উদ্যোগ শুধুই লাভ-ক্ষতির খতিয়ান বা ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য নয়, 'অবসর' আসলে নিরবিচ্ছিন্ন রোজগারের একটা নিশ্চিত উৎস যে আয়ের একটা অংশ ব্যয় করা হবে ডুয়ার্সবাসী'র কল্যাণে। মানুষ ডুয়ার্সে বেড়াতে আসবেন, যেমন অন্যত্র থাকেন, এখানেও তেমনি থাকবেন, আয়-ব্যয় হিসেব করে লভ্যাংশের অংশ দিয়ে করা হবে ডুয়ার্সবাসী'র সেবা। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধীরে ধীরে ডানা মেলল আমাদের প্রাথমিক প্রয়াস। পাশাপাশি থেমে থাকল না মানুষের জন্য কাজও। নির্মাণকার্য চলার সাথে সাথে দক্ষিণ ধুপঝোরা গ্রামের বাসিন্দাদের জন্য আয়োজন করা হল প্রথম ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের। সাড়া পড়ে গেল গ্রাম জুড়ে। কলকাতা ও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের বেশ কয়েকজন চিকিৎসক সাগ্রহে যোগ দিলেন সেই শিবিরে। গ্রামবাসী তাঁদের সমস্যার কথা খোলাখুলি আলোচনা করলেন উপস্থিত চিকিৎসকদের সঙ্গে। প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং বিনামূল্যে ঔষধাদি নিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরলেন সরল মানুষগুলি।

তবে সেটাই শেষ নয়। শারদ উৎসবের প্রাক্কালে অবসর প্রাঙ্গনে আবার বসল শিবির। তবে এবার মেডিক্যাল ক্যাম্প নয়, এবারে নেওয়া হল বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচী। আগত শারদীয়া উৎসবের কথা মাথায় রেখে গ্রামের কচিকাঁচাদের হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন জামাকাপড়। তারা তো নতুন বস্ত্র পেয়ে মহা খুশি আর তাদের হাসি মুখ দেখে আনন্দিত আমরাও। আমরা অনুপ্রাণিত হলাম পুনর্বার, গৃহীত হল আরও সুচারু ও বৃহত্তরভাবে মানুষের জন্য কাজ করার নানাবিধ কর্মসূচী।

মানুষের জন্য যে কাজ করার ভাবনা শুরু হয়েছে তাতে দোসর হিসেবে পাশে পাওয়া গেল

'এইম ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন'কে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে বছরভর 'মেডিক্যাল ক্যাম্প' আয়োজন করে থাকে মানব দরদী এই অলাভজনক সংগঠনটি। তাঁরাও সামিল হলেন 'অবসর'-এর সাথে। গত অক্টোবরে দ্বিতীয় বার আয়োজিত হল চিকিৎসা শিবির। গ্রামের মহিলাদের কথা মাথায় রেখে ব্যবস্থা রাখা হল মহিলা চিকিৎসকেরও। দ্বিতীয় শিবিরে সহযোগিতার হাত বাড়াল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তর। প্রথম ক্যাম্পটি 'অবসর' প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলেও, দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হল মূর্তি নদীর ধারে বন দপ্তরের অফিস চত্বরে। অফিস সংলগ্ন কাঠের বাংলো বাড়িতে শুরু হল এবারের আয়োজন। দুটি শিবিরেই রোগিনীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। গ্রামবাসী একে একে এসে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছ থেকে নিয়ে গেলেন নানাবিধ রোগের নিদান। এবারেও প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হল 'এইম ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন' ও 'অবসর' এর পক্ষ হতে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুগার পরীক্ষার ব্যবস্থাপনাও রাখা হয়েছিল এবারে।

ভালায় ভালয় মিটে গেল সেদিনের আয়োজন। শিবির শেষ হলে উপস্থিত চিকিৎসকদের মধ্যে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী করা হল সামগ্রিক পর্যালোচনা। এধরণের শিবিরের নিয়মিত আয়োজনের পাশাপাশি জোর দেওয়া হল শারীরিক সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রচারকার্যের ওপর। 'অবসর'-এর উদ্যোক্তা ব্যক্তিগত আলাপচারিতা'য় জানালেন, অধিকাংশই পেটের রোগী। পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে, পেটের রোগের সুরাহা হয়ে যাবে অনেকখানি। অতএব সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল গ্রামবাসীদের সুবিধার্থে একটি বৃহৎ পরিশুদ্ধ পানীয় জলের প্ল্যান্ট বসানো হবে এবং সেখান থেকে নামমাত্র মূল্যে গ্রামবাসীদের সরবরাহ করা হবে প্রয়োজন মাফিক পানীয় জল।

তারপর পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাপজোক করে 'অবসর' প্রাঙ্গনের জমির একটা অংশ তুলে দেওয়া হল কর্মোদ্যোগের সাথী 'এইম ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন'-এর হাতে। তাঁরা সেখানে স্থায়ী মেডিক্যাল ইউনিট, টিউটোরিয়াল হোম, কর্মসংস্থানমুখী নানাবিধ হাতের কাজ ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন, উপকৃত হবেন গরুমারা-মূর্তি সংলগ্ন গ্রামের আপামর খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। পানীয় জলের বৃহৎ ইউনিট গড়ে উঠবে আগামী বছর। কিশোরী তরুণীদের জন্য ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিনের সংস্থান করা হবে আগামী দিনে। সেখান থেকে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী থেকে বয়স্ক মহিলা সকলেই সংগ্রহ করতে পারবে তাদের প্রয়োজনীয় ন্যাপকিন। প্রয়োজনে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় মেয়েদের মধ্যে এব্যাপারে চালানো হবে রুচিসম্মত প্রচারকার্য। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা সাপেক্ষে অন্যান্য ক্ষেত্রেও নজর দেওয়া হবে ভবিষতে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বিকল্প চাষ বিষয়ক ক্ষেত্রগুলিতে দেওয়া হবে প্রাধান্য যাতে করে গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি মানোন্নয়ন ঘটে তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রারও। শিশুদের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণের পরিকল্পনাও রয়েছে আগামী দিনগুলিতে।

তবে শুধু মানুষ কেন? পশু-পাখি কি ডুয়ার্সবাসী নয়? তাঁদের কথাও ভাবা হয়েছে গুরুত্ব সহকারে, রাস্তার কুকুরদের জন্য 'ডগ শেল্টার' এবং তাদের জন্য দু'বেলা অন্নের যোগান, পাখিদের জন্য রোপিত হয়েছে অজস্র ফলের গাছ। পাখি-প্রজাপতি ও গাছগাছালিতে ভরে উঠবে একদিন তামাম 'অবসর' চত্বর।

ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই বলবে কিন্তু মানুষের জন্য কাজ থেমে থাকবে না কোনওভাবেই। ২৩শে ডিসেম্বর'২০১৯ নেওয়া হয়েছে কম্বল বিতরণের কর্মসূচী। দক্ষিণ ধুপঝোরা ও সংলগ্ন এলাকার মানুষদের হাতে সেদিন তুলে দেওয়া হয়েছে শীতের কম্বল। তবে এই কাজে শুধুই 'অবসর' ও 'এইম ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন' নয়, জড়িয়ে রয়েছেন অসংখ্য মানুষ। আমাদের সামান্য কাজের কথা সোশ্যাল মিডিয়া মারফত জানতে পেরে বহু মানুষ বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের সহযোগিতার হাত। তাঁরা সাধ্যমত সাহায্য করেছেন এব্যাপারে। ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন আমাদের সাথে সামিল হওয়ার, তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আশা রাখি, সকলের এই অসামান্য যোগদানে সর্বতোভাবে সফল হবে আমাদের আগামী দিনের পথচলা।

এ নদী কেমন নদী

নদী বাঁচানোর আওয়াজ উঠছে দক্ষিণ দিনাজপুরে

তুহিন শুভ্র মন্ডল

নদীর জেলা ভারতবর্ষ-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দক্ষিণ দিনাজপুর। বড়, মাঝারি মিলিয়ে নদীর সংখ্যা সাতটি। আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, শ্রীমতি, যমুনা, ব্রাহ্মণী। এছাড়াও ঘুসকি, তুলাই ও মানকেও আগে নদী বলে চিহ্নিত করা হত। কেমন আছে সেইসব নদী? আগের মতই প্রাণচঞ্চলা? নাকি কালস্রোতে গতি হারিয়েছে। আজও কি আগের মতই নদী সমাজে সমৃদ্ধশালী? নাকি সচেতনতা আর নদী কেন্দ্রিক পরিকল্পনার অভাবে মৃত্যুমুখে। একটু খোঁজ নেওয়া যাক।

আত্রেয়ী এবং অন্যরা ঃ

আত্রেয়ী এবং অন্যরা মানে অন্য নদীরা। উপরেই লিখেছি তাদের কথা। আত্রেয়ীর কথাই ধরা যাক। ভারত-বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান আন্তঃসীমান্ত নদী এই আত্রেয়ীর মোট দৈর্ঘ্যপথ ৩৯০ কিমি। যার মধ্যে মাত্র ৫৮ কিলোমিটার দক্ষিণ দিনাজপুরে। তবে এই নদীর ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। বাংলাদেশে এই নদীটির নাম আত্রাই। উৎসাহীরা কিংবা জ্ঞান চর্চার আগ্রহীরা জেনে খুশি হবেন যে, এই আত্রেয়ী এবং আত্রাইকে ঘিরে ঐতিহ্যের সুপ্রাচীনতা আছে। যেমন— 'দেবী পুরাণ' এবং 'মহাভারত'-এ আত্রেয়ীকে বলা হয়েছে পবিত্র নদী। দেবী পুরাণে দেবী দুর্গার মহাস্নান মন্ত্রে আত্রেয়ীর উল্লেখও পাওয়া যায়।

'ওঁ আত্রাই ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী
সরযুগন্ডকী পূন্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা...।'

এটাও বলা হয় যে, মহাভারতের যুগে আত্রেয় নামে এক ঋষি, দিনাজপুর জেলায় এই নদীর তীরে বাস করতেন, তার নাম অনুসারেই এই নদীর নাম হয়েছে আত্রেয়ী। যদি বেদব্যাসের 'বাষ্পসূত্র' আমরা দেখি তাহলে এই ঋষির নাম পাওয়া যাবে— ঋামিন ফলশ্রুতে ইতি আত্রেয় ঃ'। ফান্ ডেন ব্রোক, ইজাক টিরিয়ন, থমটন রেনেল তিস্তার সঙ্গে আত্রাই-এর এবং আত্রাই-এর সঙ্গে করতোয়ার যোগের কথা বলেছেন, নকশা এঁকেও দেখিয়েছেন। কিন্তু ১৭৭৭ সালে হিমালয় অঞ্চলে বিরাট বন্যায় তিস্তার সঙ্গে আত্রেয়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং আত্রেয়ী-করতোয়ার সমৃদ্ধিও নষ্ট হয়।

আবার অন্যদিকে পাল যুগে লেখা সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থে 'অপূর্বভবা' নামে একটি নদীর উল্লেখ আমরা পাই। ঐতিহাসিকদের কথায়— এই নদীই পুন্নভবা— যা আসলে পূর্ণভবা। দক্ষিণ দিনাজপুরের এই নদীর দৈর্ঘ্য ৫৪ কিলোমিটার। আত্রেয়ী তীরের প্রধান শহর যেমন বালুরঘাট, তেমনই পুনর্ভবা তীরের প্রধান শহর গঙ্গারামপুর (কোটিবর্ষ নগরী, ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাণগড়)। জগজীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলেও আত্রেয়ী (আত্রাই)-পুনর্ভবার নাম একসাথে পাওয়া যায়। 'কালিন্দী কাবেরী গন্ডকী পদ্মা যায় / কম্মনাশা, গঙ্গাধর শুন মহাশয় / করতোয়া যমুনা চলে মান গড়া সতী / পুনর্ভবা আত্রাই ধরলা পাঙ্গা / ত্রিসূতা মালিকি চলে আর ব্রহ্মকূড়া।'

আত্রেয়ী ও পুনর্ভবা ছাড়াও দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্য গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলি হল বুনিয়াদপুরের টাঙ্গন, কুশমন্ডি-হরিরামপুরের শ্রীমতি, হিলির যমুনা, কুমারগঞ্জ পতিরামের ইছামতি, গঙ্গারামপুরের ব্রাহ্মণী।

নদী তখন ঃ

নদী ভরা জল, নদীর বুক গভীর, মাছ ভর্তি নদী— এ সবই ছিল আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে নদীর পরিচয়। তা আত্রেয়ী হোক কিংবা পুনর্ভবা। গুরুদয়াল হালদার। আত্রেয়ী পাড়ের মৎস্যজীবী। স্মৃতিচারণ করলেন— আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও প্রচুর জল থাকত আত্রেয়ী নদীতে। কত মাছ ছিল তার ইয়ত্তা নেই। আংরোস, ভেউস, সুরকুন, সুবর্ণখলকি, কাচকি, বেলে, খয়রা, গাঙ কই, রিধা, খলসে, গাগর, ফ্যাসা, শিলং, ট্যাপা, ঘ্যারা, চ্যালা, পাতারি চ্যালা, বাগার, কাউরা কাটা, ঘাড় বেকি বা ছ্যাপ চাটা, বালি চাটা, পার্কোস, কুচা, ভ্যাদা, বাচা, মহাশোল, বাগাড়, পুতুল বা বৌ, বাম বা বাইম, মুরলি বাচা, পুঁইয়া, লজার, কর্তি, কাকলা বা কাকিলা, খশল্লা, বেতরঙ্গি— কত ধরনের মাছ ছিল। এখন এসব নেই। পুনর্ভবায় পাওয়া যেত পাবদা, ভাঙনা, খরকি, তিনকাটা, মোরলি, বাচা, বাইম, বোয়াল, রিধা, মৃগেল, বাগইর (বাগাড়), বোয়াল, ট্যাংরা (ট্যাংনা), খুশমা, পুতুল (বৌ), কর্তি, মাটি, ধ্যাদোই (ভ্যাদা), বাটা, খরকি ইত্যাদি। আবার টাঙ্গনের বোয়াল ছিল বিখ্যাত। এছাড়াও টাঙ্গনে খরকি (ভুরুঙ্গা), গাগর, বাটা, বাইম (বাস), গাঠ্যা, শৎ কই, সরপুঁটি, চায়নাপুঁটি, আড় ইত্যাদি।

আত্রেয়ী নদী দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আগে নারকেল আসত প্রচুর। ভারত থেকে যেত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ। আগে এই নদীতে ভিড়ত বড় বড় বজরা (বড় নৌকা), দেখা যেত শুশুক। নদীগুলি ছিল ভরা যৌবনাবতী। নদী পাড়ের মানুষ, মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার পরিপূরক ছিল নদী।

নদী এখন ঃ

এখনকার নদীর অবস্থা ভাল নেই, বলাই বাহুল্য। আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, শ্রীমতি, যমুনা, ইছামতি, ব্রাহ্মণী সব নদীর এক অবস্থা। এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক দক্ষিণ দিনাজপুরের নদীগুলির বর্তমান অবস্থা কী?

জলহীনতা ঃ বছরে মূলত বর্ষাকাল ছাড়া (খুব বেশি হলে তিন-চার মাস) নদীগুলিতে জল থাকে না। দক্ষিণ দিনাজপুরের সব নদীরই এক অবস্থা। গ্রীষ্মের সময় তো বটেই পুজোর পর থেকেই নদীতে জলের পরিমাণ কমতে শুরু করে। কৃষিজীবীরা, মৎস্যজীবীরা পড়ে প্রবল সংকটে।

নাব্যতা হ্রাস ঃ নদীগর্ভে পলি জমে জমে নদীর বুক হয়েছে উঁচু। ফলে একটু অতিরিক্ত বৃষ্টিতেই জলমগ্ন, বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। ২০১৭ সালে দক্ষিণ দিনাজপুরের বন্যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মৎস্যজীবীদের সংকট ঃ আগে কত ধরনের মাছ পাওয়া যেত এই নদীগুলিতে, একথা আগেই উল্লেখ করেছি। সেসব আর পাওয়া যায় না। এমনকি যে মাছটির জন্য দক্ষিণ দিনাজপুরের সুখ্যাতি, সেই রাইখরের জোয়ারও আর আগের মত দেখা যায় না নদীতে। আকৃতিও ছোট। যারা দীর্ঘদিন ধরে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন, তারা মাছ না পেয়ে অন্য পেশায় ভিড় জমিয়েছেন। কেউ কেউ ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। তৈরি হয়েছে 'রিভার রিফিউজি'। এটা বিরাট এক আর্থ সামাজিক সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে।

দূষণ ঃ দূষণ জনিত সমস্যা দক্ষিণ দিনাজপুরের নদীগুলিতে যে প্রবলভাবে রয়েছে তা বলা যায়

না। তবে হ্যাঁ, প্রতিমা বিসর্জনজনিত দূষণ, শহরের নিকাশী নালা জনিত নদী দূষণ, কীটনাশক জনিত দূষণ নদীগুলিতে রয়েছে।

দখল ঃ এই সমস্যাও খুব নেই। তবে নদীর বুকে চাষবাস করা হয়। নদীর জমিতেই সেটা হয়। সেটা আত্রেয়ী হোক বা ইছামতি। তবে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি শ্রীমতি নদীতে।

ভাঙন ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রবাহিত নদীগুলি শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু তা সত্বেও ভাঙন প্রবণতা আছে। আত্রেয়ী, পুনর্ভবার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। নদী ভাঙনে জলের নিচে জমি চলে গিয়েছে আত্রেয়ী পাড়ের কৃষকদের— এমন ঘটনাও আছে।

নদীর গতি পরিবর্তন ঃ অন্যান্য সব নদীর মত দক্ষিণ দিনাজপুরের নদীগুলিও বাঁক বদল করে। কিন্তু পুনর্ভবা নদীর বাঁক বদলের জন্য দু'বার আস্ত গ্রাম তার ঠিকানা বদলাতে বাধ্য হয়েছে— এটা খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অবাধ বালি উত্তোলন ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের নদীগুলির অন্যতম প্রধান সমস্যা অবাধে বালি উত্তোলন। সরকারি চালান কেটে নদীগর্ভ থেকে বালি তোলার কথা বলছি না। সকাল, দুপুর এমনকি রাতের আঁধারেও চলে অবাধে বালি তোলা। কখনও ট্রাক্টর দিয়ে, কখনও নৌকায়। ফলে নদীর সমস্যা বাড়ছে। নদী বক্ষে ঘূর্ণী তৈরি হচ্ছে বেশি। নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে বেশি মানুষ।

আন্তঃসীমান্ত নদীর সমস্যা ঃ যে সমস্ত নদী আন্তঃসীমান্ত, তাদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। কারণ শুধুমাত্র একটি দেশের উপর তো নির্ভর করে না। দক্ষিণ দিনাজপুরে সব নদীই মূলত আন্ত-সীমান্ত। তাই জলের প্রবাহের একটা সমস্যা থাকেই। এমনটা লক্ষ্য করাই গিয়েছে যে, দক্ষিণ দিনাজপুরের নদীগুলিতে জলের যা পরিমাণ থাকে গ্রীষ্মকাল বা শীতকালে, বাংলাদেশের অংশে তার চেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে।

আত্রেয়ী বাঁচাও আন্দোলন ঃ

ঠিক এই বিষয়টা নিয়েই শুরু হয় আত্রেয়ী বাঁচাও আন্দোলন। ২০১৫ সালের ২৭ মার্চ। সীমান্ত অঞ্চল সমজিয়া থেকে একজন কৃষক বন্ধু ফোন করে জানান যে, প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ আত্রেয়ী নদীর প্রবাহের উপর বাঁধ দিয়ে জলকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে সমস্যায় পড়ছে মৎস্যজীবী, কৃষিজীবীরা। প্রথমে বিশ্বাস না হলেও, পরবর্তীতে বিভিন্নভাবেই গভীর অনুসন্ধানে জানা যায়, সীমান্ত থেকে মাত্র ১৪০০ মিটার দূরে বাংলাদেশের অংশে দিনাজপুরের মোহনপুরের কাছে একটি রাবার ড্যাম দেওয়া আছে, যা দিয়েই আসলে জল নিয়ন্ত্রণ করছে বাংলাদেশ। কিন্তু এমনটা কি হতে পারে? যেখানে প্রতিবেশী দেশ ভারতবর্ষের কাছে কোনও খবর নেই। জেলাশাসক, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার কেউই বিষয়টা জানে না। অতএব শুরু হল লড়াই। এর পুরোভাগে থাকল পরিবেশপ্রেমী সংস্থা দিশারী সংকল্প। তাদের নেতৃত্বে আন্দোলন সংগঠিত হল। প্রথমে জেলাশাসক, সেচমন্ত্রীর মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে জানানো হল। এদিকে পরিবেশ কর্মী, কবি নাট্যকর্মী, লেখক, গায়ক, সচেতন সাধারণ মানুষ, বালুরঘাটবাসী সবাই নেমে পড়ল রাস্তায় এর প্রতিবাদে। মৌন মিছিল হল, পথ নাটক হল, গান গাওয়া হল নদী নিয়ে নদীকে এভাবেই নিয়ন্ত্রণ করার প্রতিবাদে। সাংসদের মাধ্যমে দেশের সংসদে আত্রেয়ী রাবার ড্যাম ইস্যু তুললেন প্রাক্তন ও বর্তমান সাংসদ।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার সরব হলেন এই সমস্যা নিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে লেখা আত্রেয়ী রাবার ড্যাম ইস্যুকে নিয়ে লেখা চিঠির উত্তর এল। ক'দিন আগেও চিঠি এসেছে ভারত সরকারের জলশক্তি মন্ত্রকের কাছ থেকে যে বাংলাদেশ সরকার রাবার ড্যামের সমস্যাটি মেনে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে বলে জানিয়েছে এবং আত্রেয়ী রাবার ড্যামজনিত সমস্যার দিকে নজর দেবে। আসলে ঢাকাতে গিয়েও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বারবার তুলে ধরা হয়েছে আত্রেয়ী রাবার ড্যাম ইস্যুর কথা। নদী বাঁচানোর আন্দোলনকারীরা মনে করছেন এ তাদের লাগাতার আন্দোলনের লড়াই-এর জয়। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের কাছেও তুলে ধরা হয়েছিল আত্রেয়ী নদীর এই সমস্যার কথা।

'আত্রেয়ী বাঁচাও' নিয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড

নদীর কাছে এসো ঃ

নদীকে ভালবাসার নাম 'নদীর কাছে এসো'। নদী চেতনা বৃদ্ধির নাম 'নদীর কাছে এসো'। কেননা আন্তঃসীমান্ত নদীর বিষয়টি দু'দেশের আর কে না জানে যে, এই সমস্যা যত না পরিবেশ নিয়ে তার থেকেও বেশি কূটনীতির। তাই স্থানীয়ভাবেও মানুষের মধ্যে নদী চেতনা বৃদ্ধির জন্য প্রতি মাসের একটি রবিবার আত্রেয়ী নদীর সদরঘাটে এসে জড়ো হয় পরিবেশ কর্মী, কবি, গায়ক, সাহিত্যিক, তরুণ-তরুণীর দল। তারা নদীর কথা বলে, নদীর গান গায়, নদীর বুক থেকে প্রতিমার কাঠামো তোলে, নদীর বুক থেকে প্লাস্টিক সহ নোংরা আবর্জনা সাফ করে আর নদীকে বাঁচাতে পরের পরিকল্পনা স্থির করে।

আত্রেয়ীর উপাখ্যান ঃ আত্রেয়ীর চেতনা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও প্রবাহিত হয়েছে এবং আত্রেয়ী বাঁচাও আন্দোলনের পুরো ভাগে তারাই। তারাই হয়েছে আত্রেয়ী উপাখ্যানের কুশীলব। এটি একটি নাটক— যা অযোধ্যা কে.ডি বিদ্যানিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা তৈরি। যেখানে উঠে এসেছে নদীর কথা, নদীর কষ্টের কথা, নদী সমস্যা সমাধানের কথা আর বেশি করে উঠে এসেছে নদীর যে কোনও দেশ নেই, সীমান্ত নেই— এই কথাটা।

নদীর কোনও দেশ নেই ঃ

তাই তো আত্রেয়ী বা আত্রাই তো একই। সীমান্তের কাঁটাতার নদীর বুকে থাকে না। নদীকে বেঁধে রাখা যায় না। তাই বালুরঘাটের পরিবেশপ্রেমী সংস্থা দিশারী সংকল্পের নেতৃত্বে বাংলাদেশের আত্রাই পাড়ের মানুষদেরও যুক্ত করা হচ্ছে নদীকে ভাল রাখার কাজে। এপার থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা চিঠি লিখছে ও পাড়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নদীকে ভাল রাখার আহ্বান জানিয়ে। বাংলাদেশের দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নঁওগার নদী পাড়ের মানুষরা এ পাড়ের মানুষদের সাথে হাত লাগাচ্ছে নদীকে ভাল রাখতে।

নদীকে ঘিরে জোট বাঁধছে জেলার মানুষও ঃ

আর সে জন্যই দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষও নদীর স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য জোট বাঁধছে। পুনর্ভবা, টাঙ্গন, যমুনা, শ্রীমতি, ইছামতি, আত্রেয়ী নিয়ে যৌথ নদী ও পরিবেশ সুরক্ষা সংগঠন তৈরি হয়েছে। তারা নদীর জন্য স্থানীয় জেলা প্রশাসন এমনকি রাজ্য সরকারের কাছেও নিয়মিত নদীর দাবি তুলে ধরছে আর এবিষয়ে তাদের সাথে আছে সবুজ মঞ্চের উদ্যোগে গঠিত রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটি।

দক্ষিণ দিনাজপুরের নদীগুলির প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, স্থানীয়ভাবেও নদীগুলির যে যে সমস্যা রয়েছে (যা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে) তার নিরসণ ঘটাতে নদী ও পরিবেশ কর্মীরা লাগাতার চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিছু ক্ষেত্রে ফল মিলেছে। এখনও হাঁটতে হবে অনেক পথ। তাই তাদের কাছে প্রতিটি দিনই নদী-পরিবেশ দিবস।

ডুয়ার্সের চার্চ সফরে

আলিপুরদুয়ার পর্ব

গৌতম চক্রবর্তী

শীতের সকাল। মিষ্টি রোদে চারিদিক ঝলমল করছে। এসে পৌঁছেছি আলিপুরদুয়ার জংশনে। ডুয়ার্সের চার্চ পরিক্রমার সুহানা সফরে। জলপাইগুড়ি জেলার চার্চগুলির সুলুক সন্ধান দিয়েছিলাম 'এখন ডুয়ার্স' এর ডিসেম্বর সংখ্যায়। এবারে চলুন আলিপুরদুয়ার জেলার বিস্তৃত অঞ্চল। এবারের এই লেখার অবতারণা কিন্তু পর্যটনের নিরিখেই। এই যাত্রায় মূল লক্ষ্য চার্চগুলি কোথায় কোথায় আছে এবং সেখানে কীভাবে মানুষ পৌঁছাতে পারবেন তার সুলুক সন্ধান দেওয়া। তবে আমি হাতিপোতার উত্তম, সঙ্কোশের জিতেশ লাকড়া, কুমারগ্রামে পঙ্কজ ওঁরাও, আলিপুরদুয়ারের শিবুন ভৌমিক, কালচিনিতে শিন্টু এবং ইষ্টিকুটুমের সুব্রতদার কাছে ঋণী। কারণ ওঁদের এবং ওঁদের দ্বিচক্রযানের সাহায্য ছাড়া আমার এই সার্কিট সফর সম্ভব হত না। শীতের এই সুহানা চার্চ সফরের শরিক হোন আপনারাও।

আলিপুরদুয়ার সার্কিট

কালজানি নদীর কোলে আলিপুরদুয়ার শহরটির টপোগ্রাফি অসাধারণ। ডুয়ার্স বেড়ানোর চাবিকাঠি হিসেবে ধরা যায় আলিপুরদুয়ারকে। কালজানি, নোনাই, ডিমা, গরম আরও কত নদী জিলিপির প্যাঁচ এবং সরীসৃপের মতো জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে আলিপুরদুয়ারকে। আলিপুরদুয়ারে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন অনেক উন্নত। ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত অটো সার্ভিসে রাজাভাতখাওয়া যাওয়া যায়। তবে দমনপুরের আরণ্যক চিত্র আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মুঠোফোন, চ্যানেলে চ্যানেলে বিনোদন। দুর্গম বনভূমিতে ডিশ এন্টেনার সাহায্যে যাবতীয় আনন্দ উল্লাস হাতের মুঠোয়। শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবনপ্রবাহ আর নেই। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর নতুন জেলা আলিপুরদুয়ার পাহাড়, অরণ্য, চা বাগান, নদী, কৃষি, বনবস্তি নিয়ে ডুয়ার্সের রানী হিসেবে পরিচিত

শিবুনদা অপেক্ষা করছিলেন আগে থেকেই। আমাকে বাইকে তুলে নিলেন। শিবুনদাই আমার গাইড। আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে জংশন থেকে ভোলারডাবরি শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে চলে এলাম নেতাজি বিদ্যাপীঠ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে। ১২ নম্বর রাজ্য সড়ক দিয়ে এগোতে এগোতে ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্সের ডানদিকে বাঁক নিয়ে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে পূর্ব মাঝেরডাবরি চা বাগানের অন্তর্গত মাঝেরডাবরি গির্জাতে পৌঁছে মন ভরে গেল। যেমন পরিবেশ, তেমন সুন্দর গির্জা। মাঝেরডাবরি গির্জা দিয়ে শুরু হল আমার এই পর্বের ডুয়ার্সের চার্চের সন্ধানে পথচলা। আলিপুরদুয়ার শহরটি এখনো পুরোপুরি কংক্রিটের জঙ্গলে ঢাকা পড়ে নি। আজও এই শহরে কোকিলের ডাক শোনা যায়, শোনা যায় স্তব্ধ দুপুরে ঘুঘু পাখির ডাক। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, জারুল, অমলতাস ফোটে, দেখা যায় চোখ জুড়ানো সবুজ মাঠ। আলিপুরদুয়ার থেকে দু পা বাড়ালেই সবুজের সমারোহ। কালজানি নদী পেরিয়ে গেলে গ্রাম্য জীবনে ধানের গন্ধ। ঘন সবুজ জঙ্গল, আদিবাসীদের ঘর গেরস্থালি। ছোটবড় খাল-বিল, বন জঙ্গল, পাহাড় সহ সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ আছে এখানে।

মাঝেরডাবরি গির্জা থেকে বেরিয়ে এবারে যাব আলিপুরদুয়ার ব্যাপ্টিস্ট চার্চে। সোজা চলে এলাম চেচাখাতা পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার। এরপর রামকৃষ্ণ সারদা জুনিয়র স্কুলের পাশ দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার এগিয়ে এলাম। রেলওয়ে কমিউনিটি হলকে ডানদিকে রেখে লিচুতলা বাজার হয়ে নেতাজি বিদ্যাপীঠ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে পৌঁছে গেলাম আলিপুরদুয়ার ব্যাপ্টিস্ট চার্চ। মাঝেরডাবরি থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরত্ব। আলিপুরদুয়ার কোর্ট থেকে আলিপুরদুয়ার ব্যাপটিস্ট চার্চের দূরত্ব এক কিলোমিটারেরও কম। আলিপুরদুয়ারের পথে পথে রাস্তার দু'পাশের গাছগুলি পথিকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। দু'পাশের গাছগুলো অতীতের ইতিহাসকে তুলে ধরে আমাদের সামনে। কাঠের কৌলিন্যের বিচারে শহরের রাজপথে মেহগনি গাছ রয়েছে কম করে পাঁচ ছয়টি। আসাম গেট থেকে শুরু করে ভাঙ্গাপুল, নেতাজি রোড, এবং শামুকতলা রোড এর সলসলাবাড়ি পর্যন্ত রাস্তার দুধারে আছে শিরীষ বা রেইন ট্রি যা অর্ধশতকের বেশি প্রাচীন। ভাঙাপুল থেকে নিউটাউন হয়ে কোর্টের দিকে এগিয়ে গেলে মাঘ ফাল্গুন এর আকাশটা লালে লাল হয়ে থাকত যেরকমভাবে, সেরকম আর চোখে পড়ে না। পিএইচই অফিস এবং জেলখানার মাঝবরাবর যে রাস্তা প্যারেড গ্রাউন্ডে পড়েছে তার দুধারে জারুল। জারুলকে ইংরেজিতে বলে কুইন অফ ফ্লাওয়ার। বর্ষাকালে নীলাভ ফুলে গাছগুলো ছেয়ে থাকে।

আলিপুরদুয়ার ব্যাপটিস্ট চার্চ থেকে ১২(এ) নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে লিচুতলা বাজার হয়ে চলে এলাম আলিপুরদুয়ার ক্যালভারি চার্চে। চার্চটি চেচাখাতার আরপিএফ কলোনিতে অবস্থিত। ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং ভোলারডাবরি রোড হয়ে পৌঁছে গেলাম ভোলারডাবরি মিশন কমপ্লেক্সে। একদম সাদামাঠা চার্চ। বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

নোনাই-এর তীরে কিছুক্ষণ

আমরা পৌঁছে গেলাম নোনাই নদীর কাছে। নীরবে নোনাই এর ক্যালিডোস্কোপ সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করলাম। সামনে সুবিস্তৃত সবুজ মাঠ এবং পিছনে আঁকাবাঁকা নোনাই নদী। গভীর জঙ্গলের ভিতর এঁকেবেঁকে নোনাই বয়ে চলেছে। চারপাশে ঘন হয়ে আছে জঙ্গল। নোনাই নদীর পাশেই গরম বনভূমি। অদূরে চারপাশ ভীষণ নির্জন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে হস্তী দর্শন হতেই পারে। হাতিরা দল বেঁধে আসা-যাওয়া করে আর দোকানঘর আর বনবস্তিগুলি ভাঙ্গে। নর্থ পয়েন্ট মাঝেরডাবরি চা বাগান পার হলেই দমনপুর। বসন্তের মাতাল সমীরণে এখানে এলে পাগলা হয়ে যেতে হয় জারুল ফুলের শোভায়। গাছ ভরে যায় বেগুনি রংয়ের জারুল ফুলে। সেই সঙ্গে কাঁচা হলুদ, ঝুমকো লতা, অমলতাস, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া। নোনাইয়ের অদূরে সিকিয়াঝোরা এবং স্বর্গছেঁড়া। জায়গাটি পানিয়ালগুড়ি চেকো বিটের অধীনে। পূর্বে দমনপুর রেঞ্জ এবং পশ্চিমে বক্সা বাঘবনের অন্তর্ভুক্ত। সিকিয়াঝোরার দেখাশোনা, লাভ-লোকসান, উন্নতির বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি দিচ্ছেন পানিয়ালগুড়ি গাঁয়ের মেয়েরা। পুরুষেরাও আছেন, তবে মহিলারাই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে। যেমন গাছ কাটা বন্ধ করা, প্লাস্টিক ব্যবহার না করা, পিকনিকের পরে জায়গাটিকে সাফসুতরো রাখা, ঝোরার জল যাতে দূষিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। ৩১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে চলে এলাম বক্সা ফরেস্টের অন্তর্গত কালকূট বস্তির ব্যাপ্টিস্ট চার্চে। এই চার্চ থেকে এবার আমরা এলাম খৃষ্ট দ্য কিং চার্চ পূর্ব মাঝেরডাবরি চা বাগানে। ৩১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে

মুখ করে ৫০০ মিটার যাওয়ার পর বাঁদিকে বাঁক নিয়ে কিলোমিটার দেড়েক যাওয়ার পরেই এই চার্চটি।

গরম বিটের নির্জনতায়

এক কিলোমিটার যাবার পর জঙ্গলপথ শুরু। বেশ ঘন জঙ্গল। পিঁপড়ের সারির মতো মেয়ে মরদ মাথায় শুকনো খড়ি চাপিয়ে জঙ্গল থেকে ফিরছে। হঠাৎ দেখি রাস্তা অবরোধ। যেখানে সেখানে হাতির নাদি ছড়ানো। মস্ত বড় গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে। ঠেলেঠুলে গাছটির ডালপালা সরালাম। ডানদিকে জঙ্গলের গহন পথ। গুহার মত তৈরী লতা তন্তুজালে সমাচ্ছন্ন। গা ছমছম করছে। শরীর কাঁটা দিচ্ছে। জঙ্গলে কত রকমের গাছপালা যে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। কারো সঙ্গে কারোর ঝগড়াঝাটি নাই। এক অদ্ভুত গন্ধ নাকে আসছে। মাঝেরডাবরি চা বাগান থেকে বেরিয়ে বক্সা অতিক্রম করে চলে এসেছি গরম বস্তিতে এনইএলসি চার্চে। মাঝেরডাবরি চা বাগান থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব। গরম বস্তির চার্চ থেকে ৩১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে সোজা চললাম নর্থ পোরো রাভা ব্যাপটিস্ট চার্চে। পোরোর এই চার্চটির দূরত্ব দমনপুরের গরম বস্তি থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার।

পক্ষী পর্যটনের নতুন ঠিকানা ইষ্টিকুটুম

এবারে সোজা চলে গেলাম নিমতি দোমোহনী। নিমতিঝোড়া চা বাগান। দু'পাশে কত ছায়া গাছ। কৃষ্ণচূড়া, জ্যাকারান্ডা, হলুদ অমলতাস, ঝুমকো লতার মতো ভূমিতলে পতিত। চোখ ছুটে যায় সবুজের হাতছানিতে। নিমতি নামে ঝোড়া বয়ে গেছে চা বাগানের বুক চিরে। তাই নাম নিমতিঝোড়া। দুপাশে অজস্র ছায়াগাছ। পাখিদের কলকূজন। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়ার রূপ অভূতপূর্ব। বারেবারে আমার চোখ ছুটে যাচ্ছে সবুজের হাতছানিতে। চা ফ্যাক্টরির সামনে অবাক চোখে অচেনা মানুষগুলি তাকিয়ে আছে। গ্রাম্য সাদাসিধা মানুষ আর চা এর গন্ধ নিয়ে নিমতিঝোড়া। নিমতিঝোড়া থেকে পাটকাপাড়া টি গার্ডেন সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার, দক্ষিণ বড়ঝাড় ফরেস্ট সাড়ে ছয় কিলোমিটার, ভাতখাওয়া চা বাগান সাড়ে আট কিলোমিটার, কালচিনি টি গার্ডেন সাড়ে ১১ কিলোমিটার, বক্সা ফরেস্ট ১৫ কিলোমিটার, মালঙ্গী চা বাগান ১৮ কিলোমিটার। নিমতি দোমোহনি থেকে ইষ্টিকুটুম অতিক্রম করে সোজা চলে আসতে থাকি পাটকাপাড়ার দিকে। তপসীখাতা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের ডানদিক দিয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার আসার পর পৌঁছে গেলাম পাটকাপাড়া চা বাগানে অবস্থিত এনডব্লিউজিইএল চার্চে। পাশেই আরেকটি ছোট চার্চ। নাম পিজিটি চার্চ (বি এন)। পাটকাপাড়া চা বাগান এবং চা বাগান এর অন্তর্গত চার্চগুলি দেখে আজকের রাত্রি যাপন ইষ্টিকুটুমে। নিমতিঝোড়ার কাছে অনবদ্য ইস্টিকুটুম খামারবাড়ি।

সংকোশের চার্চ ছুঁয়ে কালীখোলা

পরদিন সকালে রওনা দেব কুমারগ্রাম হয়ে বারোবিশার চার্চ সার্কিটে। পূর্ব পরিকল্পনামত সংকোশ চা বাগানের ফ্যাক্টরি গেটে আমার জন্য

ওপরে কার্তিকা চার্চ, নিচে সেন্ট জন্স চার্চ, রায়ডাক

অপেক্ষা করছিল আমার বিদ্যালয় ধাপগঞ্জ গভ স্পনসর্ড আশ্রম টাইপ হাইস্কুলের ছাত্র পঙ্কজ ওঁড়াও এবং জিতেশ লাকড়া। জিতেশ সংকোশ চা বাগানের আর পঙ্কজের বাড়ি পাগলারহাটে। জিতেশের বাড়ি আতিথেয়তার ছিমছাম পর্ব মিটিয়ে আমরা দেখতে গেলাম সংকোশ ভিউ পয়েন্ট। সংকোশ ভিউ পয়েন্ট থেকে সোজা চলে এলাম এক কিলোমিটার দূরত্বে নিউল্যান্ডস ফরেস্ট বস্তিতে অবস্থিত এসডিএ চার্চে। ঢিলছোঁড়া দূরত্বে সংকোশ এফ ভি নিউ প্রাইমারি স্কুলের পাশ দিয়ে চলে এলাম ধূমপাড়া ফরেস্টের সংকোশ ফরেস্ট ভিলেজ বেলিভার্স ইস্টার্ন চার্চে। দুটি চার্চ প্রায় পাশাপাশি। একটু দূরে ওঁরাও, মুন্ডা এবং নেপালিদের বনবস্তি। সংকোশের গা ছমছমে অরণ্য শুকনো শাল সেগুনের পাতায় ঢাকা। গাড়ি থেকে নেমে পড়ি। ঝিঁঝি পোকাদের কনসার্ট এবং হাজারো পাখির কলতানে মুখর। অজস্র ময়না পাখি আমাদের আগমনে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। সুদীর্ঘ অরণ্যপথে গাড়িতে নয়, পায়ে পায়ে হেঁটে চলাই পরমানন্দ। আমরা চলে এলাম ভুটানের ভেতরে। চমৎকার পিচ ঢালা পথ। গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল চেকপোস্টে। জোংখা বা ইংরেজি ভাষায় রয়েল গভর্নমেন্ট অফ ভুটানের সশস্ত্র সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। হিন্দি, ইংরেজি, বাংলাতে মিলে এমন ভাষণ দিলাম এবং আসার কারণ জানিয়ে আইডেন্টিটি কার্ড দেখিয়ে যখন জানালাম আমি একজন লেখক তখন ইমিগ্রেশন বিভাগের অফিসারেরা দারুণ খুশি। সময় বেঁধে দেওয়া হল। ভুটানের সময় আধ ঘণ্টা আগে পরে। আমরা গাড়ি নিয়ে সটান কালিখোলা বাজারে এলাম। গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে পৌঁছে যাই পাহাড়ের পাদদেশে। ডানদিকে বিস্তীর্ণ পাথর এবং বালি ভেঙে পৌঁছাই সংকোশ নদীর কূলে। ফেনিল জলরাশি কল কল ছল ছল শব্দে বয়ে চলেছে। শীতল জলে পা ডুবিয়ে সামনে ধ্যানমগ্ন পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকি।

কুমারগ্রাম নিউল্যান্ডস সার্কিট

কামাখ্যাগুড়ি থেকে অল্পই দূরে কুমারগ্রামদুয়ার। কুমারগ্রামের আরণ্যক সৌন্দর্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস। অদূরেই কুমারগ্রাম থানা। সেটাও বহু পুরনো। কুমারগ্রামদুয়ার থানা, বনবাংলো ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের পাশে। আশেপাশের গ্রামে যেমন হেমাগুড়ি, মড়াখাতা, টিয়ামারিতে মেচ, রাভা এবং রাজবংশীদের সমাজ সংস্কৃতি জানার ইচ্ছা হলে স্থানীয় মানুষজন এর মধ্যে মিশে গেলেই চলবে। কালিখোলা থেকে বেরিয়ে কুমারগ্রাম সংকোশ রোড হয়ে প্রায় সাত কিলোমিটার আসার পর মদন সিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পাশ দিয়ে প্রায় আড়াই কিলোমিটার চলে আসার পর নিউল্যান্ডস মন্দিরকে ডানদিকে রেখে বাঁদিকে বাঁক নিলেই নিউল্যান্ডস টি গার্ডেন চার্চ লাইন। ঝলমলে রোদে চা বাগান। ফাঁকফোকর দিয়ে ঝিলিক মেরে উঠছে নীলাভ ভুটান পাহাড়। সামনে সবুজ মাঠ, পাখির কলরব, ফ্যাক্টরির যন্ত্রপাতির শব্দ। বাতাসে ভেসে আসছে কাঁচা চা পাতার গন্ধ। চোখ মেলে শুধু চেয়ে থাকা। নিউল্যান্ডস টি গার্ডেন চার্চ লাইন থেকে কিছুটা

এগিয়ে গিয়ে নিউল্যান্ডস মন্দিরে এসে পঙ্কজকে বাইক থামাতে বললাম। কুমারগ্রামদুয়ার চা বাগানের তল্লাট ছুঁয়ে ধূমপাড়া এলাকায় বেড়ানো যেতে পারে। আসল নাম নিউল্যান্ডস চা বাগান। পোশাকি নাম নিউল্যান্ডস। আদর করে সবাই ডাকে ধূমপাড়া। ধূমপাড়াতে পৌঁছে নীল আকাশ, বর্ষণস্নাত ঝলমলে সবুজ সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে দেখতে থাকি দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তোলার ছন্দ নিপুণ দৃশ্যাবলী। শেড ট্রির ফাঁকফোকর দিয়ে ঝিলিক মেরে উঠেছে নীলাভ ভুটান পাহাড়। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, ঝোড়া এবং খোলা মিলিয়ে শান্ত স্নিগ্ধ মনোরম জনপদটি পর্যটনের তালিকাভুক্ত না হলেও একবাক্যে বলা যায় পূর্ব ডুয়ার্সের অনবদ্য সৌন্দর্যখনি। হঠাৎ করে মনে হবে ধ্যানমগ্ন শিল্পীর তুলিতে আঁকা অসামান্য তৈলচিত্র।

নিউল্যান্ডস থেকে বেড়াতে যাওয়া যায় রায়ডাকে। ওপারে তুরতুরি এবং ময়নাবাড়ি। নিউল্যান্ডস চা বাগান হয়ে রায়ডাক নদী পেরিয়ে তুরতুরি আর ময়নাবাড়ি হয়ে হাতিপোতা আসা যায়। কুমারগ্রাম সংকোশ রোডে ডানদিকে বাঁক নিয়ে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এগিয়ে পেলাম সেন্ট জন হাইস্কুল। তার বাঁদিক দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার যাওয়ার পরে পোখারীগাঁওতে খৃষ্টমাস চার্চটি দেখলাম। খৃষ্টমাস চার্চ থেকে বেরিয়ে দুর্গাবাড়ি। বাস স্টপেজ থেকে ডানদিকে বাঁক নিয়ে দুর্গাবাড়ি প্রাইমারি স্কুলের ডানদিক ধরে চলতে চলতে পৌঁছে গেলাম নিউল্যান্ডস টি গার্ডেনের খ্রিস্টেন চার্চে। বারবিশা কুমারগ্রাম রোড ধরে খ্রিস্টেন চার্চ থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার এগিয়ে গেলে বোলগুড়ি ক্যাথলিক চার্চ। জিতেনকে সংকোশ ছাড়ার আগেই বিদায় জানিয়েছিলাম। এখান থেকেই পঙ্কজকে বিদায় জানিয়ে উঠে পড়লাম বারবিশার বাসে।

শান্তিবনে শ্রান্তিনাশ

কুমারগ্রামদুয়ার, সংকোশ এবং নিউল্যান্ডসের চার্চগুলি দেখে সোজা চলে এলাম বারবিশা। কামাখ্যাগুড়ি বারবিশা সার্কিটে রয়েছে কামাখ্যাগুড়ি চার্চ, বারবিশার চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া (সিএনআই)। কামাখ্যাগুড়ি বারবিশা থেকেই ঢুকবো নারারথলি নারারথলিতে আছে অনেকগুলি চার্চ। এগুলি হল দক্ষিণ নারারথলিতে প্রেসবিটারিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্চ, পশ্চিম নারারথলিতে সি এন আই চার্চ, সেন্ট পিটার্স ক্যাথলিক চার্চ রোমান পাড়া, উত্তর নারারথলিতে আছে ডুবাশ্রী এ এফ সি এম চার্চ, ডুবাশ্রী সি এন আই চার্চ, সোনাডোবা চার্চ (এন ই এল সি)। রাত্রিবাস বারবিশার শান্তিবনে। অপরূপ সৌন্দর্যমন্ডিত নারকেল কুঞ্জ পরিবৃত পুষ্করিণী। পাড় ঘেঁষে ছোট ছোট কটেজ। সেখানেই ব্যবস্থা রয়েছে থাকার। সামনে পায়রা নিবাস। আছে সুইমিং পুল। নীল জলে মনের সুখে সাঁতার কাটা যায় এবং প্রকৃতির গান শোনা যায়। কলাবাগানের ধার দিয়ে নিভৃত নিরালা পরিবেশ।

বারোবিশা সার্কিটে সুহানা সফর

জাতীয় সড়ক ধরে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার আসার পর গ্রামীণ ব্যাংক। ব্যাঙ্কের ডানদিক দিয়ে প্রায় চার কিলোমিটার চলে আসার পর তেলিপাড়া সিএনআই চার্চ কম্পাউন্ড। শান্তিবন থেকে দূরত্ব প্রায় নয় কিলোমিটার। ফিরতি পথে আবার ব্যাংকের বাঁদিক দিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার চলার পর জাতীয় সড়ক ধরে প্রায় দেড় কিলোমিটার চলে আসার পর নেতাজি রোডের রাস্তা দিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার যাওয়ার পর খোয়ারডাঙ্গাতে প্রেসবিটারিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্চ দেখলাম। সীমান্তঘেঁষা বারবিশা থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে অসমের গোঁসাইগাঁও হয়ে কচুগাঁও ফরেস্ট। ১৮৯৫ সালে সন্ডার্স সাহেব পশ্চিম ডুয়ার্সের জমি জরিপের দায়িত্ব নিয়ে যে রিপোর্ট লেখেন তা এক মূল্যবান দলিল। তাঁর ভাষায় বলা যেতে পারে কামাখ্যাগুড়ির চারপাশটা ছিল মরা রায়ডাক নদীর প্রান্ত ঘেঁষে অরণ্যসমৃদ্ধ জনপদ। এখন জঙ্গল খুঁজতে হলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বেরোতে হবে। বন্যপ্রাণী উধাও হয়ে যাচ্ছে। মূল্যবান বনজ সম্পদ লুটেপুটে নিয়ে যাচ্ছে। এইসব অঞ্চলে সেইরকম কোনও ট্যুর অপারেটর অথবা পর্যটন সংস্থা গড়ে ওঠে নি যারা বাইরে থাকা আসা পর্যটকদের স্থানীয় সৌন্দর্য দেখিয়ে আনতে পারে।

চার্চ থেকে বেরিয়ে নেতাজী সংঘ কালী মন্দির দর্শন করে সোজা চলে এলাম খোয়ারডাঙা পোস্ট অফিস। পোস্ট অফিস থেকে ছোট দলদলি যুবক সংঘকে বাঁদিকে রেখে প্রায় এক কিলোমিটার আসার পর ছোট দলাদলি এলএফসিসি চার্চ। ছোট দলদলি যুবক সংঘের ডানদিক দিয়ে কিলোমিটার দুয়েক যাবার পর পৌঁছে গেলাম নারারথলির সেন্ট পিটার ক্যাথলিক চার্চে। পাশেই সেন্ট পিটার্স ক্যাথলিক চার্চ, রোমান পাড়া। পর্যটন সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বারবিশা জনপদের যে পরিচিতি গড়ে উঠেছে তাতে লোকায়ত দর্পণ কতখানি উজ্জ্বল হচ্ছে অথবা জনগোষ্ঠীর মানুষগুলির আর্থ সামাজিক এবং মনোজগতের কতটুকু উপকার হয়েছে সেটা বলা যাবে না। তবে আধুনিক পর্যটকেরা প্রকৃতি পর্যটনে রসিকবিল কিংবা রায়ডাক অথবা শিলবাংলোতে অবস্থান করলে এবং লোকসংস্কৃতির পরিচয় ঘটাতে পারলে অর্থনীতির বিকাশে যৎকিঞ্চিৎ হলেও স্থানীয় জনজাতিরা উপকৃত হবেন। রোমানপাড়ার সেন্ট পিটার্স ক্যাথলিক চার্চ থেকে বেরিয়ে পৌঁছে গেলাম ডুবাশ্রী সিএনআই চার্চে। তিন কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম চার্চটিতে। একটু দূরে ডুবাশ্রী এএফসিএম চার্চটি উত্তর নারারথলিতে। তিন কিলোমিটার রাস্তা। এবারে ডুবাশ্রী মার্কেটকে ডানদিকে রেখে চার কিলোমিটার দূরত্বে এনইএলসি চার্চে। খোয়ারডাঙ্গার সোনাডোবাতে অবস্থিত এই চার্চটি থেকে এবার যাব পশ্চিম নারারথলির সিএনআই চার্চে এবং এই চার্চ সফরের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হবে বারোবিশা কামাখ্যাগুড়ি সার্কিটের চার্চ সফর।

রায়ডাকের অরণ্যময় পথে

উত্তমের আতিথ্য গ্রহণ করে চলে এলাম শামুকতলা। কার্তিকার একটি হোম স্টেতে রাত্রিযাপনের আয়োজন করে রেখেছিল উত্তম। বক্সা টাইগার রিজার্ভ এর সাউথ রায়ডাক রেঞ্জ ভারতের অন্যতম পুরনো রেঞ্জ। এই রেঞ্জের বনবাংলোটাও বহু পুরনো। ১৯০৯ সালে তৈরি কাঠের দোতলা বাড়ি। বনের ধারে গাছপালার মধ্যে সাউথ রায়ডাক বিট অফিস। পূর্ব ডুয়ার্সের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশে সংরক্ষিত বন আর কিছু বনবস্তি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই বিট। এখানে আসার পথটা প্রধানত বনের ভিতর দিয়ে। শেষের ১২ কিলোমিটার পথ গেছে চা বাগানের কিনারা ধরে। বাংলোর উত্তর আর দক্ষিণ জুড়ে অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। শতবর্ষ আগে রায়ডাক ছিল ভয়ঙ্কর এবং গভীর গহীন অরণ্য। ১৮৭৭-৭৮ সালে বক্সা ডিভিশন গঠন করা হয়। মিস্টার ডকসাট রায়ডাক ফরেস্ট তথা বক্সার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ সালে রায়ডাক বনবাংলোর এলাকা চিহ্নিত হয়। আরও আগে ঘোষিত হয় বক্সা ডিভিশনের এরিয়া। বনবাংলোটি তৈরি হয় ১৮৬০ সালে। বাংলোটির শতবর্ষের গ্ল্যামার কিছুই অবশিষ্ট নেই। সন্ধ্যায় বাঘের গর্জন শোনা যায় না। শতবর্ষের বেশি প্রাচীন এই বাংলোটিতে হেরিটেজ ফ্লেভার অনুভব করা যায়। পরদিন চলে এলাম রায়ডাক টি এস্টেটে। কার্তিকা চা বাগান পার হলে রায়ডাক চা বাগান। একসময় রায়ডাক চা বাগানের চারপাশে বহু মূল্যবান গাছপালা ছিল। সব কেটেকুটে সাফ। চা গাছের সারি, গলফ খেলার মাঠ। বাবুদের কোয়ার্টার, ফ্যাক্টরি এক কথায় দারুণ সাজানো গোছানো চা বাগান রায়ডাক চা বাগান। রায়ডাক টি গার্ডেন থেকে সেন্ট জোহানস চার্চের দূরত্ব মাত্র এক কিলোমিটার। সেন্ট জোহানস চার্চ থেকে রায়ডাক পোস্ট অফিসের বাঁদিক দিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার যাওয়ার পর ডানদিকে বাঁক নিয়ে আরো এক কিলোমিটার গেলে চার নম্বর কুলি লাইনে সেন্ট জোসেফ চার্চ। সেন্ট জোসেফ চার্চ থেকে বেলিভারস চার্চ মাত্র এক কিলোমিটার। এই চার্চ থেকে বেরিয়ে ফিরতি পথে সেন্ট জোসেফ চার্চের পাশ দিয়ে রায়ডাক টি এস্টেটের কুলি লাইন দিয়ে পৌঁছে গেলাম সোনিয়া লাইন চার্চে। দেড় কিলোমিটার রাস্তা পৌঁছে গেলাম মাত্র পাঁচ মিনিটেই। রায়ডাকের সোনিয়া লাইন চার্চ থেকে লঙ্কাপাড়া ক্যাথলিক চার্চ মাত্র এক কিলোমিটার। পৌঁছতে সময় লাগল পাঁচ মিনিট।

কার্তিকা হয়ে হাতিপোতা সার্কিট

রায়ডাক হয়ে কার্তিকার জঙ্গল এখনও আছে, কিন্তু ঘনত্ব একেবারেই কমে গেছে। জঙ্গলে এখন লুটেরাদের রাজত্ব। বড়ই দুঃসময়। জঙ্গল রক্ষা করা কঠিন চ্যালেঞ্জ। দু'দিকে স্তব্ধ অরণ্য। ঠক ঠক শব্দে কাঠঠোকরা তবলা বাজিয়ে যাচ্ছে। শ্রান্ত ঘুঘুর ডাক। কোকিলের কণ্ঠস্বরে মুখর বনতল। পথের ধারে শাল, সেগুন, জারুল, শিশু, লালি গাছ। মাঝে মাঝে বনতলে অগ্নিদাহের চিহ্ন। রাস্তা থেকে জঙ্গলের নির্জন পথে নেমে যাই। চৈত্রের বাতাসে ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা। শুকনো পাতায় পা পড়তেই খচরমচর শব্দ। সবুজ চা বাগানের মাঝে হাঁড়িয়ার আসর। মোরগ লড়াই এখনও হয়। চা বাগানে হাঁড়িয়াবিহীন জীবনযাপন আজও সম্ভব নয়। চা বাগিচার দুধারে কৃষ্ণচূড়া, জ্যাকারান্ডা, অমলতাস, শিমূল, শিরিষের মনমাতানো শোভা। বসন্তের মৃদুমন্দ হাওয়ায় ঝরে পড়ছে শিমূল তুলো। গাছের ডালে লেজ ঝুলিয়ে বসে আছে ময়ূর।

লঙ্কাপাড়া ক্যাথলিক চার্চ থেকে বেড়িয়ে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার যাবার পর হাতিপোতা রোডে কার্তিকা মার্কেটে ডানদিকে বাঁক নিয়ে কার্তিকা টি এস্টেট নয়া লাইনে পেনিয়েল গসপেল টিম চার্চ। হাতিপোতা রোড হয়ে কার্তিকা মার্কেটের বাঁদিক দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে ছয়শো মিটার গেলেই সেন্ট মেরি ক্যাথলিক চার্চ চিরো লাইন। সুদৃশ্য পথ অতিক্রম করে আমরা এসে দাঁড়ালাম

তিনমাথা রাস্তায় যেখান থেকে সোজা উত্তরে ঠায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যমন্ডিত জয়ন্তী পাহাড় দেখা যায়। এখান থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে তুরতুরি চা বাগানের দিকে এবং সেখান থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে ময়নাবাড়ি হয়ে ভুটানঘাটে যাওয়ার পথ। আরও একটা দেখার সুন্দরতম স্থান। হাতিপোতা রোড ধরে জয়ন্তী টি এস্টেটের পাশ দিয়ে ময়নাবাড়ি হয়ে তুরতুরি চা বাগানের ময়নাবাড়ি ডিভিশন চার্চটিতে পৌঁছতে সময় লাগলো প্রায় ১৫ মিনিট। কারণ চার্চটির দূরত্ব অনেকটাই বেশি। প্রায় নয় কিলোমিটার। সেন্ট মেরি ক্যাথলিক চার্চ চিরো লাইন থেকে সেন্ট জেভিয়ার্স হাইস্কুলের পাশে সেন্ট জেভিয়ার্স ক্যাথলিক চার্চটির দূরত্ব মাত্র এক কিলোমিটার। হাতিপোতা রোড ধরে দক্ষিণ দিকে মুখ করে প্রায় তিন কিলোমিটার যাওয়ার পর তুরতুরি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস এবং তুরতুরি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র অতিক্রম করার পর ইউসিএনআই দামসিবাদ।

হাতিপোতা রোড ধরে দক্ষিণ দিকে প্রায় তিন কিলোমিটার গেলে ধওলাঝোড়া বস্তিতে সলভেশন আর্মি, ধওলাঝোরা সোসাইটি পৌঁছে গেলাম। সেন্ট জেভিয়ার্স ক্যাথলিক চার্চ থেকে এই চার্চটির দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার। চলে এলাম লোকনাথপুর। ধওলাঝোরা থেকে হাতিপোতা রোড হয়ে লোকনাথপুর স্যাক্রেড অ্যাসেম্বলিজ ফেলোশিপ চার্চে পৌঁছোতে চার কিলোমিটার রাস্তা চলে এলাম দশ মিনিটে। লোকনাথপুর সিআরসি চার্চ আগের চার্চটি থেকে মাত্র এক কিলোমিটার। হাতিপোতা রোড ধরে কালিবাড়ি অতিক্রম করে মাত্র আধা কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত যিশু চার্চ টেম্পলটি খুবই সুন্দর। যিশু চার্চ টেম্পল থেকে চড়ক মাঠ পার হয়ে, কোহিনুর টি গার্ডেন হসপিটালের বাঁ দিক দিয়ে কোহিনুর টি এস্টেট চার্চে পৌঁছে গেলাম। ছয় কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করতে সময় লাগলো প্রায় পনের মিনিট। কোহিনুর টি এস্টেট চার্চের পাশেই ধওলাঝোরা খেলার মাঠ। খেলার মাঠের পাশেই ধওলাঝোরা চার্চটি।

শামুকতলা হয়ে ছিপড়া মহাকালগুড়ির পথে

কোহিনুর টি গার্ডেন চার্চ থেকে বেড়িয়ে কোহিনুর টি গার্ডেন হসপিটালের ডানদিক দিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার এসে হসপিটাল রোডের বাঁদিকে বাঁক নিয়ে মা কালীর মন্দিরের ডানদিক দিয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার এগোনোর পর শামুকতলা জ্যোতিনগরে লেডি প্রতিমা চার্চ। চার্চটির এইরকম নামকরণ হলো কেন স্থানীয় মানুষজন এবং আমার ক্ষেত্রসমীক্ষার সহায়ক যারা ছিলেন তারা কেউই বলতে পারলেন না। বিভিন্ন চার্চে ঘুরলাম ডুয়ার্সের কোণে কোণে। কিন্তু এইরকম অদ্ভুত নাম খুঁজে পাইনি। উত্তর মহাকালগুড়ি খেলার মাঠের পাশ দিয়ে তরুণ সংঘ কালীবাড়ি অতিক্রম করে পৌঁছালাম বড়চাকিবাসের মহাকালগুড়ি ক্যালভারি চার্চে। পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব। এই চার্চ থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরত্বে টিউটোরিয়াল একাডেমির পাশ দিয়ে পৌঁছে গেলাম দক্ষিণ মহাকালগুড়ির চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়াতে। একদম পাশেই মহাকালগুড়ি সিএন আই চার্চ। সিএনআই চার্চের পাশেই ইউসিএনআই চার্চ। সবকটা চার্চই পাশাপাশি। চার্চ থেকে বেরিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম বারোচৌকিরবস পোস্ট অফিস পেড়িয়ে মহাকালগুড়ি পিআইসি চার্চে। দূরত্ব আধা কিলোমিটার। মহাকালগুড়ি পিআইসি চার্চের একদম পাশেই মহাকালগুড়ি ক্যাথলিক চার্চ। পাঁচ মিনিটও সময় লাগল না। বড়ই অদ্ভুত লাগল বারোচৌকিরবসের পোস্ট অফিস লাগোয়া এই অঞ্চলটাতে অনেকগুলি চার্চ। সময়াভাবে এতগুলি চার্চ এই অঞ্চলে সন্নিবেশিত হওয়ার কারণ খুঁজে পেলাম না ঠিকই, তবে বুঝতে পারলাম দরিদ্র শ্রমিক আদিবাসীদের নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে এবং তাদের নিঃসীম দারিদ্র্য দূর করার মহান প্রচেষ্টাতেই এই চার্চগুলির গড়ে ওঠা এবং সেটা যে নিঃস্বার্থ নয় সেটুকু বুঝতে অসুবিধা হল না।

দ্বিচক্রযানে ছিপড়ার বনাঞ্চলে

মহাকালগুড়ি টিপ গাছপালায় আকীর্ণ সবুজের ঘোমটা পরা শান্ত নির্জন জায়গা। হিঙ্গুলাবাস, ছিপড়া, নারারথলি জঙ্গল, শামুকতলার চেচাখাতার গড় এবং বোড়োদের গ্রাম, ওদের নাচগান, পূজাপার্বণ, ব্রতকথা, উৎসব নিয়ে মহাকালগুড়ির পথ চলা। বাঁদিকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের নিশানা। ছিপড়া জঙ্গলে যাবার পথ। সামনে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। একটা ছোট নদী। এই নদীর পশ্চিমদিকে বেশ বড় একটা মাঠ। মাঠখানা পায়ে হাঁটা পথে। পায়ে হাঁটা পথ পশ্চিমে। সেই ছবির মত গ্রামে একটা মজবুত পাকা পুল পেরিয়ে রাস্তা একেবারে জঙ্গলের মধ্যে সেঁদিয়ে গেছে। মিষ্টি রোদ্দুরে পথ চলছি। ঝোলনা সাঁকো পার হয়ে ছিপড়া বিট অফিস। ডানদিকে রায়ডাক, কোহিনূর এবং ধওলাঝোড়া চা বাগানের পথ। বনবস্তি, বনবিভাগের ঘরবাড়ি, প্রাথমিক স্কুল পেরিয়ে রাভাদের গ্রাম। তাদের ঘরবাড়ি, জীবনযাপন এবং কাজকর্ম দেখি নীরবে। নিঃশব্দে তারা আপন আপন কাজ করে চলেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বনটিয়া উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে।

কুমারগ্রামদুয়ার, সংকোশ এবং নিউল্যান্ডসের চার্চগুলি দেখে সোজা চলে এলাম বারবিশা। কামাখ্যাগুড়ি বারবিশা সার্কিটে রয়েছে কামাখ্যাগুড়ি চার্চ, বারবিশার চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া (সিএনআই)। কামাখ্যাগুড়ি বারবিশা থেকেই ঢুকবো নারারথলি নারারথলিতে আছে অনেকগুলি চার্চ।

শামুকতলা যশোডাঙ্গার চার্চ সফর

ছিপড়া বনাঞ্চল থেকে বেড়িয়ে শামুকতলা যশোডাঙ্গা রোড হয়ে মোটরবাইক ছুটলো তীব্র গতিতে। সৎসঙ্গ আশ্রম এর পাশ দিয়ে চলে গেলাম প্রায় তিন কিলোমিটার দূরত্বে সেন্ট থমাস (সি এন আই) চার্চে। শামুকতলা যশোডাঙ্গা রোডেও বেশ কয়েকটা চার্চ আছে। এবার আমরা যাব শামুকতলা কভেন্যান্ট চার্চে। ঢিলছোঁড়া দূরত্বে চার্চটি অবস্থিত। দূরত্ব মাত্র এক কিলোমিটার। একটা বিষয় খুবই ভাবাল। সেন্ট থমাস চার্চের পাশেই সাঁওতালপুর প্লে গ্রাউন্ড। একটা জনজাতির নামে কোনও একটা অঞ্চলের নামকরণের কিন্তু একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। এই অঞ্চলের বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে আমার কথা বলে মনে হয়েছে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং চেতনার দিক থেকে এখানকার সাঁওতাল বা অন্য জনজাতির মানুষেরা ডুয়ার্সের সাঁওতাল বা অন্যান্য জনজাতির থেকে কিছুটা উন্নত চেতনাবিশিষ্ট। লক্ষণীয় বিষয়, এই অঞ্চলের চা বাগিচাগুলিও কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটাই শক্তিশালী। কোহিনূর, ধওলাঝোড়া বাগানগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা কিন্তু ব্রিটিশ আমলে যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী ছিল। অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে সাম্প্রতিককালে। তাও দেশীয় বেনিয়াদের বদান্যতায়। তাই বিদেশ থেকে আসা অর্থে সমৃদ্ধ এই চার্চগুলি কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ করতে না পারুক, বিকল্প শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে এই জনজাতি মানুষগুলোর পাশে থাকার যে অবস্থান নিয়েছে তাকে তো সমর্থন না করে পারা যায় না। তাই ডুয়ার্সের শতাধিক চার্চে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে যেটা মনে হয়েছে যে চার্চগুলির মাধ্যমে আদিবাসী জনজাতি এবং কৃষিজীবী মানুষের পাশে বিকল্প শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের সুযোগ সম্প্রসারিত হবার সুফল কিছুসংখ্যক আদিবাসী বা জনজাতির মানুষ তো গ্রহণ করছেই। এবং এদের দেখে উৎসাহিত হচ্ছে অন্য আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষজন যারা দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং অনাহারক্লিষ্ট।

ছিপড়া বনাঞ্চল থেকে তালেশ্বরগুড়ি

রাভা বস্তি, আলপথ, মেঠোপথ পার হয়ে নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে গিয়ে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ। ঠিক যেন ডাইনি বুড়ির মত চুল ঝাড়ছে। ওপাশে জারুল গাছ। পাতার চেয়ে বেগুনি রঙের ফুল গাছে একেবারে ঝেঁপে এসেছে। নদীতে মেয়েবউরা গেঁড়ি, গুগলি সংগ্রহ করছে। দেখলাম পাথরচাটা মাছ। রাস্তা চলছি পাখির ডাকে ডাকে। নদী পার হলেই জঙ্গল শুরু হল। পথের দু'ধারে রাশি রাশি কারিপাতা গাছ। বনকুল, শ্যাওড়া গাছের জঙ্গল। মাঝে মাঝে শালবন। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। জঙ্গলের মাঝখানে কয়েকঘর বনবাসী কুঁড়েঘরে পরম নিশ্চিন্তে বসবাস করছে। আমাদের দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তালেশ্বরগুড়ি পোস্ট অফিস থেকে বাঁ দিকে মোড় নিলাম। তালেশ্বরগুড়ি জিএমপি স্কুলের ডান দিক দিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার যাওয়ার পর লিটল ফোক ফেলোশিপ ক্যালভারি চার্চ। শামুকতলা কভেন্যান্ট চার্চ থেকে লিটল ফোক ফেলোশিপ চার্চের দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার। আধা কিলোমিটার দূরত্বে আরেকটি চার্চ। নাম তালেশ্বরগুড়ি প্রেসবিটারিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্চ। প্রেসবিটারিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্চের পাশেই সিএনআই এন্ড ইউসিএনআই চার্চ। এই চার্চ থেকে বেরিয়ে এবার আমরা যাব আবার তালেশ্বরগুড়ি জিএমপি স্কুলের রাস্তায়। সেখান থেকে তালেশ্বরগুড়ি পোস্টঅফিসের পাশ দিয়ে বাঁদিকে মোড় ঘুরে প্রায় দুই কিলোমিটার যাবার পর সেন্ট বার্নাবাস চার্চ। সিএনআই এন্ড ইউসিএনআই চার্চ থেকে বানিয়াগাঁও এর এই চার্চটির দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার। ডুয়ার্সের চার্চ সফরের আলিপুরদুয়ার কুমারগ্রামদুয়ার পর্ব শেষ। এবার ঘরে ফেরার পালা। মেন্দাবাড়ি, জয়গাঁ, কালচিনি, হ্যামিলটনগঞ্জ, হাসিমারা, মাদারিহাট এবং টোটোপাড়ার শতাধিক চার্চ সফরের চরৈবেতি নিয়ে লেখা বাকি রয়ে গেল।

ধারাবাহিক উপন্যাস। প্রথম পর্ব

ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট

সুজিত দাস

এ এক চিরকালীন অথবা সমকালীন প্রেক্ষাপট, যেখানে পাতা নড়ে ওঠার আগেও অনুমতি নিতে হয়, চুম্বনের প্রাক্‌মুহূর্তে জারি হতে পারে সমন। ঘুম ভেঙে এক পবিত্র সকালে তুমি আবিষ্কার করতে পারো তোমার নামেই শ্যুট অ্যাট সাইট অর্ডার। বন্ধ চাবাগান থেকে জে ডব্লিউ ম্যারিয়ট, খিদে এবং যৌনতার একটাই ভাষা। মাদল থেকে বেস গিটার, হাঁড়িয়া থেকে স্কচ... সুর এবং নেশা এই উপন্যাসে পাঠককে মেঘের নবম তলে নিয়ে যাবে। গানপাউডার থেকে শুরু এই কাহিনি উন্মোচিত হতে হতে বিভিন্ন প্রবাহে চু-কিত-কিত খেলতে থাকে গ্রাম ও শহরে। অশ্রু, এবং কান্নায়। প্রেমে ও পলাশে। কবিতার অলিন্দ থেকে গদ্যের নিশিনিলয়ে।

১

ফায়ারিং রেঞ্জের আশেপাশে কোথাও একটি বিষণ্ণ পুরুষ কোকিল ডেকে ওঠে। কী ডাক রে বাবা! এখনও শীত যায়নি ভাল করে। একটা নাছোড় শিরশিরে হাওয়া সকালের দিকে হাড় কেটে দেয়। সকালের দিকে আঙ্গুল ও ট্রিগার, দুটোই ঠান্ডা। অথচ প্রতিবার টার্গেটে তাক করার সময় কোকিলের ডাক। কার্তুজ, কোকিল এবং অকালবসন্তকে একটা সরলরেখায় নিয়ে আসে সৌরভ। সৌরভ দত্ত, ট্রেনি আইপিএস। ছাব্বিশের এই যুবক ছয় এক, বাদামি চোখ। ত্বক তামাটে, প্রতিটা পেশীকে আলাদা করে চেনা যায়। চাঁদমারির এই ফাঁকা ভূখণ্ডে তার প্রতিটি শট বুলস্ আই। কোকিলের ডাক, রিভলবারের মাছি আর টার্গেট... এই তিনটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাকে এক সুতোয় গেঁথে ফেলার সুফল। ব্যাচের বাকিরা ছয় রাউন্ডের শেষে সৌরভের অনেক পেছনে। মর্নিং সেশন শেষ, এরপরের রাউন্ডগুলো লাঞ্চের পর।

তরুণ অফিসারদের ট্রেনিং-এর কারিগর এক হাবিলদার। সকলের 'ওস্তাদজী'। ভক্তি ওস্তাদ মণিপুরি। মঙ্গোলয়েড মুখে হাসি নেই, কথায় তেতো মিশে আছে। ট্রেনিং-এর প্রথমদিনেই সাফ বলে দিয়েছিল,

"জোকারস্, ম্যায় আপলোগোকা ওস্তাদ হু, ডিআইজি সাহাবকা ডাইরেক বান্দা। যব তক পাসিং আউট নেহি হোগা তব তক মেরা হর বাত কানুন, মেরা হর আদেশ আপলোগোকে লিয়ে আইপিসি।"

সেই ভক্তি ওস্তাদের পীতাভ মুখেই আজ এক একটা শটের পর উদার তারিফ। প্রতিটি বুলস্ আই-এর পরে মগনলাল মেঘরাজের মত গুরুগম্ভীর আওয়াজ,

'ক্যা বাত, কামাল হ্যায়',
'শের হ্যায়, শের',
'সাব্বাশ, দেখিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে জনাব',
'নাজুক, নাজুক',
'লা জবাব!'

পয়েন্ট থ্রি এইট ওয়েবলি স্কট থেকে ছিটকে যাওয়া গুলি কাগজের টার্গেটে হিট করছিল যখন, যখন 'ক্যা বাত' ধ্বনি ভেসে আসছিল পেছন থেকে, এই হালকা শীতেও যখন পাগল পুরুষ কোকিলটি অবিরাম ডেকে যাচ্ছিল, একমাত্র বাঙালি ট্রেনি অফিসার সৌরভের মনে হচ্ছিল হায়দ্রাবাদ নয়, ওল্ড মালদায় কালিন্দী নদীর ধারে বসে আছে সে। কিংবা গৌরাঙ্গের ধাবা। আসলে ন্যাশনাল হাইওয়ে আর কালিন্দী নদীর মধ্যে হাইফেনের মত গৌরাঙ্গের ধাবা, পূবপানে প্রাচীন হরীতকী গাছ। হরীতকী গাছের কোকিল এই ফায়ারিং রেঞ্জে কীভাবে এলো এতটা

পথ উজিয়ে? তবু শেষ শটটা বুলস্‌ আই থেকে সামান্য দূরে হিট করার কারণ একটি রাজপুত চিবুক এবং একটি খয়েরি তিল। সৌরভের ঠিক পাশেই পাঁচ আট সোহিনি রাঠোর। শার্প জ-লাইন, ঘোড়ার লেজের মত বাঁধা চুল। শেষ জানুয়ারির এই মিঠে রৌদ্র, সোহিনি রাঠোর নামের মাটি থেকে উত্তাপের হলকা, শানেল ফাইভ ও ঘামের লিথাল ককটেল আর ওই গম রঙের চিবুক, চিবুকের খয়েরি তিল। এমন ব্যাচমেটের পাশে দাঁড়িয়ে কনসেনট্রেট করা খুব মুশকিল। কিন্তু এই রাজপুত তনয়া ওর পাশেই দাঁড়াবে। জানত সৌরভ। ওকে আজ বাঁচিয়ে দিয়েছে ওই পুরুষ কোকিল। নারী আর টার্গেটের মধ্যে চিকের আড়াল হয়ে থাকা লাল চোখের এক পুরুষ কোকিল।

দিনের শেষে টপ স্কোরার সৌরভ। ভক্তি ওস্তাদের মুখে হাসি থাকে না সচরাচর।

"সাহাব, আপ নে তো কামাল কর দিয়া আজ, লাস্ট পচ্‌চিস সাল মে অ্যায়সা শ্যুটিং নেহি দেখা। সাবাশ",

হাসি আর ধরে না ওস্তাদের মুখে। এমনকী ছোট ছোট চোখদুটোতেও হাসি উপচে পড়ে। ভক্তির অবশ্য নিজস্ব ইকুয়েশন আছে। চুকলিখোর কোম্পানি কমান্ডার তানেজা ভক্তির দুই চোখের বিষ। কিন্তু আজ ডিআইজি সাহেবও জেনে যাবেন ওর গ্রুপের অফিসারের ট্রিগার থেকেই সব চেয়ে বেশি স্কোর। মেসে ফেরার সময় বাসের সামনে থেকে তানেজা ওস্তাদকে বুড়ো আঙুল দেখায়। থাম্বস্‌ আপ। ওস্তাদ, আনলাইক ভক্তি ওস্তাদ, শিস্‌ আর মণিপুরি ভাষায় নিজের মনে গান গাইতে থাকে।

আইপিএস মেসের লাউঞ্জে সন্ধের দিকে বেশ ভিড়। কিছুক্ষণ বসে বাইরে আসে সৌরভ। ট্রেনিং সেন্টারটা অনেকটা জায়গা জুড়ে। প্রচুর গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি। কী একটা নাম না জানা ফুল ফুটেছে। বাতাসে তার রেণু ভেসে বেড়াচ্ছে। এই ফুলের গন্ধে কিছু একটা আছে। একটু বেশিক্ষণ থাকলেই নেশাচ্ছন্ন মনে হয় নিজেকে। একটা চোরা ইরেকশন কোথাও উঁকিঝুঁকি দেয়। ছাব্বিশের সৌরভকে অবশ করে ফেলে নাম না জানা ফুলের ঘ্রাণ। মহদিপুরের পিএইচই বাংলোতেও এমনই গন্ধ ভেসে বেড়াতো বাতাসে। স্কুলে রেজাল্ট আউট হওয়ার ঠিক পর পর, নতুন বই আর এই রকমের একটা বনজ গন্ধে মেতে উঠত চৌকিদারের দুই কামরার ঘর গেরস্থালি। নিজের পরিচয় আবার নিজের মনে আউরে নেয় সৌরভ। সারাদিনে অন্তত বেশ কয়েকবার। সৌরভ দত্ত, ট্রেনি আইপিএস। বাবার নাম সুকুমার দত্ত, কেয়ারটেকার, পিএইচই বাংলো। মা দুলালী দত্ত, অস্থায়ী রাঁধুনি। সাকিন মহদিপুর, মালদা। রাশ প্রিন্ট থেকে ছবি এডিট করতে করতে মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। আর কত এডিটিং করবে মিস্টার সাউরাভ দাতা? তোমার নিজের জীবনটাই তো সিনেমার থেকেও বেশি ইস্টম্যানকালার।

রামা ঘোষের অনুপ্রেরণায় মহদিপুরে গাছের পাতা নড়ে, ঋতু বদল হয়। রামা ঘোষ মহদিপুর বর্ডারের একমাত্র ডন। বর্ডারের এদিকটা রামা ঘোষের। পোস্ত চাষের ইজারা রামা ঘোষের। এলাকার একমাত্র সিনেমা হল রামা ঘোষের। লোকাল, জোনাল রামার কথায় লক্ষ্মণের মত ওঠবোস করে। খাকিও। পুলিশ, বিএসএফ দুটোই। পিএইচই র গেস্ট হাউসে বিকেল থেকে আনাগোনা বাড়ে লোকজনের। ফাঁড়ির ডাকমাস্টার, লাইনম্যান, ট্রান্সপোর্টের দালাল এমনকী ফরেন লিকার শপের কানু সাহাও। রামা ঘোষের ডেরা পিএইচই বাংলোর দোতলায় বেশি রাতের দিকে মালদা থেকে বাবুরা আসে। টাটা সুমো আর মারুতি গাড়ির ভিড় লাগে বাংলোর বাইরে। ভোটের আগে গাড়ির সংখ্যা আরও বাড়ে। সব রঙের গাড়ির ভিড়ে গমগম করে এ চত্বর। পোস্তচাষের সময়ও। পোস্ত গাছের রসে কী যে থাকে! হরিশচন্দ্রপুর, বালিয়াচক থেকে জমির মালিকরা রামার কাছে কয়েকমাসের জন্য জমি লিজ দিয়ে থোক টাকা বুঝে নেয়। গাছ বড় হলে রাতের দিকে কাণ্ড চিরে রাখা হয়। ভোরবেলায় সেই চেরা অংশে কালো রঙের আঠা জমে। এই আঠা, যা কিনা আসলে রেজিন, সংগ্রহ করে লেবারেরা। লেবার বলতে মহিলা আর শিশুর দল। রসের নাম আফিং, আরও নানা প্রসেসের পর তাই হয়ে ওঠে

আইপিএস মেসের লাউঞ্জে সন্ধের দিকে বেশ ভিড়। কিছুক্ষণ বসে বাইরে আসে সৌরভ। ট্রেনিং সেন্টারটা অনেকটা জায়গা জুড়ে। প্রচুর গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি। কী একটা নাম না জানা ফুল ফুটেছে। বাতাসে তার রেণু ভেসে বেড়াচ্ছে। এই ফুলের গন্ধে কিছু একটা আছে। একটু বেশিক্ষণ থাকলেই নেশাচ্ছন্ন মনে হয় নিজেকে। একটা চোরা ইরেকশন কোথাও উঁকিঝুঁকি দেয়। ছাব্বিশের সৌরভকে অবশ করে ফেলে নাম না জানা ফুলের ঘ্রাণ। মহদিপুরের পিএইচই বাংলোতেও এমনই গন্ধ ভেসে বেড়াতো বাতাসে।

ব্রাউন সুগার। রামা ঘোষ অত ঝামেলায় নেই। আঠা বুঝিয়ে দেয় ইউপি থেকে আসা লাইনম্যানের হাতে। ব্যস, এইটুকুই তার কাজ। এতেই কী কম ঝক্কি! বিঘার পর বিঘা পোস্ত গাছ আড়াল করবার জন্য কখনও অড়হর, কখনও অন্য লম্বা গাছ লাগাতে হয় জমির আল বরাবর। তাও নিস্তার নেই, আজকাল নারকোটিক বাবুরা গুগুল সার্ভে না কী একটা করে আকাশ থেকে টের পেয়ে যায় গাছের সুলুকসন্ধান। এইসময় পিএইচই বাংলোর স্টাফ কোয়ার্টারে বেঁধে রাখা দিশি মুরগির সংখ্যা বাড়ে। দুলালীর পাকা হাত আর বাটা মশলার গুণে সেইসব পাখিরা অমৃত হয়ে বোন চায়নার প্লেটে প্লেটে দোতলায় ওঠে। লেগ পিস, ব্রেস্ট পিস। রাত আরেকটু বাড়লে দুলালীও ওপরে ওঠে। আবার ভাগাভাগি হয় পা ও বুকের মাংস। নিচে বেহুঁশ সুকুমার, চৌকিদার সুকুমার ঘুম আর নেশার গভীর অতলে। ইংলিশবাজার দিশি ভাটির সত্তর ডিগ্রী আপ তরলের চাইতে ভাল সিডেটিভ এই মরপৃথিবীতে আর দুটি নেই। দুনিয়ায় কে যে কার চৌকিদারি করে!

মধুপুর থেকে মহদিপুরের দূরত্ব কত আলোকবর্ষ? ছোটবেলায় বুঝে উঠতে পারেনি সৌরভ। এটুকু জানে এই যুবক উকিলবাবুকে খুব সমীহ করত রামা ঘোষ। মালদার সরিৎ ওঝা আর মধুপুরের সুপ্রভাত ব্যানার্জি এই দুজন রামা ঘোষের কবচকুন্ডল। খালিতলার পার্টি অফিস থেকে প্রোটেকশন বিশেষ নেই। তবে ঝামেলা খুব একটা আসত না ওই সব দিক থেকে। তবু বছরে একটা দুটো এনডিপিএস কেসে ফেঁসেই যেতো। বালিয়াচকের আনিসুর রহমানের সঙ্গে এলাকা ভাগের 'ডিসপুট' আজও মিটল না। সফদলপুর আর মোজমপুরের পোস্তগাছে যত রস, তুলসীহাট্টার আশেপাশের মাটিতে তার সিকিও না। একই মাটি, একই রং, একই বৃষ্টি তবু গাছের কী বিচার! সে এক আজব বাখান। আর এই বাখান আছে বলেই রামা ঘোষ আর আনিসুরের বিবাদ। পুলিশ, আবগারিতে খবরাখবর, কেস কামারি। টাউনের সরিৎ ওঝা আর আড়াইশো কিলোমিটার দূরের ব্যানার্জি উকিল। দায়রা কোর্ট আর স্পেশাল কোর্টে বচ্ছরকার ছোটাছুটি। আসলে টাকার প্রয়োজন আর নেই রামা ঘোষের কিন্তু এলাকা ছেড়ে দিতে মানে লাগে। এই বর্ডার আর এই পোস্তগাছের আঠা একবার যদি মনে লেগে যায়, ছাড়ান কাটান দেওয়া অসম্ভব। কলকাতা আর এই অজ গাঁয়ের কমলা টকিজে হিট হিন্দি সিনেমা একদিনে, একসঙ্গে 'ফাস দিন-ফাস শো' রিলিজ, ভাবা যায়! বুক কাঁপিয়ে এলাকার সব দেড়শো সিসি বাইকে নিজের ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভাবলেই আনন্দে চোখ বন্ধ হয়ে আসে রামা ঘোষের। তৃপ্তিতেও।

ক্লাস সেভেনে পড়া সৌরভের ইংরেজি হাতের লেখা দেখে এক পৌষের সকালে প্রথম মুগ্ধ হন ব্যানার্জি উকিল। বালকটি লাজুক, বালকটি ভীত কিন্তু সিনেমার ডায়ালগ মুখস্ত। এমনিতে কথা বলে না বিশেষ তবে গড়গড় করে বলে যেতে পারে নায়ক, নায়িকা আর ভিলেনের সংলাপ। ফটোগ্রাফিক মেমোরি, কোনও দেখভাল ছাড়াও বালকটি পড়াশুনোয় তুখোড়। একত্রিশ বর্ষীয় এই বিলাতফেরত উকিলের নামডাক এই কয়েক বছরে মধুপুর থেকে এতদঅঞ্চলের সব ক'টি জেলায় মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে। ডুবে যাওয়া মামলাকেও ভাসিয়ে তুলতে ব্যানার্জি সিদ্ধহস্ত। কোচবিহার থেকে মুর্শিদাবাদ, গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেছে ক্রমে। তো পৌষের সকালে সেদিন কুয়াশা ছিল না, ঝকঝকে রৌদ্রের সকালে দুঁদে উকিলবাবু এই আশ্চর্য মেধার অধিকারী বালকটির পড়াশুনোর ভার নিলেন। কিশোরটি মাধ্যমিক পাশ করলে কার্সিয়াং-এর বোর্ডিং স্কুলে পাঠালেন। মহদিপুর, কমলা টকিজ এবং পিএইচই বাংলো থেকে নাড়ি না কাটলে বয়ঃসন্ধির সময়টাতে পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কার্সিয়াং থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে দিল্লি। এর পরের কাহিনি রূপকথার মত। সিনেমার মত।

এই গন্ধটা সৌরভ নিতে পারে না। এই নাম না জানা ফুলের গন্ধটা একদম নিতে পারে না ও। পাতলা নিউজপ্রিন্টের ওপর ছাপা লাল সিনেমার টিকিটের ঘ্রাণ ভেসে আসে। ওপরে নিখুঁত আকাশ, স্টার-স্টাডেড। এক একটা নক্ষত্র যেন অন্ধকার

কমলা টকিজের সিট দেখিয়ে দেওয়া টর্চ হয়ে জ্বলে উঠছে। তাই কি সন্ধেবেলার এই 'নিশি'ডাক সৌরভকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বারবার নিয়ে আসে এইখানে। এই গন্ধের কাছে সোহিনি রাঠোর তুচ্ছ, তুচ্ছ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি। এই নাম না জানা ফুলের রেণু যেন অজস্র মহদিপুর হয়ে ভাসতে থাকে ট্রেনিং সেন্টারে। প্যারেড, দিনভরের দৌড়ঝাঁপ, আইপিসি, সিআরপিসি-র ধারা উপধারা, সারাদিনের ক্লান্তি সব মুছে যায়, সব। মেসের দিকে আবার ফিরতে শুরু করে সৌরভ। লনে ব্যাডমিন্টন খেলা হচ্ছে, মিক্সড্ ডাবলস্। একদিকে সোহিনি-প্রভু, অন্যদিকে গায়ত্রী-মায়াঙ্ক। সৌরভকে দেখে প্রভু র‍্যাকেট এগিয়ে দেয়,

'তু খেল ইয়ার, ম্যায় বহোত টায়ার্ড হু।'

'গেম তো খতম করলে প্রভু, মেরেকো আপনা র‍্যাকেট লানে দে,'

নিজের র‍্যাকেট নিয়ে আসতে ঘরের দিকে এগোয় সৌরভ। মেসের লাউঞ্জে বেশ ভিড়। টিভিতে 'গ্যাংস অফ ওয়াসেপুর।' বেতের সোফায় বৃদ্ধ রামাধীর সিং অ্যালিয়াস তিগমাংশু ধুলিয়ার ক্লান্ত আওয়াজ ভেসে আসে,

'ইয়ে শালা হিন্দুস্তানমে যবতক সানিমা হ্যাঁয়, লোগ চুতিয়া বনতে রহেঙ্গে।'

২

মধুপুর শহরে ইলা ব্যানার্জি একটা ঘটনা। ঈর্ষাকাতর রমণীরা ওর একটা ডাকনাম দিয়েছে বটে। ঢিলা ব্যানার্জি। ইলার চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করে। ইলা ব্যানার্জির তাতে কিছু যায় আসে না। সদ্য চল্লিশ ইলা জানেন জিন্দেগি না মিলে দোবারা। ইলা 'ইয়োগা' করেন, ইলা কলেজে পড়ান। ইংরেজি। ইলা অন্যরকম কবিতা লেখেন, কলকাতা থেকে নামী শিল্পী সাহিত্যিক মধুপুরে এলে ইলার 'মধুকুঞ্জ' তাঁদের একমাত্র ডেস্টিনেশন। শহরের উপকণ্ঠে ইলার বাড়ি প্রায় পনেরো কাঠা জমির ওপর। উত্তরকোণে একটি স্বর্ণ চাঁপার গাছ। নীচে বাঁধানো চাতাল। গ্যারাজে চারটে গাড়ি, তিনটে কালো রঙের, জেট ব্ল্যাক। একটা হুডখোলা মাহিন্দ্রা 'থর'। ইলা ব্যানার্জির স্কিনে মাছি পড়লে পিছলে যায়। কালো রঙের গাড়িগুলোতেও ধুলো পড়লে পিছলে যায়। গাড়ি, স্বর্ণ চাঁপা এবং উকিল স্বামীকে নিয়ে ইলা ভালই আছেন। মোটের ওপর 'মধুকুঞ্জ' আছে মধুকুঞ্জেই। ওপরে আইন, শহরের খাসম খাস উকিল সুপ্রভাত ব্যানার্জি। দেওয়াল জুড়ে আইনের বই, টেবিলের পাশে দিনের ব্রিফ, ভিজিটিং রুমে ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে থাকা আসামী এবং তাদের আত্মীয়স্বজন, হাফডজন জুনিয়র। নিচে ইংরেজি, সদ্যচল্লিশ ইলা। মেজেনাইনের বিরাট ফ্লোরে অন্যরকম কবিতা, গান এবং সংস্কৃতির টুংটাং।

মিসেস ব্যানার্জির আজ কলেজে অফ্ ডে। আজ ওঁর চুলের ধূপস্নানের দিন। মালতি বড় যত্নের সঙ্গে করে এই কাজটা। উঁচু খাটের ওপর শুয়ে থাকা ইলার দীর্ঘ কেশরাজিকে ধূপের ধোঁয়া দিয়ে স্নান করানোয় মালতির স্কিল দেখবার মত। আধঘণ্টা ধূপস্নানের পরও ইলার মন আজ বড় এলোমেলো। বর্ষা বোধহয় ঠিকানা ভুলে গেছে, বৃষ্টির নামগন্ধও নেই। প্রলম্বিত গ্রীষ্মের আবহে এই মধুপুর শহরটাকে সকাল থেকে অন্যরকম লাগছে। ইনফ্যাক্ট, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজটা এসেছিল ভোরবেলাতেই কিন্তু তখন মোবাইল সুইচড্ অফ ছিল। মুঠোফোন খোলার পর থেকেই কোথাও একটা খিঁচ ধরে আছে। ডানচোখের পাতা কেঁপে যাচ্ছে মাঝেমধ্যেই। এসব মানেন না ইলা কিন্তু দুর্বল মুহূর্তে সংস্কারগুলো মাথায় চলে আসে নিজস্ব নিয়মে। অন্য কোনও সময়ে চোখের পাতা নিয়ে এতটা ভাবিত হওয়ার মানুষ উনি নন, তবে আজকের সকালটা অন্যরকম। যেভাবে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে মধুকুঞ্জের আমলকী গাছ। স্থির হয়ে আছে মধুপুরের হাওয়া।

আসলে কী সবটাই স্থির হয়ে আছে? দ্বিতীয়বার স্নানঘরে ঢুকলেন ইলা। কতটা গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কতটা মাথা ঠান্ডা করার জন্য, নিজেও বুঝতে পারেন না। বাথরুম বড় শখের জায়গা। বাড়ি তৈরির সময় এই বিরাট স্নানঘরের

বাথরুম বড় শখের জায়গা। বাড়ি তৈরির সময় এই বিরাট স্নানঘরের নকশা এবং ইন্টিরিয়র দুটোই নিজে করেছিলেন। ফ্রস্টেড গ্লাসের দেওয়াল, অ্যান্টিক অ্যাকসেসরি, একটু গাছ রাখার জায়গা, বিরাট বেলজিয়াম কাচের আয়না, বড় যত্নে বানানো। সময় স্থির হয়ে বসে নেই ঠিকই কিন্তু সেভাবে দাগই বা কেটেছে কি? আয়নাকে জিজ্ঞেস করেন মিসেস ব্যানার্জি। নিজেই উত্তর দিতে থাকেন নিজের মনে। নাহ্ এখনও শার্প কার্ভগুলোকে আলাদা করে চেনা যায়, এখনও লাভ হ্যান্ডেল বাসা বাঁধেনি কোমরে, এমনকী এখনও চোখের নিচে শকুনের পা থাবা বসাতে পারেনি।

নকশা এবং ইন্টিরিয়র দুটোই নিজে করেছিলেন। ফ্রস্টেড গ্লাসের দেওয়াল, অ্যান্টিক অ্যাকসেসরি, একটু গাছ রাখার জায়গা, বিরাট বেলজিয়াম কাচের আয়না, বড় যত্নে বানানো। সময় স্থির হয়ে বসে নেই ঠিকই কিন্তু সেভাবে দাগই বা কেটেছে কি? আয়নাকে জিজ্ঞেস করেন মিসেস ব্যানার্জি। নিজেই উত্তর দিতে থাকেন নিজের মনে। নাহ্ এখনও শার্প কার্ভগুলোকে আলাদা করে চেনা যায়, এখনও লাভ হ্যান্ডেল বাসা বাঁধেনি কোমরে, এমনকী এখনও চোখের নিচে শকুনের পা থাবা বসাতে পারেনি। পুরুষের চাউনি তো অনেক দেখলেন এই উনচল্লিশ পেরিয়ে আসা জীবনে, মেয়েরাও আড়চোখে তাকিয়ে দেখে। একটা দীর্ঘ স্নানের পর ইলা উপসংহারে আসেন, এই ইমারত এখনও খণ্ডহর হয়ে যায়নি। পছন্দের অ্যাঙ্গল থেকেই সকলে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। তবু আয়না মিথ্যে বলে না সচরাচর। তবে আরও সতর্ক হতে হবে। আরও নিক্তিতে মেপে নিতে হবে ক্যালরি, ঘাম ঝরাতে হবে অনেক বেশি। স্নান সেরে বেরিয়ে এলেন যখন মনটা খানিক হালকা, মাথাও খেলতে শুরু করেছে। মালতি চারটে আমন্ড এনে রাখে প্লেটে, কাপে মকাইবাড়ি ফার্স্ট ফ্লাশ চা। ইট উইল বি আ লং ডে, মিসেস ব্যানার্জি জানেন। গতকাল ডাকে আসা চিঠি, বইপত্র, লিটলম্যাগগুলোকে গুছিয়ে রাখেন ইলা। কয়েক জায়গায় মেইল করতে হবে। এখন তথাগতর আসার কথা। মধুপুর শহরকে প্রথম বার্তাটা তথাগতর মাধ্যমেই দিতে চান ইলা।

এলআইসি-তে চাকরি করে ছেলেটা, মধুপুর থেকে প্রায় দেড়ঘণ্টা দূরের নাগরাকাটা ব্রাঞ্চে। নিজের একটা পত্রিকাও আছে। প্রায় পনেরো বছর ধরে অসম্ভব ডেডিকেশনের সঙ্গে কাজটা করে চলেছে তথাগত। পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়াও অসহ্য কবিতা লেখা, সাহিত্যসভার আয়োজন করা, বইমেলার তদারকি এসব কাজে সবসময়ই ব্যস্ত থাকে ও। গত কয়েকবছরে ব্যস্ততা খানিক কমেছে, রাজনৈতিক পালাবদল হয়ে যাওয়ার পর। আসলে কলেজ জীবনের আগুনখোর বিপ্লবী তথাগতর রাজনীতি এখন মূলত ফেসবুকে। আমাজন অরণ্যের আগুন থেকে বলিভিয়ার অপসারিত প্রেসিডেন্টের হয়ে সওয়াল, সবটাই ফেসবুকে। পুরনো সহযোদ্ধারা হয় জার্সি বদল করেছে নয় ঘর সংসার, মেয়েকে টিউশনি থেকে আনা নেওয়ার কাজ করে চলেছে। তবু তথাগত নিজের রাজনৈতিক অবস্থান বদলায়নি। এদিক ওদিক টুকরো সমঝোতা করে নিয়েছে। শরতবাবুর টগর বোষ্টমি যেন, জাত দিয়েছে কিন্তু মিনসেকে হেঁসেলে ঢুকতে দেয়নি। মাঝেমধ্যে খারাপ লাগে অবশ্য। লোকে আদর করে তথাগতকে একসময় মধুপুরের সাংস্কৃতিক মাফিয়া বলে ডাকত এখন সেই তথাগত অনেককে সঙ্গে নিয়ে চলে। চলতে বাধ্য হয়। তবু ইলাদি থাকায় তথাগতর একটু সুবিধে। এককালে প্রেসিডেন্সির ছাত্রী হিসেবে কলকাতার আটঘাট উনি খুব ভাল বোঝেন, লেখেনও ভাল কিন্তু লেখার থেকে জনসংযোগেই বেশি মাহির। অধ্যাপনা এবং কবিতা লেখার মাহেন্দ্রযোগে এর মধ্যেই দুবার বিদেশ ঘুরে এসেছেন।

"তুই তো জানিস বোধহয়, আর্ট গ্যালারিতে আজ রোহনদা আসছেন, ওঁর ছবির একজিবিশন আছে। উত্তরবঙ্গে এটাই প্রথম সোলো একজিবিশন।"

"জানি ইলাদি, আমাদের তেরো জুলাই কমিটির তরফ থেকে ওঁকে মানপত্রও দিচ্ছি আমরা। এই কঠিন সময়েও সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের জন্যই যে ওঁর ছবি কথা বলে, তার একটা অ্যাপ্রিশিয়েশন দরকার। অপূর্বদা উদ্যোগ নিয়েছেন মূলত। তুমিই তো সঞ্চালনা করবে আজ!"

"তোকে যতদিন চিনি, ততদিন ধরেই তো 'কঠিন সময়', তোদের সুসময় কখন আসবে, তথাগত?"

"সারা পৃথিবীতে এত বৈষম্য, ভাল সময় এল কবে, দি?"

"শোন, এত বছর ধরে সরকার চালিয়েও এই রোম্যান্টিসিজম গেলো না? কোন ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিস, বলতো?"

"ইলাদি, সরকারে থাকাটা তো একটা স্ট্র্যাটেজি মাত্র। সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে থেকেই, আরও ভাল করে বললে, সিস্টেমের মধ্যে থেকেই লড়াইটা চালিয়ে গেছি আমরা।"

"হুম্, একসময়ে কমপিউটারের বিরুদ্ধে

আপোষহীন লড়াই চালিয়ে গেছিস তোরা। এখন অবশ্য তোদের টি-বেল্টের নেতাও ল্যাপটপ ক্যারি করে। ভাল।”

“গত ভোটে এরকম রেজাল্ট হবে, ভাবিনি।”, বহুবার বলা কথাটা আবার বলে তথাগত।

“হ্যাঁ, মানুষ তো জানে তোদের সুদীপ্ত মিশ্রর বাড়ির বেড়ালটাও সরকারি চাকরি করে”, বরাবরের মত তথাগতকে পেড়ে ফেলে ইলা মোক্ষম খবরটা দিলেন,

“রোহনদা এখন আর তোদের সঙ্গে নেই। ওঁর মনে হয়েছে এতদিন একটা দম বন্ধ করা অবস্থার মধ্যে ছিলেন উনি।”

“ক্কী ! রোহনদা, আমাদের রোহনদা?”

“হ্যাঁ, তোদের বইমেলা উদ্বোধন করা, একজিবিশন আলো করা, কলকাতার টপ সুশীল রোহন দাশগুপ্ত। আর নেই তোদের সঙ্গে।”

মুহ্যমান তথাগতকে ম্লান করে দিয়ে ইলা ব্যানার্জি বলে ওঠেন, “শোন তথাগত, সুপ্রভাতের বার অ্যাসোশিয়েশনের গেট টুগেদার আছে আজ সন্ধ্যায়, ইউরোপিয়ান ক্লাবে। আমি আর্ট গ্যালারিতে যেতে পারছি না। তোরা বরং মাধবীলতাকে সঞ্চালনার দায়িত্বটা দিয়ে দে। শি ওয়ান্টস টু গেট হারসেলফ ইন্টু দ্য অ্যামবিট।”

বাকরহিত তথাগতর অপস্রিয়মাণ শরীরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন মিসেস ব্যানার্জি। এই ইঙ্গিত অনেকদিন ধরেই পাচ্ছিল সে। দৈনিক সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয়তে মিনমিনে লেখা, টিভি-তে সান্ধ্য টক শোগুলো স্কিপ করা, এসবের মধ্যেই কোথাও একটা আভাস ছিল। ময়নাগুড়ি এবং ধুপগুড়ির কিছু পুরনো বন্ধুকেও আনফ্রেন্ড করে দিয়েছিলেন রোহনদা। আসলে তথাগতর মত ফেসবুকে বেঁচে থাকা বিপ্লবীরা জানেও না কাস্তের কোনদিকে ধার, জানে না হাওয়া মোরগ কখন অসময়ে ডেকে ওঠে। ইলা নিশ্চিত এতক্ষণে তথাগত ফেসবুক থেকে ছবি মুছে ফেলতে শুরু করেছে। ইলার সেই চিন্তা নেই। মধুপুরে সব দলের কাছেই ওর সমান অ্যাকসেপটেন্স। আসলে সরাসরি কোনও দলীয় বৃত্তে না থাকলে কারোরই শত্রু হওয়ার অবকাশ থাকে না। আজ সন্ধ্যায় বার অ্যাসোসিয়েশনের পার্টিটা সুপ্রভাতের বকলমে ইলাই থ্রো করছে। রোহনদাও আসবেন রাত দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ। ইদানীং মদ প্রায় খানই না, হাতে গ্লাস আর ঠোঁটে একটা মৃদু হাসি ধরা থাকে। সাধারণ অনুরাগীর ভিড়ে শিল্পী নিজেকে একটা হাসির মোড়কেই মুড়ে রাখেন। তাই ভাসা ভাসা কথা হবে আর্ট গ্যালারিতে। ব্রাশ স্ট্রোক নিয়ে কথা হবে। নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরির ইম্প্রেশনিজম নিয়ে তর্ক হবে কিন্তু স্কুপটা ইউরোপিয়ান ক্লাবের আড্ডাতেই জেনে নিতে হবে। আগেরবারও রোহনদা 'মধুকুঞ্জে'ই উঠেছিলেন কিন্তু এবারে রত্নপ্রদীপ হোটেল। তাই এই পার্টিটার খুব দরকার ছিল আজ।

তথাগত চলে যাওয়ার পর দুটো ফোন করলেন ইলা। প্রথমটা সীতেন দাসকে। ক্ষমতায় না থাকলেও সীতেন দাস আর জলধি আচার্যই পার্টির সাংস্কৃতিক দিকটা দেখেন। সীতেনদা আর ইলা একসময়ে এক কলেজেই পড়াত। রিটায়ার্ড সীতেনদা ফোন ধরেই বললেন,

“জানতাম তুমি ফোন করবে। আসলে আমরাও বুঝতে পারছি না কারণটা। নন্দীগ্রামের সময়েও তো টিভি-তে আমাদের হয়ে অনেক লড়াই করেছেন। ওঁর স্ত্রী এখনও আমাদের অ্যাকটিভ মেম্বার। রোহনের তো চাহিদাও কোনোদিন দেখিনি পার্টির কাছে, লোভও বিশেষ নেই। বরং পার্টি ক্ষমতায় ছিল যখন কবি বিশ্বদেব বসুর আড়ালেই থাকত। ক্ষোভও তেমন ছিল না। বিশ্বদেবকেই তো অনেকটা সময় ধরে আমাদের পোস্টারবয় করে রেখেছিলাম।”

“অত আমি বুঝি না সীতেনদা, তবে এটুকু বুঝি মধুপুরেও কবি, শিল্পী এবং সাহিত্যিক মহলে একটা নাড়াচাড়া শুরু হল বলে”, ফোন রেখে দেয় ইলা। সীতেনদারা এখন বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্যালেটে গোটা বিষয়টা গুলে দেখবেন। তথাগতদের বলবেন, “বিষয়টা দেখছি।” আর কত দেখবে সীতেনদার দল, পলিটব্যুরোও জানে না, ভগবান তো কোন ছার।

অপাপবিদ্ধা সিংহ রায়কে মোবাইলে ধরে ইলা। মেয়েটা মধুপুর থেকে একটু দূরে গ্রামের স্কুলে বাংলা পড়ায়। কবিতা মোটামুটি লেখে, রোহনদা স্নেহ করেন ওকে। একসময় সিংহ রায় ফ্যামিলির সঙ্গে রোহনদার পরিবারের বেশ যোগাযোগ ছিল। খানিকক্ষণ রিং হওয়ার পর ফোন ধরে অপাপবিদ্ধা,

'বলো দি'।

'জানিস কিছু?'

'একটু আগেই তথাগত ইনবক্স করেছিল।'

'তুই জানতিস না কিছু?' মনে মনে হাসেন মিসেস ব্যানার্জি।

'নাহ্‌, দিনকয়েক আগেই ফেসবুকে আমাকে আনফ্রেন্ড করেছেন উনি।'

'আর্ট গ্যালারিতে আসছিস আজ বিকেলে?'

'বোধহয় আসতে পারব না, দেবরাজের শরীরটা ভাল না।'

ইলা ব্যানার্জি বোঝেন হাওয়া মেপে নেওয়ার খেলা চলবে এখন বেশ কিছুদিন। এখন বেশ কিছুদিন রাতের টেলিফোন কথা বলবে।

আকাশে মেঘ করলে ইলার তেমন মনখারাপ হয় না আর। বরং পার্টি থ্রো করতে ইচ্ছে করে। মদ তো খান না ইলা, বড়জোর এক গবলেট রেড ওয়াইন। তবু পার্টি দিতে ভাল লাগে। এই যেমন আজ। রোদের তাপে ঝলসে যাচ্ছে মধুপুর, পাখিরাও গাছের আড়ালে। কিন্তু ইলা জানেন আজ অপরাহ্ণে মেঘ করবে। বৃষ্টি হবে। এই মফস্‌সল শহরের সব আমলকী গাছ আরও সবুজ হয়ে উঠবে লহমায়। প্রথম বৃষ্টির একটা সোঁদা গন্ধ আছে। মাটিও শুষে নেবে আশ্লেষে। গরুমারা অরণ্যের পুরুষ ময়ূর পেখম তুলে নাচবে। বর্ষাশেষের দিনগুলোতে অধৈর্য হয়ে উঠবে 'রেক্স', ইলা-সুপ্রভাতের ছেলে, চারবছরের জার্মান শেফার্ড। একটা ভাল পেডিগ্রির খোঁজ পাওয়া গেছে বানারহাটে। বানারহাট চাবাগানের ম্যানেজার রানা মিত্র সুপ্রভাতের ক্লায়েন্ট। 'রেক্স'-এর বান্ধবী হিসেবে রানা মিত্রর 'ডোরা' পারফেক্ট ম্যাচ। বর্ষা আসুক, বর্ষা শেষ হোক। আর তো মাত্র দুটো মাস। পুজোর আগে রেক্সকে নিয়ে বানারহাট যাবেন ইলা। রেক্স-এর প্রথম 'ডেট' উপলক্ষে পার্টি দেবেন 'টি-প্ল্যান্টার্স' ক্লাবে।

আকাশে মেঘ করলে ইলার তেমন মনখারাপ হয় না আর। বরং পার্টি থ্রো করতে ইচ্ছে করে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

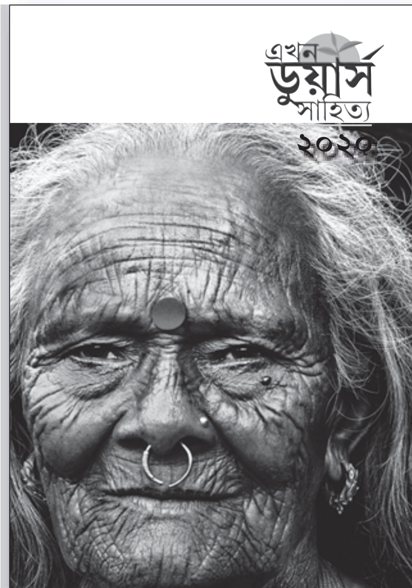

এ সময়ে বাংলার উত্তরে সাহিত্যচর্চার সেরা সংকলন

উপন্যাস— বিপুল দাস। তনুশ্রী পাল। অমিত কুমার দে। শুভময় সরকার। অভিজিৎ সরকার। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

গল্প— পীযূষ ভট্টাচার্য। অর্ণব সেন। অরুণাভ ভৌমিক। বিমল লামা। দিবাকর ভট্টাচার্য। গৌতমেন্দু রায়। তপতী বাগচি। সাগরিকা রায়। কল্যাণ গোস্বামী। রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়। সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য। দীপালোক ভট্টাচার্য। শাশ্বতী চন্দ। রম্যাণী গোস্বামী। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। শ্বেতা সরখেল। রাখি পুরকায়স্থ। দেবপ্রিয়া সরকার। মানিক সাহা। রঙ্গন রায়। সন্দীপন নন্দী। সত্যম ভট্টাচার্য। সৌমিত্র চৌধুরী। সুব্রত চক্রবর্তী। শাঁওলি দে। হিমি মিত্র রায়। সৌগত ভট্টাচার্য। শতরূপা নাগপাল। ইপ্সিতা সোম। অগ্রদীপ দত্ত।

কবিতা— তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত কবিতা। সন্তোষ সিংহের রাজবংশী কবিতাগুচ্ছ। সমীর চট্টোপাধ্যায়। অমর চক্রবর্তী। কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য। সমর রায়চৌধুরী। রাণা সরকার। বিজয় দে। মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস। সুজিত দাস। নিখিলেশ রায়। অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। রত্নদীপা দে ঘোষ। সেবন্তী ঘোষ। অনিন্দিতা গুপ্ত রায়। সোমা বৈদ্য। সুদীপ্ত মাজি। সুবীর সরকার। নিঝুম ঠাকুর। অমিত দে। জয়শীলা গুহ বাগচী। মনোনীতা চক্রবর্তী। সৌমনা দাশগুপ্ত। স্বপ্ননীল রুদ্র। শ্যামলী সেনগুপ্ত। শুক্লা রায়। সম্পা দত্ত দে। পাপড়ি গুহ নিয়োগী। সৌম্য সরকার। নীলাদ্রি দেব। মারুফ আহমেদ নয়ন। নির্মাল্য ঘোষ। অনুপ ঘোষাল। অভিজিৎ দাশ। দীপায়ন পাঠক। শক্তিপ্রসাদ ঘোষ। সুপ্রিয় চন্দ। প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। অমিত পাল। হেমন্ত সরখেল। তুহিন শুভ্র মন্ডল। জ্যোতির্ময় মুখার্জি। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। মহুয়া। সন্দীপ শর্মা।

সম্পাদক শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। মূল্য ১৯৫ টাকা

ধারাবাহিক কাহিনি। পর্ব ৭

তাজ্জব মহাভারত

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

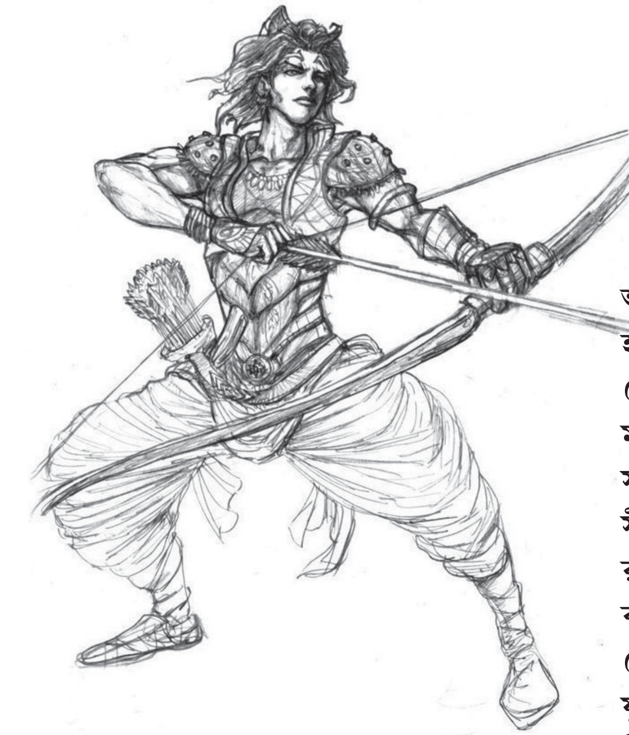

আশ্রম থেকে ভুসুকু কোথায় অন্তর্হিত হল তার সূত্র মধুক্ষরা পেয়ে গেল হাতিটার কাছ থেকে। ফলবাগানের সীমানা পেরিয়ে এক সময় তাঁর চোখে পড়ল গৈরিকোৎপল। বিহ্বল মধুক্ষরা এগিয়ে যেতে দেখল ভাজা মাছের টুকরো। তার মানে ভুসুকু সেখানে ছিল। সে ছুটল যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ দিতে। অন্যদিকে ভীষ্ম বেজায় বিরক্ত হয়েছেন ছোট দুই রাজার সীমান্ত সমস্যা সামলাতে। কিন্তু বেদব্যাস তাঁকে সৈন্ধবী ভাষায় লেখা রামায়ণের পুথি দিলেন। সে রাময়ণে আবার রাবণ হলেন হস্তিনাপুরের বাসিন্দা। বোঝা গেল সৈন্ধবদের আক্রোশ কত পুরনো ব্যাপার। শেষাবধি পুন্ডরীকাক্ষের হাত থেকে ভুসুকুকে উদ্ধার করার জন্য যুধিষ্ঠির কি কিছু করবেন? যমারণ্যের পথে বিপদ অনেক। পুন্ডরীকাক্ষ কি পারবেন ভুসুকুকে নিয়ে নির্ধারিত গ্রামে পৌঁছোতে?

২৩

উল্কার গতিতে রথ ছুটিয়ে মধুক্ষরা অবশেষে একটু বিভ্রান্ত হয়ে রাশ টানল। পথটা সামনে পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে পাঁচ দিকে চলে গেছে। পাঁচটা পথই হুবহু এক রকম। উদ্দেশে পৌঁছবার জন্য কোনটা ধরতে হবে তা বুঝতে পারল না সে। অনুসরণ করে আসা রক্ষী দুটি এই সুযোগে রথের পাশে এসে দাঁড়াল। একজন সবিনয়ে বলল, 'এইবার আমাদের অনুসরণ করুন ভদ্রে! শান্তি বজায় রাখুন। যুবরাজ যুধিষ্ঠির অশান্তি সহ্য করতে পারেন না।'

মধুক্ষরা চুলটা ভাল করে বেঁধে নিয়ে জানতে চাইল কোন পথ যুধিষ্ঠিরের ভবনের দিকে গেছে। রক্ষী দু-জন সে পথটা দেখিয়ে দিতেই মধুক্ষরা দ্বিগুণ উদ্যমে রথ ছোটাল। 'আমাদের আগে যেতে দিন!' তাঁরা বলেছিল, কিন্তু মধুক্ষরার কানে সেটা বোধহয় পৌঁছল না। সে চার পাশে তাকাতে ব্যস্ত ছিল তখন। একটু পরেই তাঁর চোখে পড়ল একটি বিশেষ ভবন। স্থাপত্যে, বর্ণে, সজ্জায় তার কোনও তুলনাই আশপাশে দেখা যাচ্ছিল না। মধুক্ষরার বুঝতে অসুবিধে হল না। সোজা রথ ছোটাল সে দিকে।

ভবনের মূল দ্বারে রক্ষীরা একটু অবাক হয়ে দেখলেন তীব্র গতিতে একটি রথ ছুটে আসছে তাঁদের দিকে। সারথিকে দেখে বিস্ময় আরো একটু বাড়ল। যে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মহিলা সারথি রথ চালিয়ে এগিয়ে আসছিল সেটা দেখে রক্ষীদের মনে হল কোনও রাজকন্য। তাঁরা বুঝতে পারল না ঠিক কী করা উচিত। ফলে খটাখট শব্দ তুলে, ধুলো উড়িয়ে মধুক্ষরা সোজা দ্বার পেরিয়ে মনোরম ভবনপথে প্রবেশ করল বিনা বাধায়। ভবনের একেবারে সামনে এসে রথ থামিয়ে নামল লাফ দিয়ে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কৌতূহলী নিরাপত্তা প্রধানের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'এই যে মহাশয়! যুধিষ্ঠিরদা কোথায়?'

নিরপাত্তা প্রধান স্মিত হেসে বললেন, 'আপনাকে উত্তেজিত এবং ধূলিধূসরিত দেখাচ্ছে ভদ্রে! আগে একটু বিশ্রাম নিন।'

'অসম্ভব! বিষয়টা গুরত্বপূর্ণ! উনি কি ভবনেই আছেন?'

'তা আছেন।'

মধুক্ষরা ক্ষীপ্র গতিতে দৌড়ল। নিরাপত্তা প্রধান এবার চিৎকার করে বললেন, 'নারী রক্ষীদের সতর্ক কর! ওকে ধরতে হবে! যুধিষ্ঠির অশান্তি সহ্য করতে পারেন না!'

যুধিষ্ঠির তখন সুগন্ধি ধূপশঙ্কু জ্বালিয়ে ধ্যানে বসার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। তাঁর কানে একটা কোলাহল ভেসে এল। তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর প্রাসাদে কোলাহল অসম্ভব। তিনি চমকিত হলেন। তারপর শুনলেন কে জানি 'ভো ভো যুধিষ্ঠিরদা!' বলে ডাকছে। নারীকণ্ঠ। তিনি একজন সচিবকে ডেকে পাঠাবেন বলে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেই বুঝলেন নারীকণ্ঠটি ঘরের কাছাকাছি চলে এসেছে। কয়েক পলকের মধ্যে একটি কিশোরী হুড়মুড় করে ধ্যানকক্ষে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়াল। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'এ ভাবে আসার জন্য ক্ষমাপ্রার্থি! কিন্তু ভুসুকুর খুব বিপদ! ওকে পাওয়া যাচ্ছে না!'

কয়েক জন রক্ষী হন্তদন্ত হয়ে কক্ষের দ্বারে এসে থমকে গেছে। যুধিষ্ঠির ইঙ্গিতে তাঁদের চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। চারদিক আবার নীরব হয়ে গেল। মধুক্ষরাকে বসতে বলে যুধিষ্ঠির ধ্যানে বসলেন। কক্ষের পবিত্র পরিবেশ। গন্ধধূপের নির্মলতা মধুক্ষরাকে অনেকটা শান্ত করে দিল। প্রায় এক দণ্ড ধ্যানমগ্ন থাকার পর যুধিষ্ঠির চোখ মেলে দেখলেন মধুক্ষরা তাঁর দিকে অপলক চেয়ে আছে।

'এবার বলো।'

মধুক্ষরা যতটা পারল সংক্ষেপে গুছিয়ে বলল তাঁর বক্তব্য। যুধিষ্ঠির মুখচোখ কঠিন হয়ে উঠল পলকের জন্য। সব শুনে তিনি বললেন, 'গৈরিকোৎপল অসম্ভব। অনুমান করি সেটা মায়াবিদ্যার দ্বারা ফোটান হয়েছে। ভুসুকুকে সেই মায়া দ্বারা কোনওভাবে বিভ্রান্ত করে অপহরণ করেছে কেউ!'

'ওকে আপনি বাঁচান!'

'ভুসুকু তোমার কে হয় কন্যা?'

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে পলকের জন্য মুখবর্ণ রক্তিম হয়ে উঠল মধুক্ষরার। যুধিষ্ঠির অবশ্য উত্তরের আশা করলেন না। উত্তর তিনি যেন অনুমান করে নিলেন। একটু ঝুঁকে পড়ে মধুক্ষরার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'কাউকে কিছু বলো না কন্যা! আশা করি ভুসুকু তোমাকে সে সব কথা বলেছে যা আমি তাঁকে গোপন রাখতে বলেছিলাম?'

মধুক্ষরা মাথা নিচু করল।

'বাড়ি ফিরে যাও। নিজেকে স্বাভাবিক রাখো। ভুসুকুর প্রতি তোমার অনুরাগের কথা কি তোমার সখিরা জানে?'

'কেউ কেউ অনুমান করে।'

'যাঁরা ভুসুকুকে অপহরণ করেছে তাঁদের কানে এ কথা পৌঁছোলে সমস্যা বাড়বে। তোমার নাম কী?'

'মধুক্ষরা। আমার বাবার নাম উচ্চকপাল। তিনি সারথি।'

'চিন্তা করো না মধুক্ষরা। এখন যাও। অতিথি না খেয়ে বিদায় নিলে গেরস্তের অকল্যাণ হয়। যাওয়ার আগে মিষ্টিমুখ করে যেও। উত্তেজনা হলে খিদে পায়।'

যুধিষ্ঠির হাঁক দিতেই একজন সচিব উপস্থিত হল। মধুক্ষরাকে আপ্যায়ণ পূর্বক বিদায় দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে পুণরায় ধ্যানে বসলেন তিনি। ক্রমশঃ তাঁর মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে এল। অতঃপর ধ্যানভঙ্গ করে তিনি একটি মহামূল্যবান শুভ্র উত্তরীয় অঙ্গে জড়িয়ে বের হলেন বাসভবন ছেড়ে। পিতামহকে এই সময় পুথিশালায় পাওয়া যায়। সেদিকেই হাঁটা দিলেন তিনি। তাঁর অনুমানে ভুল ছিল না। ভীষ্ম সেখানে কয়েকজন রাজপুরুষের সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন ছিলেন। যুধিষ্ঠিরকে প্রবেশ করতে দেখে রাজপুরুষরা দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করলেন। ভীষ্ম কৌতূহলী চোখে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'বিশেষ কোনও সংবাদ?'

'আপনি অবিলম্বে শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে নির্দেশ পাঠান। বৃহত্তর হস্তিনাপুরের প্রতিটি প্রবেশ দ্বারকে সতর্ক করুন। কোনও ব্যক্তিকে জোর করে কেউ নগরের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে কি না— তা যেন কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়।'

ভীষ্ম কয়েক পলক মৌন থাকলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে দুটো বর পায়। মনে হচ্ছে তার মধ্যে একটা চাইছে।

'বেশ।' ভীষ্ম সম্মতি দিলেন। আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে দু-বার হাত তালি দিলেন। একজন ভৃত্য প্রবেশ করল। ভীষ্ম নির্দেশ দিলেন আদেশাত্মক শঙ্খ আনার জন্য। সামান্য পরেই রাজকীয় আকারের একটি ধপধপে শঙ্খ স্বর্ণথালায় বয়ে আনল একজন। ভীষ্ম শঙ্খটি তুলে নিয়ে বাতায়নে দাঁড়িয়ে বিশেষ কৌশলে ফুৎকার দিলেন। কয়েক টুকরো ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। পলকের মধ্যে বিভিন্ন প্রান্তে সেই ধ্বনির অনুকরণে আরো আরো শঙ্খ। শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে ভীষ্ম বৃহত্তর হস্তিনাপুর সীমান্তে আপদকালীন সতর্কতা ঘোষণা করেছিলেন। রাজকীয় বার্তাবাহকেরা সে ধ্বনি নিজ নিজ শঙ্খের মাধ্যমে দূরদূরান্তে পৌঁছে দিচ্ছিল। অচিরেই তা পৌঁছে গেল সীমান্তের প্রবেশদ্বারগুলিতে। সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে ব্যস্ততা দেখা দিল।

দুর্যোধন তখন প্রসন্ন চিত্তে গঙ্গাবক্ষে একটি ভ্রাম্যমান অতিথিশালায় বিশ্রাম করছিলেন। সঙ্গে কর্ণ। পাশার গুটি সাজিয়ে প্রথম দান ফেলে কর্ণ বললেন, 'চাল দাও।'

দুর্যোধন অবহেলা ভরে চাল দিতে লাগলেন। খেলা চলতে লাগল। কর্ণ এক সময় একটি চালের পর লঘু স্বরে বললেন, 'পরাজয় আসন্ন বন্ধু। বাঁচার জন্য তোমার দরকার দুই। প্রতি গুটিতে এক ফেলতে হবে।'

দুর্যোধন এতক্ষণ আধশোয়া হয়ে খেলছিলেন। এবার উঠে বসলেন সোজা হয়ে। দুই করতলে পাশার গুটি দুটো ডলতে ডলতে চোখ বুঁজে কী জানি ভাবলেন। করতলদ্বয়ের ফাঁক দিয়ে গুটি দুটো তারপর ছকের পাশে টুপ করে খসে পড়ে কয়েকটা ডিগবাজি খেল। দুর্যোধন যেন জানতেন যে দুই-ই পড়বে। সামান্য হেসে আবার আগের অবস্থায় ফিরে গিয়ে আরাম করতে লাগলেন তিনি। কর্ণ গুটি দুটো তুলে নিয়ে প্রশংসার সুরে বলতে লাগলেন, 'তোমার পক্ষেই পাশায় বলে বলে দুই ফেলা সম্ভব। হাজার হলেও তুমি হলে শকুনির ভাগ্নে। তা মামার সংবাদ কী?'

দুর্যোধন উত্তরে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। জলের মৃদু শব্দ ভেদ করে আবছা শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছিল কক্ষের ভেতর থেকে। দুর্যোধন চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বাতায়নের সামনে এসে কান পাতলেন। এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে কর্ণও এগিয়ে এসেছিল। শঙ্খধ্বনি তাঁরও কানে গেছে। কিন্তু সেটাই যে দুর্যোধনের আগ্রহের কারণ, সেটা বুঝতে পারেন নি।

'শুনলে বন্ধু?' দুর্যোধন কর্ণের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিগ্যেস করলেন।

'কোনটা?'

'শঙ্খধ্বনি?'

'সম্ভবতঃ কোনও নৌকো থেকে আসছে। নদীর ওপাড়ে কোনও রাজবার্তা পাঠাচ্ছে বোধহয়।'

'ঠিক বন্ধু। কিন্তু ধ্বনিবার্তার অর্থ বুঝেছ?'

কর্ণ মাথা নিচু করলেন। এই শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া রাজবার্তার অর্থোদ্ধার করা সহজ নয়। এর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ চাই। রাজপুত্রদের সেই শিক্ষা থাকে।

'সীমান্তে আপদকালীন সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ যাচ্ছে। এমন নির্দেশ পরীক্ষামূলকভাবে যে যায় না এমন নয়। কিন্তু এটা কি কাকতালীয়?'

দুর্যোধনের কথার অর্থ বুঝতে পেরে কর্ণ একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তুমি বলছ ওদের সীমান্তে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে?'

'ওদের সঙ্গে কৃষ্ণবাহিনী আছে বন্ধু। তাঁরা আমার চিহ্ন বহন করছে। তাই সীমান্ত রক্ষীর সাধ্য নেই গাড়িতে ঘুমন্ত ব্যক্তির পরিচয় জিগ্যেস করবে। ওদের ওরা পরীক্ষাই করবে না।'

'যাক।'

কর্ণকে স্বস্তির শ্বাস ফেলতে দেখে দুর্যোধন হতাশ হলেন। বললেন, 'নির্দেশটা হস্তিনাপুর থেকে বিশেষ কারণে পাঠান হচ্ছে কি না সেটা নিয়ে একটু ভাব বন্ধু।'

'বিশেষ কারণে' শুনে কর্ণ যেন কিছুটা বুঝলেন। কিন্তু ভুসুকু কী এমন গুরুত্বপূর্ণ অসুর যে তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদ থেকে শঙ্খবার্তা সীমান্তে পাঠান হবে? কয়েক দণ্ড হলো তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। আশ্রমের লোকজন এখনও জানেই না কী হয়েছে তাঁর। মায়াময় গৈরিকোৎপল দেড় দণ্ডের বেশি দৃশ্যমান থাকবে না। কাজেই ভুসুকুর কী হয়েছে তা জানতে পক্ষকাল কেটে যাবে।

'তুমি ঠিকই বলেছ।' কর্ণের যুক্তি শুনে জানালেন দুর্যোধন। 'ভুসুকু আদৌ অতটা গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়। আজকের দিনে সীমান্তে অতিরিক্ত সতর্কতার ঘোষণাটি কাকতালীয়ই হবে।

২৪

সন্ধে অবধি ভুসুকুর কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না দেখে ভূতমিত্র একটু বিচলিত হলেন। ছোকরা আগেও একবার অন্তর্ধান করেছিল। কিন্তু যজ্ঞ যখন সন্নিকটে তখন না বলে চলে যাওয়ার ছেলে ভুসুকু নয়। কিন্তু সেই অন্তর্ধানের পর থেকে ভুসুকুর মধ্যে একটা পরিবর্তন কি আসে নি? ভূতমিত্র লক্ষ্য করেছেন যে তাঁর মধ্যে একটা অন্যমনস্ক ভাব কাজ করে। এটা আগে ছিল না। কিছু একটা গোপন করে সে। যদিও সময় পেলে ভুসুকুর দেশের কথা, সেখানকার প্রকৃতি, লোকব্যবহার, খাদ্যাভাস ইত্যাদি নিয় ভূতমিত্র তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। ভুসুকু তখন নিজের কথাও বলে কিছু কিছু। ভীমসেনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য ভূতমিত্র চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পাণ্ডবের করণ থেকে কোনও সাড়া মেলে নি। বিষয়টা একটু অবাক করেছিল ভূতমিত্রকে। এমনটা হওয়ার কথা নয়। হতে পারে ভুসুকুর বিষয়ে হস্তিনাপুরের কাছে কোনও বিশেষ তথ্য আছে।

কিন্তু যজ্ঞ পণ্ড করার কোনও ইচ্ছে তাঁর মধ্যে নেই। রহস্য একটা আছে, কিন্তু ভুসুকুকে ক্ষতিকারক মনে হয় নি তাঁর। সমুদ্রবিদ্যা তিনি খুব ভাল জানেন। ভুসুকুর চেহারায় অশুভ চিহ্ন খুব কম। চিন্তিত ভূতমিত্র ভাবলেন পড়ুয়াদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করবেন। যজ্ঞের আয়োজন উপলক্ষ্যে আশ্রম অনেক রাত অবধি জেগে থাকে। আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে গোল হয়ে বসে গল্প করার ব্যাপারটা ছাত্রদের কাছে খুব আনন্দের। শীতের হাওয়া এখন হাড় কাঁপিয়ে দেয়।

আশ্রমের সংসদ ভবনে রাত দ্বিতীয় প্রহরের শুরুতে আলোচনা শুরু হল। ভূতমিত্র সংক্ষেপে ভুসুকুর অন্তর্হিত হওয়ার সংবাদ জানিয়ে বললেন, 'ভুসুকুর অভাব আমি অনুভব করছি। আমার বিশ্বাস সে ইচ্ছে করে লুকিয়ে পড়ে নি। এই যজ্ঞ সফল করার জন্য সে আমাদের মতই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

পড়ুয়ারা নিজেদের মধ্যে গুজগুজ ফিসফিস শুরু করল। হঠাৎ অদত্ত দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি কিছু বলতে চাই।'

ভূতমিত্র অনুমতি দিলেন।

'ভুসুকু এই যজ্ঞের পক্ষে অপরিহার্য নয়। তা ছাড়া অনার্য কেউ আশ্রমের যজ্ঞে যুক্ত থাকুক, সেটা আমরা চাই না।'

কয়েকজন পড়ুয়া অদত্তকে সমর্থন করে একযোগে বলল, 'সাধু সাধু!' ভূতমিত্র ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন, 'অনার্য মানে? এই শব্দের অর্থ কী?'

'আপনি বোধহয় জানেন না যে প্রকৃত হস্তিনাপুরিদের আর্য বলার রীতি চালু হয়েছে?'

'কেউ কেউ এমন দাবি তুলছে শুনেছি। হস্তিনাপুরের সংবিধান বদলেছে বলে জানি না।'

'কেউ কেউ নয় গুরুদেব।' অদত্তের স্বরে কিন্তু বিনয়ের অভাব নেই। 'যুবরাজ দুর্যোধনপন্থীরা আর্যতত্ত্বের সমর্থক।'

'যুবরাজ দুর্যোধন?' ভূতমিত্র ঠিক বুঝতে পারলেন না অদত্তের উদ্দেশ্য। 'যুবরাজত্বের বিষয়ে ভীষ্ম এখনও কোনও বক্তব্য জানান নি বৎস্য! তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে। অনুমানের ভিত্তিতে বলতে হলে যুধিষ্ঠিরকেই যুবরাজ বলাটা বৈধ।'

'হয় তো তাই। কিন্তু আমরা যুধিষ্ঠিরের নিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে। অসুর তোষণ আমাদের পছন্দ নয়। ভুসুকুকে নিয়ে অতিরিক্ত ভাবনার প্রয়োজন নেই।'

ভূতমিত্র কয়েক পলক মৌন রইলেন। একটা সন্দেহ তাঁর মনে উঁকি দিল। কিন্তু সে নিয়ে পরে ভাববেন বলে স্থির করলেন। তারপর অদত্তের মুখে একবার চোখ বুলিয়ে বাকি ছাত্রদের উদ্দেশে বলতে লাগলেন, 'আমার ইচ্ছে ছিল যজ্ঞের তিনদিন আগে নগরে একটি বিজ্ঞাপণ প্রচার করা। হাতির ওপরে একটি রত্নখচিত আসনে আমি বসে থাকব। পেছনে সারিবদ্ধ আশ্রমিকেরা বাদ্যধ্বনি উৎপন্ন করতে করতে হাঁটবে। এইভাবেই নগরবাসীকে আমন্ত্রণ জানাতে চেয়েছিলাম আমি। —তোমরা কী বলো?'

প্রায় সবাই সহর্ষে বলল, 'সাধু সাধু!'

'জানি তোমরা খুশি হবে। তাই বলছিলাম ভুসুকুকে খুঁজে পাওয়া দরকার। আমার ধারণা সে

স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হয় নি।’

অদত্ত এবার একটু তীক্ষ্ণ সুরে জিগ্যেস করল, ‘স্বেচ্ছায় হয় নি —তার মানে কি বলপূর্বক কেউ তাঁকে অপহরণ করেছে? এই আশ্রম থেকে সেটা সম্ভব?’

মণিরত্ন নামের একজন শান্ত স্বভাবের ছাত্র হঠাৎ বলে বসল, ‘ভুসুকুদাকে কিন্তু কেউ আশ্রম থেকে বের হতে দেখে নি।’

‘সেটা জানা গেল কী ভাবে?’ পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল অদত্তের এক সমর্থক। উত্তরটা অবশ্য দিলেন ভূতমিত্র। আশ্রম থেকে বের হওয়ার মূল এবং গৌণ প্রবেশ পথে সব সময় কেউ না কেউ ছিল। কেউ তাঁকে বের হতে দেখে নি। কেবল ফলবাগানের প্রান্তে যে ঘাসজমি, সেদিকে কেউ ছিল না এবং আশ্রমে যাতায়াতের জন্য সে পথ কেউ ব্যবহার করে না।

অদত্ত দমে না গিয়ে বলল, ‘সে পথ দিয়েই হয় তো চলে গেছে।’

ভূতমিত্র এবার অদত্তের চোখে চোখ রেখে ঠান্ডা গলায় বললেন, ‘কারণ?’

অদত্ত সহসা সেই দৃষ্টির সামনে কোনও উত্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ করে গেল।

‘তবে তুমি একটা বিষয় ধরিয়ে দিলে অদত্ত।’ ভূতমিত্রের স্বর স্বাভাবিক। ‘ওই পথ দিয়ে ভুসুকুকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।’

মণিরত্ন বলল, ‘তা হলে সেটা জানা যেত গুরুদেব।’

ভূতমিত্র স্বীকার করলেন ছাত্রের যুক্তি। ‘বাকি থাকল একটাই সম্ভাবনা। ভুসুকুকে কোনওভাবে সেদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।’

অদত্ত হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল সবাইকে অবাক করে দিয়ে। শেষে হাসি থামিয়ে বলল, ‘ভুসুকু কি বাচ্চা ছেলে যে বলল আর ওদিকে চলে গেল। ক্ষমা করবেন গুরুদেব। আপনি যুধিষ্ঠিরের নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন করে ভুসুকুকে অযৌক্তিকভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁর এখানে আসার কোনও উদ্দেশ্য ছিল। সেটা মিটেছে। তাই হয় তো ফলবাগান পেরিয়ে সকলের অলক্ষ্যে প্রস্থান করেছে।’

অদত্তের সমর্থকের গলা মিলিয়ে সমর্থন জানাল। বাকিরা চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘ভুসুকুদাকে খোঁজা দরকার। গুরুবাক্যে সংশয় অনুচিত।’ সংসদ কক্ষে রীতমত হট্টগোল পড়ে গেল। অবশ্য আশ্রমে এই ধরনের মতবিরোধ বা তর্কাতর্কি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। নতুন যেটা সেটা হল যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধনকে ঘিরে মতবিরোধ। ভূতমিত্রের কাছে এই ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় নি। কিন্তু ভুসুকুর চিন্তাই তাঁর কাছে তখন গুরুত্বপূর্ণ।

হট্টগোলের মধ্যেই একজন ফিসফিস করে ভূতমিত্রের কানে কানে একটি সংবাদ দিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করে বেরিয়ে গেলেন। ঘন কুয়াশা নামতে শুরু করেছিল আকাশ থেকে। মশালের আলোয় তার মধ্যে দিয়ে আশ্রমের মূল প্রবেশ দ্বারের দিকে হাঁটতে লাগলেন তিনি। একজন রাজপুরুষ এসেছেন। তাঁর পরিচয় জানা যায় নি। সর্বাঙ্গে বহুমূল্য গরম কাপড় জড়িয়ে রথে তিনি অপেক্ষমান। তাঁর মুখ ঢাকা। নির্দেশ যা দেওয়ার সারথিই দিয়েছেন। নির্দেশ অবশ্য একটি বাক্যে। রথারোহী গুরুত্বপূর্ণ রাজপুরুষ। অবিলম্বে ভূতমিত্রের সাক্ষাৎ চাইছেন।

অপেক্ষমান রথের কাছাকাছি এসে ভূতমিত্র মশালবাহীদের নির্দেশ দিলেন দূরে গিয়ে দাঁড়াতে। তাঁরা চলে যেতেই সারথির গলা শোনা গেল —‘প্রণাম গুরুদেব। আপনি অনুগ্রহ করে এগিয়ে আসুন। রাজপুরুষ কোনওভাবেই দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তিকে পরিচয় জানাতে চান না।’

ভূতমিত্র রথের কয়েক হাতের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। আরোহি এবার মুখের ওপর থেকে আবরণ সরিয়ে একটু ঝুঁকে গম্ভীর কিন্তু মধুর স্বরে বললেন, ‘প্রণাম মুনিবর। আমি নকুল। বড়দা পাঠিয়েছেন।’

পাণ্ডবদের একজন এত রাতে তাঁর আশ্রমে গোপনে সাক্ষাৎ করতে আসবেন, এটা ভূতমিত্র একেবারেই ভাবেন নি। নকুল সেটা অনুমান করেই বলল, ‘আপনার বিস্ময়ের কারণ আছে মুনিবর। বড়দা নিজে আসতে পারবেন না বলে আমাকে পাঠিয়েছেন। বস্তুতক্ষ্ম বড়দার পক্ষে এতটা গোপনে আসাও সম্ভব নয়।’

‘আপনার আগমনের হেতু?’

‘ভুসুকুকে অনুসন্ধান করার সব রকম চেষ্টা বন্ধ রাখুন। বড়দা সেটাই চাইছে।’

‘যুধিষ্ঠির?’

ভূতমিত্রের সব কিছু গুলিয়ে গেল। প্রবল প্রতাপশালী হস্তিনাপুরের যুবরাজ সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মত রাজপুরুষ ভুসুকুকে নিয়ে ভাবছেন! রথারোহী ব্যক্তি সত্যিই নকুল তো? ভূতমিত্র একবার দেখে নিলেন। রথের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন দাসের হাতে একটি ছোট মশাল জ্বলছিল। তাঁর অল্প আলোয় নকুলকে চিনতে একটুও ভুল হলো না। নকুলই তো! এত রূপবান যুবক হস্তিনাপুরে আর নেই। ভল্ল চালনায় সে বীরশ্রেষ্ঠ। দু-হাতে দুটি ভল্ল থাকলে সে প্রায় অপরাজেয়।

‘আপনার বিস্ময় সম্পূর্ণ দূর করার অনুমতি নেই। শুধু এতটুকু বলার অনুমতি আছে যে ভুসুকুর বিষয়টি অতি গুরুতর। তাঁকে খুঁজে পাওয়া বোধহয় আপনাদের পক্ষে অসম্ভব। আশঙ্কা করা হচ্ছে তাঁকে হস্তিনাপুরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’

‘সে কী!’

‘আপনি বিচলিত হবেন না। বড়দা যা করার করবেন। আশা করি তাঁর ওপর আপনার ভরসা আছে?’

‘তা বলাই বাহুল্য হে চতুর্থ পাণ্ডব।’ ভূতমিত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালেন।

‘আর একটা নিবেদন।’

‘বলুন।’

‘আপনার যদি বিশেষ কিছু বলার থাকে তবে কেবলমাত্র বড়দাকে বলবেন। এবার বিদায় দিন।’

নকুল প্রণাম জানিয়ে অনুমতি নিয়ে বিদায় নিলেন। ঘন কুয়াশায় তাঁর রাজকীয় রথটি মিলিয়ে গেল কয়েক পলকের মধ্যে। ভূতমিত্র টের পেলেন তিনি ঠকঠক করে কাঁপছেন। তবে সেটা ঠান্ডায়।

২৫

চোখ খোলার পর ভুসুকু বুঝল সে শুয়ে আছে একটা চমৎকার বিছানায়। শরীরটা তাঁর ঢাকা মূল্যবান গরমবস্ত্রে। কিন্তু বিছানাটা কোনও কক্ষে নেই। মনে হচ্ছে পশুচর্ম নির্মিত একটি শিবিরে সে রয়েছে। প্রাথমিক ঘোর কাটার পর সব কিছু মনে পড়তেই হুড়মুড় করে উঠে পড়ল সে। পর্দা সরিয়ে বাইরে এসে থমকে গেল। এটা কোন স্থান? সময়টা যে সকাল তা বোঝা যাচ্ছে। আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন হওয়ায় রোদ্দুর খুব হালকা। চারপাশে উঁচুনিচু রুক্ষভূমি। অনেকগুলি চর্মনির্মিত শিবির দেখা যাচ্ছে। লোকজনও চোখে পড়ল। সকলেই সশস্ত্র। তাঁরা সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

‘ঘুম হলো?’

একটু চেনা স্বর কানে আসতেই চমকে তাকাল ভুসুকু। পাশের শিবির থেকে যে ব্যক্তি বেরিয়ে এসে প্রশ্নটা করেছে সে পূর্বপরিচিত। সেই লালচুলো লোকটা।

এবার ভুসুকু অনেকটা বুঝে গেল একবারে। সে আবার পাগলটার পাল্লায় পড়েছে।

‘খিদে পায় নি?’ পুন্ডরীকাক্ষ হাসিমুখে এগিয়ে এল। ‘আপনি আমাদের অতিথি। তবে বন্দি। আগের বার জোর ফাঁকি দিয়েছিলেন। এবার আর সেটা হচ্ছে না।’

‘আমি এখন কোথায়?’ ভুসুকু শান্ত থাকার চেষ্টা করল।

‘ওইদিকে তাকান।’ পুন্ডরীকাক্ষের হাত অনুসরণ করে ভুসুকু দিগন্তের দিকে দেখল সেটা কুয়াশায় ঢাকা। তবে একটু বেশিই ঢাকা। সে বিশেষ কিছু বুঝল না।

‘ওইদিক দিয়ে যাব আমরা। ওটা একটা অরণ্য। যমারণ্য। আজ দ্বিপ্রহরের পর যাত্রা করলে সন্ধের আগে অরণ্যের ঠিক সীমানায় পৌঁছব। ভেতরে ঢুকব কাল। আপনি ইচ্ছে করলে পালিয়ে যেতে পারেন।’

যমারণ্যের কথা অনেকের মুখেই শুনেছে ভুসুকু। এ বিষয়ে তাঁকে সব চাইতে বেশি বলেছে মধুক্ষরা। তাঁর কথা মনে হতেই ভুসুকু একটু বিষণ্ন হল।

‘আমি একটি গৈরিকোৎপল দেখেছিলাম।’ ভুসুকু বলল। ‘তারপর তার ঘ্রাণ নিই। এসব নিশ্চই আপনাদের পরিকল্পনা?’

‘সে আর বলতে!’ পুন্ডরীকাক্ষ যেন খুব মজা পেয়েছে। ‘ফুলটা ছিল মায়া। খুব উচ্চাঙ্গের মায়া। ব্যয়বহুল।’

‘এত ব্যয় আর পরিশ্রম করে আমাকে ধরছেন কেন আপনি?’

‘সেটা প্রথমবার বলেছিলাম। আশ্রমের পড়ুয়াদের মধ্যে আপনি বেশ জনপ্রিয়। ভূতমিত্রের আশ্রম থেকেই দুর্যোধনের উত্থান শুরু হবে মহাশয়!’

‘আপনি বৃথা চেষ্টা করছেন।’

‘আপনাকে তো সম্মোহন করব ভুসুকুবাবু। জগতের সেরা মায়াবী অঙ্গরাজ অঙ্গার আপনার মগজধোলাই করবেন। তারপর আপনি আমাদের কথাই শুনবেন। ব্যর্থতার কোনও প্রশ্নই নেই।’

একজন মাটির পাত্রে বেশ কিছু শুকনো খাবার আর ফল এনেছে। পুন্ডরীকাক্ষ সেদিকে ঈঙ্গিত করে বললেন, ‘খেয়ে নিন। কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না। যাত্রা শুরুর পর আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন কি না, সেটা আপনার ব্যাপার।’

‘না গেলে সম্মোহন করবেন কী ভাবে?’

পুন্ডরীকাক্ষ এগিয়ে এলেন। ভুসুকুর কাঁধে হাত রাখলেন। শান্ত স্বরে বললেন, ‘না গিয়ে উপায় নেই ভুসুকুবাবু! এদিকে রাতে একা একা ঘুরে বেড়ালে শৈত্যপ্রবাহে হিম হয়ে মরে যাবেন। আপনার জন্য একটা বিলাসবহুল জীবন অপেক্ষা করছে। আপনি

হস্তিনাপুরের কেউ নন। যুধিষ্ঠিরের পরিবর্তে দুর্যোধনকে মেনে নিতে আপনার আপত্তি থাকার কোনও কারণ ছিল না, অথচ আপনি দ্বিধাগ্রস্ত। সম্মোহনের ফলে দ্বিধা কেটে যাবে। বিশ্বাস তৈরি হবে।'

ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে পুন্ডরীকাক্ষ অন্যদিকে চলে গেলেন। ভুসুকু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই মুহূর্তে ক্ষিধে দূর করাটাই কর্তব্য। সে শিবিরে ঢুকে তাই করল। তারপর বেরিয়ে ঘুরতে লাগল এদিক ওদিক। পুন্ডরীকাক্ষের সঙ্গে লোকবল মন্দ নয়। সকলকেই প্রশিক্ষিত যোদ্ধা মনে হচ্ছিল। কয়েকজন কৃষ্ণবস্ত্রে নিজেদের নাক অবধি ঢেকে রেখেছে। এদের চেহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। ভুসুকু এটা শুনেছে যে যমারণ্য অতি বিপদজনক। এই অরণ্যে একদিকে যেমন সুস্বাদু ফল এবং সুগন্ধি পুষ্পের অভাব নেই, বহুবর্ণের পক্ষির অভাব নেই তেমনই রয়েছে অতি ভয়ানক এক জাতির বসবাস। খুব দক্ষ সৈন্যদলের সাহায্য ছাড়া এ পথে সচরাচর কেউ যাতায়াত করে না।

দ্বিতীয় প্রহর পড়তেই পুন্ডরীকাক্ষের নেতৃত্বে বাহিনী পথচলা শুরু করল।

সুদূর দিস্তং নদীর পাড় থেকে ভুসুকু হস্তিনাপুর এসেছিল। তারপর এই প্রথম সে এসে পড়ল নগরের বাইরে। এদিকার মাটি অনেক শুকনো। বাহিনীর সঙ্গে চলার জন্য একটা মোষের গাড়ি বরাদ্দ ছিল ভুসুকুর জন্য। কিন্তু সে হাঁটতে থাকল। প্রায় পঞ্চাশজনের দল। শিবিরের জন্য পশুচর্ম, অক্ষ, দড়ি বহন করা ছাড়াও শুকনো খাবার আর জল বহন করছিল দশ বারোজন। বাকিরা সবাই যোদ্ধা। তবে যাত্রা শুরুর ঠিক আগে একটি বিশেষ শিবির থেকে যিনি সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়লেন, তিনিই বোধহয় আসল অধিনায়ক।

ভুসুকু বোঝার চেষ্টা করছিল। তাঁর প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা নেই। একা একা হস্তিনাপুর ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। পুন্ডরীকাক্ষ সম্মোহন করার কথা বলেছে। সেটা করতেই যমারণ্যের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ স্থানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার মানে ভুসুকু ওদের কাছে অতিগুরুত্বপূর্ণ একজন। গুরুত্বের কারণটা অবশ্য তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। পুন্ডরীকাক্ষ অবশ্য জানে না যে তাঁর পরিকল্পনার সংবাদ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের কাছে পৌঁছে গেছে। আশ্রম থেকে ভুসুকুর অন্তর্হিত হওয়ার সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছোতে দেরি হবে না। তিনি নিশ্চই উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন।

পথে সামান্য চড়াই উৎরাই ছাড়া বাধা ছিল না। বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। তৃতীয় প্রহর কিছুটা গড়াতে তাঁরা এসে থামল অরণ্যের সীমানায় থাকা প্রায় এক ক্রোশ চওড়া একটা মাঠের সামনে। অনেকদিন আগে এই মাঠে যুদ্ধ হত। এখন ছোটবড় লতাগুল্মে ছেয়ে গেছে। মাঠের ওপাড়ে যমারণ্যের শুরু। গোড়ায় অবশ্য জঙ্গল তেমন গভীর নয়। এক বেলার পথ সে অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করলে মূল অরণ্যে প্রবেশ করা যাবে। তারপর আরো দু-দিনের যাত্রা।

ভুসুকু লক্ষ্য করছিল পুন্ডরীকাক্ষ তাঁর থেকে দূরে থাকছে না। একটু ব্যবধান রেখে সামনে হাঁটছে। কৃষ্ণবস্ত্রধারী যোদ্ধারা ছাড়া বাকিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল অজানা ভাষায়। ভুসুকু অবশ্য হস্তিনাপুরের চলতি ভাষা শিখেছে। তার সঙ্গে এদের ভাষার বিন্দুমাত্র মিল নেই।

মাঠের মধ্যেই শিবির স্থাপনের সিদ্ধান্ত হল। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে পুন্ডরীকাক্ষ এগিয়ে এসে ভুসুকুকে বললেন, 'আশা করি কষ্ট হয় নি। যমারণ্যের বিপদের কথা ভেবে আতঙ্কিত হবেন না। ও সব আমাদের কাছে কিছু নয়।'

'ওই ব্যক্তি কি আপনাদের নেতা?'

কিছুটা দূরে থাকা চাদরে মোড়া লোকটিকে দেখিয়ে জিগ্যেস করল ভুসুকু। পুন্ডরীকাক্ষ হেসে বললেন, 'আপনার অনুমানের প্রশংসা করতে হয়। উনি অম্লরাজ অঙ্গার। সময় এলে আলাপ হবে।'

ভুসুকু চুপ করে থাকল। পুন্ডরীকাক্ষ ধূর্জটিবর্মা আরো একটু এগিয়ে এসে মুখটা ভুসুকুর মুখের সামনে নামিয়ে এনে ফিসফিস করে বললেন, 'আগের বার পালিয়ে গিয়ে কাউকে কিছু বলেছিলেন?'

ভুসুকু অম্লানবদনে বলল, 'দু-একজনকে বলার চেষ্টা করেছিলাম। কেউ বিশ্বাস করে নি।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'আমার কিছু করার নেই।'

পুন্ডরীকাক্ষ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন আবার। এবার তাঁর মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। 'ভেবেছিলাম ভূতমিত্র আপনার হয়ে কোটালের কাছে অভিযোগ জানাবেন। সে সব যখন ঘটে নি তখন আপনার কথা বিশ্বাস করে নিলাম। তবে সে সব ঘটলেও কিছু যায় আসত না।'

ভূতমিত্রের সব কিছু গুলিয়ে গেল। প্রবল প্রতাপশালী হস্তিনাপুরের যুবরাজ সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মত রাজপুরুষ ভুসুকুকে নিয়ে ভাবছেন! রথারোহী ব্যক্তি সত্যিই নকুল তো? ভূতমিত্র একবার দেখে নিলেন। রথের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন দাসের হাতে একটি ছোট মশাল জ্বলছিল। তাঁর অল্প আলোয় নকুলকে চিনতে একটুও ভুল হলো না।

আচমকা ধুপ করে একটা শব্দ হল। ভুসুকু চমকে পাশে তাকিয়ে দেখল তাঁর জন্য বরাদ্দ মোষের গাড়ির পেছন দিকটা ভেঙে নিচের দিকে বসে গেছে। মহিষ দুটো বেরিয়ে গেছে জোয়াল ছেড়ে।

কী হচ্ছে বোঝার আগেই চোখের সামনে একটা বড় পাথর উড়ে আসতে দেখল ভুসুকু। পলকের মধ্যে পুন্ডরীকাক্ষ তাঁকে সরিয়ে দিল ধাক্কার মেরে। পাথরটা পড়ল একটা ঘোড়ার মাথায়। সেটা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

'শিলাক্ষেপণ! সাবধান!'

কেউ একজন চিৎকার করে সতর্ক করল। দুমদাম করে পাথর এসে পড়তে শুরু করেছে এর মধ্যেই। কোনও রকমে গাছের আড়ালে মাথা বাঁচাতে আশ্রয় নিল কয়েকজন। অশ্বারোহীরা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। এতে পাথর লাগার সম্ভাবনা কম।

ভুসুকু একটা গাছের পেছন দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। বড় গুলতির সাহায্যে কেউ পাথর ছুঁড়ছে। ধুপ ধাপ করে পড়ছে আশপাশে। কিন্তু ক্ষতি বিশেষ করতে পারে নি। পাথরের উড়ে আসা অবশ্য থেমে গেল একটু পরেই।

'ওরা ওদের থামাতে পেরেছে। আক্রমণ!'

কোমর থেকে তলোয়ার খুলে এবার নির্দেশ দিলেন পুন্ডরীকাক্ষ ধূর্জটিবর্মা। বাকি যোদ্ধারা সামনের দিকে দৌড়ল রণহুঙ্কার তুলতে তুলতে। ভুসুকু গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দেখল খুব জোর দুশো হাত দূরে জোর লড়াই বেঁধে গেছে। প্রতিপক্ষ একদল ভীমাকৃতির লম্বা চুলওয়ালা মানুষ। তাঁদের হাতে বড় বড় খড়্গ। কিন্তু পুন্ডরীকাক্ষের সৈন্যরা যে উঁচু মানের যোদ্ধা সেটা এবার বুঝতে পারল ভুসুকু। তাঁরা যেমন ক্ষীপ্র তেমনই শক্তিশালী। দেখতে দেখতে ছয়-সাত জন আক্রমণকারী লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বাকিরা চম্পট দিল। ঘোড়সওয়ারেরা পলাতকদের পিছু নিতে চাইলেও পুন্ডরীকাক্ষ তাঁদের নিরস্ত করলেন।

লড়াই শেষ হয়েছে দেখে ভুসুকু এগিয়ে গেল। ডালপালা, লতাপাতা দিয়ে একটা আড়াল তুলে দুটো গুলতি সাজিয়ে অপেক্ষা করছিল আক্রমণকারী কয়েক জন। লড়াইতে তাঁদের যে ক-জন প্রাণ দিয়েছে, তাঁদের শরীর মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে পুন্ডরীকাক্ষ বললেন, 'এরা যমারণ্যের লোক। মনে হয়ে জঙ্গল সীমান্ত পাহারা দিচ্ছিল। কাছাকাছি তাঁরা আরো থাকতে পারে।'

কথাগুলো চলতি হস্তিনাপুরি ভাষায় ভুসুকুর উদ্দেশে বলা। ভুসুকু জিগ্যেস করল, 'আবার আক্রমণের সম্ভাবনা আছে? রাতে যদি দল বেঁধে আসে?'

'এরা আগুনের ব্যবহার ভাল জানে না। রাতে এরা আসবে না। —তা যুদ্ধ কেমন হল?'

'বলতেই হবে আপনার লোকেরা উঁচু মানের যোদ্ধা। বিশেষ করে কালো কাপড় পরা লোকগুলো তো বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন!'

'ওরা কৃষ্ণযোদ্ধা। হস্তিনাপুরের সেরা যোদ্ধা। যুবরাজ দুর্যোধনের সৌজন্যে ওদের পাওয়া গেছে।'

কথাটা বলে পুন্ডরীকাক্ষ শিবিরস্থানের দিকে হাঁটা দিল গটগট করে। তাঁকে অনুসরণ করে ভুসুকু আগের জায়গায় ফিরে এসে দেখল অম্লরাজ অঙ্গার শান্ত ভাবে একটি ঘোড়ার পিঠে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় এই প্রথম তাঁর মুখ দেখতে পারল ভুসুকু।

'অসামান্য!'

পুন্ডরীকাক্ষের কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন। 'তোমার যোদ্ধাদের রণকীর্তি স্বচক্ষে এই প্রথমবার দেখছি। এতদিন তোমার মুখে তাঁদের প্রশংসাই শোনা ছিল। প্রশংসারই যোগ্য ওরা!'

'শিবিরে আজ রাতে আক্রমণ হবে না গুরুদেব।' বিনীত স্বরে জানালেন পুন্ডরীকাক্ষ। 'এরা নিশাচর যোদ্ধা নয়। তবে অরণ্যে প্রবেশ করা মাত্রই আক্রমণ আসতে পারে।'

'জানি কাল সকালটা কঠিন হবে।' অম্লরাজ বললেন। 'কিন্তু সেটা ওদের কাছে হবে।'

পুন্ডরীকাক্ষ নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। অম্লরাজ অঙ্গার ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলেন। পাথরের আঘাতে প্রাণহানী বলতে একটি অশ্বের মৃত্যু হয়েছে। তবে গাড়ি ভেঙেছে দুটো। এ ছাড়াও কিছু খাদ্য এবং অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট হয়েছে। ধীর পায়ে সেই ক্ষতিগুলো দেখতে লাগলেন তিনি। ভুসুকুর দিকে বারেকের জন্য তাকালেনও না।

(ক্রমশ)

ডাইনি

রম্যাণী গোস্বামী

মন ভাল নেই কুসুমের। দু'দিন হয়ে গেল কোলের ছেলেটার জ্বর কমছে না। পাশের বাড়ির ল্যাংড়া হুলোটা অন্য বাড়ির এঁটোকাঁটা খেয়ে নেংচে নেংচে পুরো পাড়া ঘুরে এসে বমি করল ঠিক ওর নিজে হাতে সক্কালবেলায় গোবর দিয়ে নিকানো তকতকে উঠোনটায়। হুলোটাকে দেখতে পেলে ওর চোখ গেলে দেবে কুসুম।

মন ভাল নেই কারণ ঘরে একটা টাকাও নেই আর সুহাস আজ তিনদিন হল বাড়ি ফেরে নি।

হাটবার ছিল গিয়ে গেল শনিবার। উঠোনের ধারে রোদে কাপড় মেলার তারে এখনও ঝুলছে সুহাসের ছেঁড়া গামছা আর ছেড়ে যাওয়া লুঙ্গিখানা। মানুষটা অন্যের জমিতে খেটে খায়। তাছাড়া একশো দিনের মাটি কাটার কাজ, দিন মজুরির কাজ, যা যখন পায় তা-ই করে। শনিবার কাক ভোরে মালিকের জমির মিষ্টি কুমড়ো, পটল আর ঝিঙা ঝাঁকায় ভর্তি করে নিয়ে সে গিয়েছে সেগুলো হাটে বেচতে। তারপর ঘরে ফিরে আসার বদলে কোথায় যে গেল? কোন ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটা আদাড়ে বাদাড়ে তা ঈশ্বর জানেন।

অন্যান্যবার সঙ্গে কুসুমও যায়। সকাল সকাল জামডাঙা যাওয়ার গাড়ি চড়ে দুজনে। সারাদিন ধরে হাটে বেচাকেনা সেরে আবার রাতে ফিরে আসে। রোজগার যা হয় মালিক তার থেকে কিছুটা কেটে নিয়ে ওদের হাতে দেয়। ছেলে জন্মানোর পর ওকে একবার রেখে গিয়েছিল ন'মাইমার কাছে। ন'মাইমার নিজের দুটো সন্তান। শ্বশুরের মস্ত ভিটে। বাড়ি ভর্তি কত লোকজন, চাকর বাকর। এর কোলে তার কোলে ঘুরে ছেলের দিব্যি সময় কেটে গেছিল। কিন্তু এবারে

সুহাস ওকে বারণ করল যেতে। এখন মানুষটার খোঁজ পাবে কীভাবে কুসুম?

সকাল থেকে সে খালি ঘটি বাটি আছড়েছে। ঘরের প্রতিটি কোণা, তাপ্পিমারা তোশকের তলা, কৌটো, হাঁড়ি-পাতিল সব তন্নতন্ন করে হাতড়িয়ে বেড়িয়েছে। দুটো চাল কী পয়সার মুখও দেখতে পায় নি। কেঁদে কেঁদে কুসুমের চোখের কাজল গালে লেপটেছে। পরনের বেশবাস আলুথালু। ছেলেকে দুধ দিচ্ছিল। তার গা এখনও বেশ গরম। জ্বরের ঘোরে হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। কুসুম ঠাকুরের আসন থেকে ওর একমাত্র সম্বল পিতলের রেকাবিটা তুলে নেয় হাতে। ঘুণ ধরে যাওয়া দরজার পাল্লা আঁকড়ে ধরে কষ্ট করে ওঠে। কোলে ওর ছেলে অচেতনের মত ঘুমোয়। এক মাথা রোদে গায়ের আঁচল টেনে ধীর পায়ে কুসুম এগোয় সাহাবাবুর বাড়ির দিকে।

চারটে দোকান, মিল আর আড়তের মালিক গৌরাঙ্গ সাহা অল্প কিছুদিনেই এই গ্রামে তার বন্ধকী কারবারটাও ভালই জমিয়ে নিয়েছে। সবে মিল থেকে কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে স্নান করে পাকা দালানে খেতে বসেছে লোকটা। নাম গৌরাঙ্গ হলেও তার থলথলে উদোম গা কষ্টিপাথরের মত কালো। সমস্ত গায়ে ভাল্লুকের মতো লোম। লুঙ্গির কষি আলগা করে বাঁধা। কোমরের কাছে ঘামাচি বিনবিন করছে। কাঁসার থালার পাশে গোল করে সাজানো রয়েছে নেই নেই করে আট রকম ব্যঞ্জনের বাটি। কর্তামা পাশেই পিঁড়ি পেতে বসে পরিবেশন করছে। ফ্যাটফ্যাটে সাদা গায়ের রঙ। হাতে হাতপাখা। গত ক'বছরে খুব মুটিয়েছে। কর্তামায়ের শরীরে বাতের ব্যথা। নড়তে চড়তে কষ্ট। একবার বসলে আর সহজে উঠতে পারে না। ব্যথায় কোঁকায় সর্বক্ষণ।

কুসুমকে দেখে ব্যথাকাতর ব্যাজার মুখখানি আরও বিকৃত হয়ে উঠল কর্তামায়ের, খ্যানখ্যানে গলায় বলে উঠল সে, কে ওটা ওখানে দাঁড়িয়ে? কুসমি? আহ্! নোলা নিয়ে হারামজাদি আর আসার সময় পেলি না? কী? কী চাই তোর এখানে?

আঁচলটা ভাল করে টেনে শরীর ঢেকে ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কুসুম। আড়চোখে তাকিয়ে দেখে ভাতের থালার পাশে গোল করে সাজানো বাটিগুলো। ফটফটে সাদা ভাতের স্তূপ থেকে চোখ পিছলে সরে যায় ছোলার ডাল, আলুপোস্তে। ওসব নিরামিষ পদগুলিতে এক চক্কর মেরে এসে বড় বড় দুটো কাঁসার বাটিতে লাল ঝোলে ডোবানো পাঁঠার মাংস আর রুই মাছের তিনকোণা টুকরোটা দেখেই তৎক্ষণাৎ জিভে জল চলে আসে ওর। মনটা আরও বেশি খারাপ হয়। হায়রে পোড়া কপাল, কতদিন হয়ে গেল একফোঁটা আঁশও চাখে নি ওরা পরিবার সুদ্ধু। শরীরে তার বড় খিদে। ভাল ভাল খাবারের কথা মনে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভিতরটা টুপটুপ লালায় ভরে যায়।

গৌরাঙ্গ সাহার কুতকুতে দুটো চোখ যেন গিলছিল কুসুমকে। ঘরঘরে শ্লেষ্মা জড়ানো স্বরটা ওকে জিগ্যেস করল, বল, এই অবেলায় কী জমা করতে এসেছিস তুই আমার কাছে?

সাহাবাবুর কথারও কোনও জবাব দিতে পারে না সে। তাই দেখে ভীষণ রেগে ওঠে কর্তামা। হাতপাখা মেঝেতে ঠুকে চেঁচিয়ে ওঠে, এখনই দূর হ মুখপুড়ি...

কর্তামায়ের হাতের সোনার বালা ঝনঝনিয়ে ওঠে। প্রবল রোষে জোরে জোরে পাখা দিয়ে হাওয়া করতে থাকে সে তার স্বামীকে। মেঝেতে পিতলের রেকাবি নামিয়ে রেখে আড়ষ্ট হয়ে ঢোঁক গিলতে গিলতে কুসুম কোনওমতে বলে ফেলে সুবলের লা-পাতা হয়ে যাওয়ার কথা। বলে ফেলে একরত্তি দুধের শিশুটার অসুখের কথা। বলতে বলতে অসহায়ের মত কেঁদে ফেলে আবারও।

ও তরফ থেকে কোনও উত্তর মেলে না প্রথমটা। অনেকটা সময় ধরে খেতে ব্যস্ত কর্তা, পরিবেশনে ব্যস্ত গিন্নী। তারপর সাহাবাবু আবার ঘোলা চোখে তাকায় কুসুমের দিকে। যেন কুসুমের মনের ভিতর পর্যন্ত পড়ে নিচ্ছে লোকটা, এমনভাবে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। কর্তামা উশখুশ করে ছোট বাটিতে আমের চাটনি ঢেলে স্বামীর দিকে ঠেলে দেয় একটু। কুসুমের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে ডান হাতের চাটনি মাখা আঙুলগুলো তারিয়ে তারিয়ে চাটে কর্তা। তারপর তার বাঁ হাত চলে যায় কোমরের কষির কাছে। পরক্ষণেই ঠং করে আওয়াজ হয়।

খসখস করে ওষুধ লিখে দেয় ডাক্তার। পিছনে লম্বা লাইন রোগীদের। কাগজ হাতে ছেলে কোলে এবার ওষুধের লাইনে দাঁড়ায় কুসুম। ছেলে এখনও ঘুমোচ্ছে নাকি অজ্ঞান বুঝতে পারে না। গাল টিপে বাচ্চাকে হাঁ করিয়ে ওষুধ খাওয়ানোর অছিলায় ছোকরা কম্পাউন্ডার অকারণেই কনুই দিয়ে খোঁচা দেয় কুসুমের পুরুষ্টু বুকে। চমকে ওর দিকে তাকাতেই সূচালো ঠোঁটে সে হালকা শিস দেয়। আঙুলের ইশারায় অশ্লীল ইঙ্গিত করে।

সিমেন্ট দিয়ে পাকা করা উঠোনে ছড়িয়ে পড়ে রোদে ঝলসানো ধাতব চাকতিগুলো।

ওটা কী এনেছিস? নিয়ে যা। জমা দিতে হবে না। পরে টাকা শুধে দিস'খন। আদুরে স্বরে বলে ওঠে সাহাবাবু। লোকটার লোভী চোখের কোণে পিচুটির মত ঝুলে আছে চ্যাটচ্যাটে কামনা। ওদিকে না তাকিয়েও তার আঁচ পায় কুসুম।

কর্তামা আগুন চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে মুখ বেঁকায়। অস্ফুটে বলে, মরণ। ঢং দেখো মিনসের।

চোখ মুছে ছেলেকে সামলিয়ে নিচু হয়ে ঝুঁকে দশ টাকার কয়েনগুলো আর পিতলের রেকাবিটা কুড়িয়ে নেয়। নিয়েই আর কোনও দিকে না তাকিয়ে ফেরার পথ ধরে সে। এবার পিছন থেকে হেঁকে ওঠে সাহাবাবু, সন্ধ্যার পর বাচ্চাটাকে কারও কাছে দিয়ে একটু আমার ঘরে আসিস তো কুসুম। গা-হাত-পাগুলো টিপে দিস ভাল করে। শরীরটা ক'দিন ধরে খুব টিসটিস করছে।

দপদপ করে ওঠে কুসুমের মাথা। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। তবুও কিচ্ছুটি না বলে সম্মতি সূচক ঘাড় হেলিয়ে হাঁটা দেয়। টের পায় খট করে হাতপাখা মাটিতে নামিয়ে রাখার আওয়াজ। কর্তামার ক্ষীণ ফোঁপানিটুকুও পিছন পিছন অনুসরণ করে ওকে। কিন্তু দাঁড়ানোর সময় নেই তার। ছেলের গা পুড়ে যাচ্ছে। আঁচলের গোড়ে টাকা ক'টা বেঁধে নিয়ে সে হনহন করে হাঁটা দেয় ডিসপেনসারির দিকে।

(২)

মঙ্গল, বুধ আর বৃহস্পতি করে আসা শহরের বুড়ো ডাক্তার ওর ছেলের নাড়ি টিপে চোখ বুজে থাকে অনেকক্ষণ। কুসুমের বুক ভয়ে ঢিবঢিব করে। আহা, কীরকম রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছে খোকার মুখ। দেহে যেন সাড় নেই। তার মধ্যেই ডাক্তারের টেবিলের পাশে দাঁড় করানো বড় স্ট্যান্ড ফ্যানের হাওয়ায় ক্লান্ত ঘর্মাক্ত শরীরটা যেন জুড়িয়ে যায় ওর। বেসামাল আঁচল খসে খসে পড়ে হাওয়ার দাপটে। নতুন আসা ছোকরা কম্পাউন্ডারটি ওষুধের মিকচার বানাতে বানাতে আড়ে আড়ে চায়। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। বাস্ রে বাস্! এই গাঁয়ের বউ নাকি? একটা চিজ মাইরি! নিজে খেতে পায় না, কোলের ছেলেটাও বাঁচবে কিনা ঠিক নেই, কিন্তু কী রসালো শরীর! কী ভরপুর চেকনাইওয়ালা ত্বক! চিকন খাঁজ, ভাঁজ! উফ্ শ্লা...!

খসখস করে ওষুধ লিখে দেয় ডাক্তার। পিছনে লম্বা লাইন রোগীদের। কাগজ হাতে ছেলে কোলে এবার ওষুধের লাইনে দাঁড়ায় কুসুম। ছেলে এখনও ঘুমোচ্ছে নাকি অজ্ঞান বুঝতে পারে না। গাল টিপে বাচ্চাকে হাঁ করিয়ে ওষুধ খাওয়ানোর অছিলায় ছোকরা কম্পাউন্ডার অকারণেই কনুই দিয়ে খোঁচা দেয় কুসুমের পুরুষ্টু বুকে। চমকে ওর দিকে তাকাতেই সূচালো ঠোঁটে সে হালকা শিস দেয়। আঙুলের ইশারায় অশ্লীল ইঙ্গিত করে। হ্যাঁ, কুসুমের গড়ন ভাল। পথেঘাটে বেরলে লোকে আড়চোখে তাকায় টাকায়। কিন্তু সরাসরি এমন কুৎসিত আচরণে এবং ছোকরার আস্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত কুসুম শুধু ওর গভীর দু'চোখ মেলে চায়। চেঁচায় না। প্রতিবাদে কিচ্ছু বলে না। শুধু চেয়ে থাকে।

বাড়ি ফিরে এসে ছেলেকে আবার দুধ দেয় কুসুম। তারপর কাঁথা চাপা দিয়ে শুইয়ে দেয় নড়বড়ে চৌকির উপরে। ওদিকে বেলা বেড়েছে যথেষ্ট। আজ উনুন ধরানো হয় নি। পেটের হাঁয়ের ভিতরে এতক্ষণ ধরে হল্লা করে করে এখন ক্লান্তিতে চিঁ চিঁ করছে খিদে নামক দস্যুটা। তবুও কেন যেন গতরখানা নাড়াতে ইচ্ছে করছে না ওর। বেশ কিছুক্ষণ ঘুমন্ত ছেলের বাহু আঁকড়ে ঝিম মেরে বসে থাকে কুসুম। তারপর খেয়াল হয় ছেলের গায়ের তাপ কমছে ধীরে ধীরে। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছে। তার মানে ওষুধটায় কাজ হচ্ছে। জ্বরটা ধরেছে। বুক নিংড়ে একটা শ্বাস বের হয় কুসুমের। ঘুমন্ত খোকার দিকে পরম মমতায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর বেরিয়ে আসে বাইরে। খিড়কি দরজা খুলে কুসুম সোজা চলে যায় বাড়ির পিছনের পুকুর পাড়ে।

পিছন দিকে ঘন বাঁশ বন। জায়গাটা নির্জন। আগাছা, বাঁশ গাছ আর জঙ্গলে ঘেরা পুকুরের শান্ত জলে সবুজ ছায়া পড়েছে। হাওয়ায় শুকনো পাতা উড়ে এসে যেন বহুমাত্রিক আলপনা আঁকছে জলের বুকে। সেই আলপনা স্থির নেই। মৃদু বাতাসে দুলছে, গড়ে উঠেই ভেঙে মিলিয়ে যাচ্ছে টুকরো টুকরো হয়ে। কোনও এককালে হয়তো এখানে বাঁধানো ঘাট ছিল। এখন সেসব ভেঙেচুরে গিয়েছে। কেউ ব্যবহার করে না। কুসুম পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে ভাঙা ঘাটের পাথরের উপরে থেবড়ে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পুকুরের কালো জলের দিকে। দেখতে

থাকে সেই আলপনার ভাঙা গড়া। অনেকটা যেন ওর জীবনের মতই। কোথাও একটানা পাখি ডাকছে। টি টি টি টি... একটানা সেই ডাক দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। হাওয়ায় সরসর শব্দ হচ্ছে বাঁশপাতায় ঘষা লেগে। মন খারাপের বেলা ধীরে ধীরে হলুদ থেকে গোলাপি, গোলাপি থেকে বেগুনি ছোপ ধরে ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। বেলা ঢলে পড়ছে গাঢ় সন্ধ্যার দিকে।

কুসুমের বুকের ভিতরে থিরথির করে অসহায়তা। সুহাস মনে হয় আজও ফিরবে না। দু'মুঠো চাল কিনে রাতে কোনওমতে ফুটিয়ে নিলেও যে চলবে না কালকের দিনটা। তখন কোথায় যাবে? কার কাছে হাত পাতবে?

আকাশ পাতাল ভাবে কুসুম। কী করবে? চলে যাবে সাহাবাবুর ডাকে সাড়া দিয়ে? লোমশ কালো কুচকুচে দুটো থাবা, লালা মাখানো ঠোঁট, ঘোলা চোখের অসভ্য আঁশটে সেই চাহনিটা মনে পড়তেই শিউরে উঠল সে। না গেলেও তো রক্ষা নেই। নিজে হাতে টাকা ক'টা কুড়িয়ে এনেছে আজ। রেহাই দেবে কর্তা? টাকাগুলো উসুল না করে ছেড়ে দেবে ওকে? ভাবতে ভাবতেই হাঁটুতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠল কুসুম।

তখনই পুকুরের জলে মাছের ঘাই মারার মত একটা শব্দ হতেই চমকে গিয়ে মুখ তুলে চাইল ও। কালো জলের ভিতরে একটা আলোড়ন উঠেছে হঠাৎ। জলের মধ্যে প্রকাণ্ড তোলপাড়ের আওয়াজ। নাহ্, এ তো মাছ নয়, অন্য কিছু। কুসুমের গা ছমছম করে উঠল ভয়ে। ওর বুকের ভিতরে যেন ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। একী! একী দেখছে ও? একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি, মেয়েমানুষের শরীরের আদল, যার গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধা জলভর্তি ভারি কলসি ঝুলছে। যেন খুব কষ্ট করে কলসির প্রান্ত ধরে, শরীরটা বেদনায় বেঁকেচুরে যাচ্ছে এমনভাবে ধীরে ধীরে সে উঠে আসছে জলের ফিকে সবুজ শরীর ছেড়ে। তার সর্বাঙ্গ ভেজা। টপটপ করে জল ঝরছে কর্দমাক্ত ভেজা কাপড় আর ছোট করে ছাঁটা চুল থেকে। জলীয় আগাছা, পানা, লতাপাতা লেপটে আছে ফিকে গোলাপি শাড়িতে। অসম্ভব সাদা ফ্যাকাসে গাত্রবর্ণ। হাতে সাদা শাঁখা আর লাল পলাটুকু অটুট মেয়েটির। কুসুম হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। যেন শ্বাস নিতে ভুলে যায় ও। স্তব্ধ হয়ে আসতে চায় ওর হৃদপিণ্ডের স্পন্দন।

মেয়েটির সিক্ত ফ্যাকাসে মরা মাছের মত চোখের নীচে ঘন কালির ছোপ। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কুসুমেরই দিকে। এতক্ষণে মেয়েমানুষটাকে চিনতে পারে ও। চিনতে পেরে অস্ফুটে বলে কুসুম, মালতি? তুই?

ভয়ে বেতসপাতার মত কাঁপছে কুসুমের শরীর। পেটের ভিতরে সরীসৃপের মোচড়। তবুও ভয়ের আগল ঠেলে ওর স্মৃতিপটে হুড়মুড় করে ভেসে আসে হারিয়ে যাওয়া প্রিয় সখীর সঙ্গে কাটানো সুমধুর মুহূর্তগুলো।

মালতি। ওর সই। কতসময় কেটেছে একসঙ্গে দুজনের। মেলায় যাবি মালতি? হ্যাঁ রে সই। চল। ব্যস, চলল দুটিতে পান মুখে দিয়ে। কিনবে না কিছু। কেনার সামর্থ নেই যে। শুধুই ঘুরে আসা। বাড়ির চার দেওয়ালের বন্ধনের বাইরে একটু মুক্তি। বাঁধের ওপারে নাকি সাধু এসেছে একটা। কপালের লেখা পড়তে পারে। যাবি? যাব তো। চল না। সঙ্গে সঙ্গে চলল দুজনে সংসারের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে। ফেরার সময় বাঁধ রাস্তার উপরে খোলা আকাশের নিচে হাসি ঠাট্টায় এ ওর গায়ে ঢলে পড়ত। নাহ্, পুরুষ অভিভাবকের দরকার নেই ওদের। দুজনই তো যথেষ্ট। গাঁয়ের লোকে পছন্দ করত না এই স্বাধীনতা। পছন্দ করত না ওদের এত মাখামাখি। সুহাস বকাঝকা করেছে। মালতি মার খেয়েছে ওর বরের কাছে। কিন্তু সেই মারের দাগ আঁচলচাপা দিয়ে ফের উঁকি দিয়েছে সখীর অন্দরে। যাবি কুসুম? পাশের গাঁয়ে শুনলাম সাপ খেলানো হচ্ছে। ইয়া বড় শঙ্খচূড়। কেমন ফণা তুলেছে। চল, যাই। দেখে আসি। রাখ তো কুটনো কোটা। এসে করিস তোর গুষ্টির কাজ।

তারপর হঠাৎ একদিন মালতি কেমন বদলে গেল। আগের মত ডাকখোঁজ নেই। কিছু জিগ্যেস

পুকুরের জলে মাছের ঘাই মারার মত একটা শব্দ হতেই চমকে গিয়ে মুখ তুলে চাইল ও। কালো জলের ভিতরে একটা আলোড়ন উঠেছে হঠাৎ। জলের মধ্যে প্রকাণ্ড তোলপাড়ের আওয়াজ। নাহ্, এ তো মাছ নয়, অন্য কিছু। কুসুমের গা ছমছম করে উঠল ভয়ে। ওর বুকের ভিতরে যেন ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। একী! একী দেখছে ও? একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি, মেয়েমানুষের শরীরের আদল, যার গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধা জলভর্তি ভারি কলসি ঝুলছে।

করলে জবাব দেওয়া নেই। একসঙ্গে মেলায় যাওয়া নেই। পান খাওয়া নেই। মালতি বসে বিড়বিড় করে একা একাই। কাছে গেলে সরে যায়। নাম ধরে ডাকলে চমকে ওঠে। তার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। দেখেই বোঝা যায় যে রাতে ঘুম হয় না একটুও। কুসুম ভেবেই পায় না কিছু। কী যেন লুকোচ্ছে মালতি ওর কাছ থেকে।

সেদিন মেঘলা ছিল বড্ড। গুমোট করেছিল খুব। একফোঁটা হাওয়া নেই। কুসুমের শরীরটা আইঢাই করছিল। সাধারণ কাজে কর্মেও হাঁফ ধরে যাচ্ছিল ওর। হঠাৎ গাঁয়ের উত্তর দিক থেকে এক সুতীব্র কোলাহল ভেসে এল দমকা হাওয়ার রূপ ধরে। চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে আগুনের মত খবরটা হু হু করে ছড়িয়ে পড়ল গাঁয়ের প্রতিটি ঘরে। স্নান করতে গিয়েও তাড়াহুড়োয় শুকনো জামা-শাড়ি, কলসি বারোয়ারি পুকুর ঘাটের পাকা শানেই ছড়িয়ে রেখে নিজের বাড়ির দরজায় এসে আছড়ে পড়েছিল কুসুম। বিবর্ণ মুখে উঠোনে বসে বিড়ি টানছিল তখন সুহাস।

কী গো? যা বলছে সকলে তা কি ঠিক? কুসুমের স্বর কাঁপছিল আতঙ্কে।

হু। সংক্ষেপ উত্তর সুহাসের।

বরটাও ক'দিন হল বাড়ি নেই ওর। আটকানো যায় না গো? দেখো না একটু মোড়লকে ধরে টরে যদি...

মুখের কথা শেষ হয় নি কুসুমের, সুহাস ঝামটে উঠল, তুই সই পাতিয়েছিস আর এটাও জানিস না যে ও মাগী আঁধার রাতে খোলা চুলে শ্মশানে ঘুরে বেড়ায় একা একা? কোনও ভয় ডর নেই। বিশুর ছেলেটার কাল থেকে খুব জ্বর। মালতিকে এর মধ্যে কবে যেন দেখা গেছে বিশুর খোকাকে কোলে তুলে নাচাতে। ছেলেটার আজ এখন তখন। কিছু একটা হয়ে গেলে কে দায়ী হবে শুনি?

শুধু এইজন্য... বেচারি মালতিকে তোমরা... ও যে নির্দোষ... ও যে সত্যিই নির্দোষ... কুসুমের স্বর ডুবে আসে কান্নায়। কোমরে, তলপেটে চাপ চাপ ব্যথা। কথা বলতে গিয়ে সে হাঁপায়।

নাআআ... চেঁচিয়ে ওঠে সুহাস, মালতি... মালতি একটা ডাইনি। মোড়ল বলেছে আজ ওর বিচার হবে বটতলায়। গাঁয়ের গণ্যমান্য লোকজন থাকবে। ওঝা আসবে রতনপুর থেকে। জলপড়া হবে। জানিস? সাহাবাবু এ-ও দেখেছে, মুক্তির সা-জোয়ান বরটা সেই যে যেদিন রাতের বেলায় কথা নেই বার্তা নেই কাটা পাঠার মত ছটফট করতে করতে পেটে হাত দিয়ে মরে গেল, সেদিন সকালে তোর মালতি ওদের বাড়ির পাছদুয়ারে উঁকিঝুঁকি মারছিল। এত বড় বড় গণ্যমান্য লোকজন সব ভুল বলছে? শুধু তুই ঠিক বলছিস?

জ্বলন্ত চোখে তাকিয়েছিল কুসুম নিজের স্বামীর দিকে। ঘৃণায় পেট মুচড়ে বমি আসছিল। মুখে হাত চাপা দিয়ে শরীর উগরে বেরতে চাওয়া বমি আটকাচ্ছিল সে।

আর শোন, এই পোয়াতি অবস্থায় তুই কিন্তু বিচার দেখতে যাবি না। গেলে তোর আর রক্ষা থাকবে না। এই বলে দিলাম। বিড়ি ফেলে হনহনিয়ে চলে গেল সুহাস। যাওয়ার আগে বাইরে থেকে দরজার শিকল টেনে দিল শক্ত হাতে।

জলপড়াতে সেদিন দোষী সাব্যস্ত হয় মালতি। শাস্তি হিসেবে এবড়োখেবড়ো ভাবে কেটে নেওয়া হয় তার কোমর অবধি ঘন চুলের রাশ। ওঝার হাতে মার খেয়ে সমস্ত শরীরে কালশিটে নিয়ে মালতি যখন ছাড়া পায় তখন সাঁঝবেলা। কুসুমের সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা হয় নি মালতির।

কুসুম শুধু ভাবত ওই অপমানের পর মালতি গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। আসলে বাঁজা মেয়েমানুষ মালতির তো কোনও পিছুটান ছিল না এখানে। তার দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামী ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করত জায়গায় জায়গায় ঘুরে। আর ধেনো খেত। বাড়িতে প্রায় থাকতই না। সেই সুযোগে অভাবী ও ক্ষুধার্ত মালতি সারাটা দিনমান হাটে বাজারে, এ বাড়ি সে বাড়ি ঘুরে বেড়াত শুধু এক মুঠো খাবারের জন্য। কুসুমের কাছেও তো এসেছে কতদিন। কুসুম কখনও ফেরায় নি ওকে। তার নিজের মুখের গ্রাসটুকুও তুলে দিয়েছে কোনও কোনও দিন। সবদিন সেটুকুও দিতে পারেনি। অভাবের সংসার তো তারও।

ওই ঘটনার পরদিন মালতি অদৃশ্য হয়ে গেল। গাঁয়ের লোকে ভেবেছিল যে আপদ গিয়েছে। কিন্তু কিন্তু...

মালতির ঠোঁট নড়ছে! কলসির ভার সে আর বইতে পারছে না। ব্যথায় যন্ত্রণায় কাঁদছে মালতি। কাঁদছে? নাকি কাঁপছে তিরতির করে? সে এখনও তাকিয়ে আছে কুসুমের দিকে। ছায়ার মত তার অবয়ব যেন ভেসে আছে পুকুরের ঠান্ডা নিস্তব্ধ জলের আয়নায়। কুসুম শুনতে পাচ্ছিল তরঙ্গে

তরঙ্গে বয়ে আসা শব্দস্রোত।

মালতি ওকে কিছু বলছে মালতি ওকে কিছু বলছে...

কুসুম এতক্ষণ যা ভাবছিল তাই ঘটেছে। সেই একই কুকর্ম গৌরাঙ্গ সাহা করেছিল মালতির সঙ্গে। মালতি এখন বলছে সেই সর্বনাশের কথা। কুড়ি, হ্যাঁ, মাত্র কুড়ি টাকার বিনিময়ে। টাকা শোধের নামে দিনের পর দিন অত্যাচার চলেছিল ওর উপর। বিকৃত লোকটার কদর্য সব কামনা বাসনা মেটাতে মেটাতে ফুরিয়ে আসছিল মালতি। তবুও শোধ হচ্ছিল না ধার। একদিন সে আর সহ্য করতে পারে নি। সমস্ত অবিচারের কাহিনি গ্রামের মানুষের কাছে ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল ও সাহাবাবুকে। তারপরই মালতি ডাইনি হয়ে গেল সমাজের চোখে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে চেনা মানবী থেকে ডাইনির শিলমোহর দাগিয়ে দেওয়া হল ওর গায়ে। ঘটনার পরদিন খুব ভোরে কুসুমদের বাড়ির পিছনের এই নির্জন পুকুরের ঘন কালো জল মালতিকে ডাকল। ডেকে নিয়ে আদর করে লুকিয়ে রাখল নিজের বুকের গহনে।

মালতির কথা শুনতে শুনতে আত্মবিস্মৃত কুসুমের পলক পড়ে না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। কলসির টান আরও বাড়ছে। অদম্য সেই টান সহ্য করতে না পেরে নুয়ে আসছে মালতির শরীর। কলসির সঙ্গে আটকে থাকা ঝাঁঝিপাতার গোছা, লতানো উদ্ভিদের ডগা নড়েচড়ে উঠল। দৈর্ঘ্যে বাড়তে বাড়তে একসময় একেবেঁকে এগিয়ে এসে ওরা আঁকড়ে ধরল মালতির শাড়ির আঁচল। আঁচলের টান বাড়ছে। ওরা যেন বলছে, ফিরে চলো এবার। যাওয়ার সময় হয়েছে। শ্যাওলা মাখা কলসির সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল শেষবারের মত। আচমকা কলসি ঝাঁপ দিল জলে। ডুবে যাচ্ছে। সেই টানে মালতি পিছিয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার আগে সে আঙুল দিয়ে দেখায় পশ্চিম দিকের পথ। ওদিকেই তো সাহাবাবুর বাড়ি। সম্মোহিতের মত উঠে দাঁড়ায় কুসুম।

মালতির গা থেকে, গলায় জড়ানো দড়িটা থেকে, কুচকুচে জলভর্তি ডুবো ডুবো কলসি থেকে বয়ে আসছে পচা পাতার, আরও না জানি কীসের দূষিত গন্ধ। সেই গন্ধে ভারি হয়ে গিয়েছে পুকুর পাড়ের বাতাস। ঘোলা বাতাস ঠেলে ঠেলে কুসুম পায়ে পায়ে এগোতে থাকে। ওর মনে হয় যেন মাটিতে নয়, ও অতল জলের তলায় পা ফেলে হাঁটছে। ধীরে ধীরে ওর শরীর স্পর্শ করে সুশীতল জল। ওর পায়ে জড়িয়ে যায় জলীয় গুল্ম লতা। পিছনে তখনও বাতাসে দোলা খায় মালতির অর্ধেক ডুবন্ত ছায়া ছায়া অবয়ব। মাথাটা পুরোপুরি ডুবে যাওয়ার আগে তীক্ষ্ণ মেয়েলি কণ্ঠের খিলখিলে অশরীরী হাসির শব্দে কেঁপে ওঠে পুকুরের অন্ধকার জলতল।

(৩)

রাত দশটা দশের গাড়িতে সুহাস ফিরে এল দু'হাত ভর্তি জিনিস নিয়ে। বড় একটা দাঁও মেরেছে এবার। সবজি বিক্রি করতে করতেই একটা কাজ পেয়ে গেল সেই হলদিবাড়ি টাউনের দিকে। ছাদ ঢালাই হবে। রাজমিস্ত্রির জোগানির কাজ। তিনদিনের হাজিরা। মোটা টাকা মজুরি। তবে পার্টি বড্ড লবড়ছবড় করছিল। কাজ জলদি সারতে হবে। একটা দিনও দেরি করবার উপায় নেই। তাই আর বাড়ি ফেরার যো ছিল না। ফিরতি পথে স্টেশন বাজার থেকে ছেলের জন্য পেয়ারা কিনেছে। সস্তায় কাঠের খেলনা কিনেছে। কিনেছে কুসমির জন্য রেশমি শাড়ি। সঙ্গে কাচের চুড়ি রঙ মিলিয়ে। কিনেছে আদা পেঁয়াজ, সর্ষের তেল আর বড় একটা রুই মাছ। কুসুমের হাতের রগরগে ঝাল যা খুলবে তা আর বলার নেই। হাতের জিনিসগুলো উঠোনে নামাতে নামাতে সে হাঁক দিল বৌয়ের উদ্দেশে।

কুসুমের বদলে খোকা এল হামা দিতে দিতে। ওকে কোলে তুলে নিতে নিতে দেখল আলোটা হাতে নিয়ে পিছন পিছন কুসুম আসছে। কালিঝুলি মাখা হ্যারিকেনের আলো তার মুখে এসে পড়ে নানা কাটাকুটি রেখার ছায়া ফেলেছে সেখানে।

হাতের তালুর মত চেনা ও ঘেঁটে ঘেঁটে পুরনো করে ফেলা বৌকে আজ কেমন অচেনা লাগে সুহাসের। মুখে কথা নেই। ঝাঁজ নেই। কোনও খবর না দিয়ে বাড়ি আসে নি বলে শাপশাপান্ত, রাগারাগি, চোখের জল, কিচ্ছু নেই। সব গেল কোথায়? এ যেন ভ্যাদভ্যাদে পান্তা ভাত। স্থির চোখে একবার সুহাসের দিকে তাকিয়ে হ্যারিকেনটা দাওয়ার উপরে নামিয়ে রেখে ঝুঁকে পড়ে নির্লিপ্তভাবে জিনিসগুলো তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যাচ্ছে কুসুম। তার মাথার চুল, পরনের কাপড়, গা সব সপসপে ভেজা। জল ঝরছে।

আজও মেঘলা। সকাল থেকে বৃষ্টি না হলেও মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। কুসুমকে খুঁজে পাওয়া গেল বাড়ির পিছনের অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই পুকুরপাড় থেকে। তার দু'চোখ ভাষাহীন, রক্তবর্ণ লাল। মাথার চুল খোলা। পাগলির মত এলোঝেলো অসংবৃত শাড়ি পরনে। যেন কোনও এক ঘোরের মধ্যে আছে সে। তার ভয়ংকরী চোখের চাহনি দেখলেই জোয়ান মদ্দদের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁত করে ওঠে।

এত রাতে স্নান করলি কেন? নোংরা মাড়িয়েছিলি? বৌকে জিগ্যেস করে কোনও উত্তর পায় না সুহাস। হঠাৎ নাকে একটা পচা বাস আসতে শঙ্কিত হয়ে সে জিগ্যেস করে, হ্যাঁ রে কুসমি? মাছটা ভাল তো? এতগুলো দাম নিয়ে ঠকায় নি তো শালার পুত?

তারপরই অন্য কী একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে ব্যস্তভাবে বলে ওঠে, ওদিকে খবর শুনেছিস? ও পাড়ার সাহাবাবু সন্ধ্যায় দোকান থেকে ফিরে সবে একটু শুয়েছে। একটু পরে একটা বিকট চিৎকার শুনে লোকজন দৌড়ে গিয়ে দেখে বিছানাতেই হার্টফেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই খতম। চোখদুটো একেবারে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। আসার সময় দেখলাম বাড়ি লোকে লোকারণ্য। ডাক্তার বদ্যি, হইচই, দৌড় ঝাঁপ। কিন্তু কী লাভ? পাখি তো খাঁচা ছেড়ে উড়েই গ্যাছে কখন।

খোকাকে কোলে তুলে নাচাতে নাচাতে এবার সুহাস রান্নাঘরের দরজায় পা রাখে। বউটা আজ বড্ড বেশি চুপচাপ না? এতবড় খবরটায় কোনও রা কাটল না। শরীরটরির ঠিক আছে তো? কথাটা তোলার আগেই আবার একটা পচা গন্ধ এসে ঘুলিয়ে দেয় ওর মগজ।

কোথা থেকে আসছে বলতো গন্ধটা? নাক কুঁচকে সে জিগ্যেস করে কুসুমকে।

ও কিছু না। দুপুরে পুকুরপাড়ে বাসন মাজতে গিয়ে পায়ে একটা কাঁটা ফুটছিল, ঘা হয়ে গ্যাছে। অত ভেব না তো। উদাসীনভাবে বলে কুসুম। সুহাসের দিকে ফিরেও তাকায় না। ও এখন উবু হয়ে বসে উনুন ধরাতে ব্যস্ত। পায়ের কাছেই মাছ কাটার আঁশ বটি কাত করে রাখা। বড় মাছটা গামলার জলে কচলে কচলে ধুয়েছে।

ইস, দেখি দেখি কী হয়েছে। সুহাস ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কাল কিন্তু অবশ্যই ডিসপেনসারিতে গিয়ে একবার ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে নিস।

উনুন পুরোপুরি ধরে নি। শাড়ির গোছ কিছুটা সরিয়ে পায়ের ঘা'টা সুহাসকে দেখায় কুসুম অল্প সময়ের জন্য। তারপরই ঢেকে ফেলে পায়ের পাতা। অন্ধকারে সুহাসের তেমন একটা ঠাহর হয় না। কিছুটা আলো এসে পড়েছে কুসুমের মুখের বাঁ পাশে, চুলের রেখায়। চোখের মণি জ্বলজ্বল করছে ওর আগুনের মত। কুসুমের গা ঘিরে পাক খাচ্ছে পচা পচা বদখত গন্ধটা। ভীষণ অচেনা লাগছে আজ বৌটাকে। অকারণেই সুহাসের বুকের ভিতরটা কেমন ধক করে ওঠে।

ওদিকে ছেলে কখন যেন হ্যাচড়প্যাচড় করে তার কোল থেকে নেমে উঠোনের দিকে গিয়েছে। সুহাস তাড়াতাড়ি তার পিছু নেয়। খোলা জায়গা। সাপ খোপের ভয় আছে। তখনই তার কানে আসে পিছন দিক থেকে কুসুমের অস্ফুটে বলা কথাগুলো।

হ্যাঁ, ভাবছি কালই যাব ডিসপেনসারি। ওই যে বুড়া ডাক্তারের সঙ্গে হাতে হাতে ওষুধ বানায় না একটা ছোকরা? ওকেও তো ওর ধারটুকু শোধ করতে হবে। কী বলও?

ক'দিন আগেই পূর্ণিমা ছিল। আকাশে রুপালি রঙের বিশাল চাঁদ উঠেছে। দামাল হাওয়া ছেড়েছে একটা। মেঘেরা এক একবার ঢেকে দিচ্ছে চাঁদ। পরক্ষণেই মেঘ সরে যাচ্ছে। তখন যেন আলোটা আরও বেশি তীব্র। ছায়াময় উঠোনে গাছগাছালির জমাট ডালপালা ভেদ করে আসা সরু তীক্ষ্ণ আলোর রেখাগুলো একে অপরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে মাকড়সার জালের মত। সে দিকে তাকিয়ে সুহাস এরপর মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে কুসুমের খিলখিলে হাসি। তার সারা গায়ে অকারণেই কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে ছুটে গিয়ে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে।

(৪)

অমাবস্যার রাতে লক্ষ্মীপুর গাঁয়ে ঘটে গেল আরও এক অশৈলী কাণ্ড। তাতে নড়েচড়ে উঠল গাঁয়ের মাতব্বরেরা। অমঙ্গলের ভয়ে কেঁপে উঠল সব গৃহবধূ আর কুমারী মেয়ে-ঝি। যেখানে যত জোয়ান ছেলে, বিবাহিত পুরুষ রয়েছে সকলকে তাদের বাড়ির লোকেরা চোখে হারাতে লাগল বারবার। কারণ আর কিছুই নয়। এই গাঁ অভিশপ্ত হয়েছে। গাঁয়ে অলক্ষ্মীর ছায়া পড়েছে। একটা ডাইনি ধরা পড়েও পালিয়েছিল। বছরটুকু গড়াল না সে ঘটনার,

পুরুষখাকী আরও একটা ডাইনির আবির্ভাব ঘটেছে। তবে একে আর ছাড়া হবে না। পুড়িয়ে মারতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আগুনের মত বিশুদ্ধ আর কী আছে? পুড়িয়ে পাপ তাড়াতে হবে। নয়তো কারোর রক্ষা নেই। আরও কয়েকটা দিন পর গাঁয়ের মাথারা একজোট হয়ে হাজির হল মোড়লের কাছে। বিচার চাই।

ঘটনাটা আগে জানা দরকার। কী হয়েছে বলও তোমরা। মোড়ল মাথা নাড়ল গম্ভীর গলায়।

খুব ভয়ঙ্কর ঘটনা। ওই যে কয়েকটা গ্রাম ছাড়িয়ে রসুলপুর থেকে এ গাঁয়ে আসে কমপাউন্ডার ছেলেটা, সে একটু সন্ধ্যা করেই সুপুরি বনের পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল। টর্চের আলোয় রাস্তা দেখতে অসুবিধে নেই। সরু মাটির রাস্তা, বাঁ-ধারে ঘন সুপুরি বন। ডানদিকে পুরনো জলা। বিকেলের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার দরুন জলার ধারের রাস্তায় কাদা ছিল। এক হাতে টর্চ ধরে সাইকেলটা হাঁটিয়ে নিয়ে সে ওই জায়গাটা খুব ধীরেই পেরচ্ছিল। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যেই অনেকক্ষণ জলে কাদায় ভিজে পাড়ার ছেলেরা ফুটবল পিটিয়ে তখন ফিরছিল মাঠ থেকে। সেই সময় ওরা কমপাউন্ডারবাবুকে দেখেছে। ওকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর একটা ভয়ানক আর্তনাদ শোনা যায় পুরুষ কণ্ঠের। তারপরই জলে কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ। ওরা দৌড়ে গিয়ে দেশলাইয়ের আলোতে দেখে যে সাইকেলসুদ্ধ কমপাউন্ডার দাদার রক্তশূন্য দেহ জলার পাঁকে পড়ে আছে হাত পা চিতিয়ে। তার দু চোখ বিস্ফারিত। মুখ হাঁ। সে দেহে প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই। টর্চটাও ভেঙে চুরমার। চারিদিক তখন শুনশান। শুধু অন্ধকারে ডুবে ছিল সুপুরি বন আর বনের গভীর থেকে একটা অদ্ভুত গায়ে কাঁটা দেওয়া শিসের শব্দ জেগে উঠে ফিকে হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল দূরে। একটু পরে দলবল জুটিয়ে লণ্ঠন হ্যারিকেন নিয়ে সুপুরি বনে ঢুকেও শব্দটার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় নি।

সব শুনে আঁতকে উঠল মোড়ল। কেঁপে উঠল উপস্থিত সমবেত নারী পুরুষ। এবার কার শরীরে শয়তানি এসে ভর করল? কে সে? কে?

ভিড়ের মধ্য থেকে একটি গলা স্বর ওঠাল। কে আবার? মালতির সই। সুহাসের বউ কুসুম। কুসুম ছাড়া কেউ নয়। খবর আছে যেদিন সাহাবাবু দুম করে মরে গেল ভিরমি খেয়ে, ওই কুসুম হারামজাদি গিয়েছিল সাহাবাবুর বাড়িতে টাকা চাইতে। হয়ত টাকা না পেয়ে তুকতাক করেছে। নজর দিয়ে বান মেরেছে কর্তাকে। না বিশ্বাস হয় তো কর্তামাকে গিয়ে জিগ্যেস করও গে। ওদের বাড়ির সকলেই সাক্ষী আছে।

আরও একজন মাথা হেলাল সমর্থনের ভঙ্গিতে। ঠিক ঠিক। কুসুম ক'দিন ধরেই বেশি বেশি আনাগোনা করছিল না ডিসপেনসারিতে? বেচারা জোয়ান ছেলেটার রক্ত চুষে খেয়েছে ডাইনি।

সময়ের সঙ্গে জমাট হয় মন্ত্রণা। ঘন ঘন আন্দোলিত হয় ষড়যন্ত্রকারীদের মাথা। অভাবতাড়িত এবং অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা বুভুক্ষু লোকগুলির শোণিতে দ্রুত লয়ে বয়ে যায় ঘৃণ্য খুনি আদিম প্রবৃত্তি। দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতায় ঝিমিয়ে পড়া প্রাণে নতুন পুলক জাগে। নিষ্ঠুর মজা দেখার লালসায় জিভ লকলক করে নররাক্ষসদের। তাদের ক্রূর চোখ থেকে বিষ উৎসারিত হয়। গোটা শরীরে কাঁপুনি জাগে নিধনের খেলায় মেতে ওঠার উত্তেজনায়।

বিচার হবে। ডাকও কুসুমের বরকে। কোথায় সুহাস? কোথায় সে? গর্জন করে ওঠে মোড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সুহাসকে ধরে আনতে ছুটে যায় উৎসাহী বহু মানুষ।

বিগত কিছুদিন থেকেই বউটাকে অচেনা লাগছে সুহাসের। সারারাত সে ছটফট করেছে। কোনও এক অজানা আশঙ্কা ঘুমোতে দেয় নি ওকে একফোঁটা। ঘরের দাওয়ায় বসে সে শুকনো মুখে বিড়ি টানছিল। একগাদা লোক হুড়মুড় করে ওর বাড়ির দালানে এসে দাঁড়াতে সে বাস্তবিকই দারুণ ঘাবড়ে যায়।

কুসুমের খোঁজ পড়তেই সে ভ্যাবলার মত তাকায়। ছেলে ভিতরের ঘরে ঘুমোচ্ছে চৌকির উপরে। কিন্তু সকালের পর সে আর কুসুমকে চোখে দেখেনি। গেল কোথায় সে?

আজও মেঘলা। সকাল থেকে বৃষ্টি না হলেও মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। কুসুমকে খুঁজে পাওয়া গেল বাড়ির পিছনের অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই পুকুরপাড় থেকে। তার দু'চোখ ভাষাহীন, রক্তবর্ণ লাল। মাথার

সময়ের সঙ্গে জমাট হয় মন্ত্রণা। ঘন ঘন আন্দোলিত হয় ষড়যন্ত্রকারীদের মাথা। অভাবতাড়িত এবং অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা বুভুক্ষু লোকগুলির শোণিতে দ্রুত লয়ে বয়ে যায় ঘৃণ্য খুনি আদিম প্রবৃত্তি। দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতায় ঝিমিয়ে পড়া প্রাণে নতুন পুলক জাগে। নিষ্ঠুর মজা দেখার লালসায় জিভ লকলক করে নররাক্ষসদের। তাদের ক্রূর চোখ থেকে বিষ উৎসারিত হয়। গোটা শরীরে কাঁপুনি জাগে নিধনের খেলায় মেতে ওঠার উত্তেজনায়।

চুল খোলা। পাগলির মত এলোঝেলো অসংবৃত শাড়ি পরনে। যেন কোনও এক ঘোরের মধ্যে আছে সে। তার ভয়ংকরী চোখের চাহনি দেখলেই জোয়ান মদ্দদের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁত করে ওঠে। অত লোকজন দেখেই সে হামাগুড়ি দিয়ে লুকিয়ে পড়তে চাইছিল বাঁশ বনের ভিতরে। কিন্তু ততক্ষণে সাহসী জনতা তার চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল বটতলার দিকে। পিছন পিছন সুহাস। সে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।

বিচার হবে। বিচার হবে। ডাইনির বিচার।

বিচার দেখতে আশেপাশের ক্রোশ ক্রোশ দূরের গ্রাম থেকে লোকজন ঝেঁটিয়ে আসছে। জামবাটি ভর্তি করে ভাত নিয়ে এসেছে মেয়ে বউ। ঘরের কাজ ফেলে কোলে ঘুমন্ত খোকা নিয়ে পড়িমরি করে ছুটে আসছে মায়েরা। গাঁয়ের গণ্যমান্য মাথাগুলির সকলেই এসে জুটেছে। কুসুমকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে খুঁটির সঙ্গে। এতক্ষণ বিকৃত খোনা স্বরে সে চিৎকার করেছে। ছটফট করেছে আসুরিক শক্তিতে। সমাজের অনাচারী লোকগুলোর প্রতি অশ্লীল গালাগালির খই ফুটেছে তার মুখে। এখন সে নেতিয়ে পড়েছে। আনত মাথা। ঘাড়টা ঝুঁকে আছে বুকের কাছে। সুহাস পুরোটা সময় দূর থেকে জরিপ করছিল ঘটনাটা। ভয়ে বারবার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল তার। ডাইনি! একটা মানুষের রূপ ধরা ডাকিনীর সঙ্গে এতদিন ঘর করেছে সে! কিচ্ছু টের পায় নি!

কে যেন জ্যারিকেন করে কিছুটা তরল ঢেলে দিল কুসুমের গায়ে। কেরোসিনের কটু গন্ধে ভরে উঠছে জায়গাটা। এইবার সেই পবিত্র সময় এসেছে। ডাইনি নিধনের সময়।

হঠাৎ কুসুম চোখ মেলে তাকাল। আর সরাসরি তাকাল সুহাসের দিকে। আশ্চর্য! সে চোখ এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কুসুমের ঠোঁটের কোণায় মৃদু নরম হাসি। সেই যে ছাদনাতলায় শুভদৃষ্টির সময় যেমন হেসেছিল সে, সেই কিশোরীর লজ্জানত হাসির আভা এখন কুসুমের ঠোঁটে।

সুহাসের বুকের ভিতরটা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে অস্থিরতায়। কানাঘুষো সে শুনতে পেয়েছিল যে ওই কম্পাউন্ডার ছোকরাকে নাকি কোনও বিষাক্ত সাপে কেটেছে। যার এক ছোবলেই মরণ। শহরে লাশ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে কাটাছেঁড়া হয়ে এই খবর এসেছে। তবে কি...? তবে কি এরা সবাই ভুল? সুহাসের চঞ্চল চোখের তারা কেঁপে ওঠে। সব ভুলে সে ছুটে যায় কুসুমের দিকে।

তা দেখে হায় হায় করে ওঠে সবাই। যাস না, ওরে যাস না। এসব এদের ছলাকলা। তোকে বশ করতে চায়...

তবুও সুহাস কুসুমের কাছে গিয়ে খুলে দেয় ওর দড়ির বাঁধন। বৌয়ের কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত। একটানা বলতে থাকে সুহাস, একবার বল যে তুই ডাইনি না। একবার আমাকে বল...

কুসুম যেন বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে তাকায় সুহাসের দিকে। ওর হতবাক সরল দৃষ্টি ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে আসে। নির্মম থেকে নিষ্ঠুর। তারপর পৈশাচিক। পিশাচীনি এবার প্রবল আক্রোশে এক ধাক্কায় মাটিতে ছুঁড়ে দেয় সুহাসকে। তারপর তীব্র গর্জন করে লাল চোখে সরোষে দু'পা এগিয়ে যায় জনতার দিকে। সে দৃষ্টির সামনে শরীরের রক্ত শুকিয়ে আসতে চায়। স্তব্ধ হয়ে যায় হৃদপিণ্ডের চলন।

লোকজন উন্মত্ত হয়ে যায় আতঙ্কে। কয়েকজন দু'হাতে চোখ ঢেকে পালাতে গিয়ে এ ওর ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। প্রবল আর্তনাদ করে মাটিতে অচেতন হয়েও পড়ে যায় কয়েকজন। তাই দেখে হি হি করে রক্ত জল করা হাসি হেসে ওঠে কুসুম। তারপর এক অলৌকিক দৃশ্যের সম্মুখীন হয় লক্ষ্মীপুর গাঁয়ের আপামর বাচ্চা থেকে বুড়ো। এলোচুলে লাল শাড়ির আঁচল উড়িয়ে ঝড়ের গতিতে বাতাসে উড়ে যায় কুসুম। চোখের নিমেষে সে মিলিয়ে যায় গাঁ ছাড়িয়ে ওই নদী পেরিয়ে দূরে শ্মশানের দিকে। আশ্রয় নেয় শ্মশানের ধারের ঘন জঙ্গলের গহীন আঁধারে।

সেই অন্ধকারে ডাইনি বসে থাকে উবু হয়ে। চুপচাপ ওত পেতে বসে থাকে সে। অপেক্ষা করে পরবর্তী অমাবস্যার রাতের। আর প্রতি অমাবস্যার রাতে লক্ষ্মীপুর গাঁয়ে জেগে ওঠে এক অশরীরী শিসের শব্দ। ডাইনি আসে তার শিকারের খোঁজে। রক্তের খোঁজে। বিকৃত পুরুষের শিরায় বয়ে চলা কটু রক্তের।

(শিরোনাম অলংকরণ— বিপুল শংকর বসু)

মায়াবতী জন্মান্তরেও অপরিবর্তিত এক স্ত্রী চরিত্র

শাঁওলি দে

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর প্রেমকাহিনি সর্বজনবিদিত। কৃষ্ণ আর রুক্মিণীর বিবাহের ফলে জন্ম হয় তাঁদের সন্তান প্রদ্যুম্নের। কিন্তু এই বিবাহের অনেক অনেক আগে স্বর্গে রচিত হয়েছিল আরেক কাহিনি, যার ফলস্বরূপ প্রদ্যুম্নের জন্ম হয়।

রাক্ষসরাজ তাড়কাসুর স্বর্গজুড়ে তাণ্ডব শুরু করলে সকল দেবদেবী শিবের শরণাপন্ন হন। কারণ শিবই পারেন একমাত্র তাঁকে হত্যা করতে। কিন্তু স্ত্রী সতীর মৃত্যুতে শিব তখন শোকাতুর। সেই সময় শিব যাতে আবার প্রেমে পড়েন, দেবতাদের সেই নির্দেশমতো কামদেব তাঁর স্ত্রী রতিকে নিয়ে যান কৈলাশ পর্বতে। সেখানে শিবের প্রতি কামদেব কামবাণ নিক্ষেপ করলে ক্রোধে লেলিহান শিব তাঁর তৃতীয় নয়ন দিয়ে ভস্মীভূত করেন কামদেবকে। কামদেব মারা গেলে মনোকষ্টে তাঁর স্ত্রী রতিও আত্মাহুতি দেন। কামদেব তখন নারায়ণের কাছে গিয়ে প্রাণভিক্ষা করলে তাঁর আশীর্বাদে কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর পুত্র হিসেবে তাঁর আবার জন্ম হয়। অন্যদিকে স্ত্রী রতিও পার্বতীর বরদানে মায়াবতী নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, যদিও তা প্রদ্যুম্নের জন্মের প্রায় সতের বছর আগের কথা।

অসুররাজ সম্বর আর কামদেবের মধ্যে ছিল চিরবৈরিতা। সম্বর অনেক নারীর জীবন দুর্বিষহ করেছিলেন কামদেবের কামশরের জন্যই। নারীদের সম্মান করতেন না বলে কামদেবও সম্বরকে পছন্দ করতেন না। তাই সম্বর যখন খবর পেলেন কামদেব মারা গিয়েছেন, স্বস্তি পেলেন তিনি। কিন্তু পরজন্মে কৃষ্ণ-রুক্মিণীর পুত্র হিসেবে যে তাঁর আবার জন্ম হয়েছে এটা শুনে তিনি ছোট্ট প্রদ্যুম্নকে চুরি করে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিলেন। বিরাট এক মাছ সেই শিশুকে গ্রাস করল। মাছটি জেলেরা ধরে বিক্রি করে এল সম্বররাজের রাজপ্রাসাদেই। সেই প্রাসাদেই কামপত্নী রতি আবার জন্মগ্রহণ করে পরিচারিকার কাজ করতেন। এই জন্মে তাঁর নাম হয়েছিল মায়াবতী।

ঘটনাক্রমে মায়াবতীই জেলেদের বিক্রি করা বড় মাছটি কুটতে বসলে মাছের ভেতর থেকে একটি ছোট্ট শিশু বের হয়। শিশুটিকে দেখেই অদ্ভুত এক ভাবের সৃষ্টি হয় মায়াবতীর মনে। অথচ তাঁর কারণও মায়াবতী খুঁজে বের করতে পারেন না। লজ্জা পেলেন তিনি, কিন্তু মন থেকে সেই ভাব দূর করতেও পারলেন না। প্রদ্যুম্নরূপী ছোট্ট কামদেবের স্পর্শে চিরযৌবন প্রাপ্তা হলেন মায়াবতী, তাঁর বয়স বাড়ল না। এদিকে ছোট শিশুটি ধীরে ধীরে বড় হতে

লাগল মায়াবতীর চোখের সামনেই। যতই ওঁকে দেখছিলেন মায়াবতী কিছুতেই পুত্র হিসেবে লালন পালন করতে পারছিলেন না। অবাক মায়াবতী তখন তিনি ঋষিবর নারদের শরণাপন্ন হলেন।

নারদ এসে সব ঘটনা বিস্তারিত জানালেন মায়াবতীকে। ছোট্ট প্রদ্যুম্ন যে আসলে মায়াবতীর পূর্ব জন্মের স্বামী কামদেব এটা জেনে যারপরনাই খুশি হলেন মায়াবতী। নারদ বোঝালেন, এই শিশুটি তাঁর স্বামীই, তাই এঁকে দেখে তাঁর যে মনের বৈকল্য হয়েছে তাতে কোনও পাপ নেই। সেই সঙ্গে তিনি মায়াবতীকে সাবধানও করলেন যে এই সম্বরপুরী প্রদ্যুম্নের শত্রুপুরী, মায়াবতীরূপী স্ত্রী রতির সেবা পাওয়ার জন্যই প্রদ্যুম্ন এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, তাই তাঁর উচিত সব ভুলে স্বামীর সেবা করা।

মায়াবতী এরপর খুশি হয়ে স্বামীর সেবা করতে থাকেন। ধীরে ধীরে বড় হয় সে। দিব্যযৌবন লাভ করায় তাঁরও বয়স বাড়ে না। স্বামীকে একদিন গভীরভাবে আলিঙ্গন করে সে। চমকে ওঠেন প্রদ্যুম্ন। তিনি যেহেতু কিছুই জানেন না, তাই তিরস্কার করেন মায়াবতীকে। যার কাছে ছোটবেলা থেকে প্রদ্যুম্ন লালিত পালিত, সেই মাতৃরূপী মায়াবতীর একী ব্যবহার?

মায়াবতী তখন আবার দেবঋষি নারদের শরণাপন্ন হলেন। নারদ এসে প্রদ্যুম্নকে সব বোঝালে শান্ত হন তিনি। ভুল ভাঙে তাঁর। এও জানতে পারেন যে তাঁর হাতেই হবে সম্বরের মৃত্যু। তাই সম্বরকে হত্যা করে স্ত্রী মায়াবতীকে নিয়ে আবার স্বর্গে পাড়ি দেন কামদেব। আর এভাবেই কামদেব ও রতির প্রেম যুগ যুগ ধরে অমরকাহিনি হয়ে ওঠে।

পুরানের নারী হিসেবে রতি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তিনি প্রসূতি ও দক্ষের কন্যা। আকাঙ্ক্ষা ও প্রেমের দেবী রতি হাতে চক্র ও পদ্ম ধারণ করেন। রতির মায়াবতী হয়ে জন্মলাভের কাহিনি এক এক পুরাণে এক এক রকম। কামদেবের সঙ্গী হিসেবে তাঁর মূর্তি বহু মন্দির, স্থাপত্যের গায়ে দেখা যায়। পরমা সুন্দরী রতির জন্ম দেবতাদের আকৃষ্ট করার জন্যই। তবে তিনি নিজে কামদেবের প্রেমে পাগল। শিবের কাছে তাঁর তপস্যার ফলেই কামদেবের আবার জন্ম হয় বলে অনেকে মনে করেন। নিজে কামনা, বাসনা দেবী হলেও কখনও কামদেব ছাড়া অন্য পুরুষের কথা ভাবেন নি। এমনকি সম্বরাসুরের প্রাসাদে বছরের পর থাকার পরও সম্বর তাঁকে নিজের করে নিতে পারে নি।

এই রতিই যখন নতুন জন্ম পেয়ে মায়াবতী হন তখনও প্রদ্যুম্নের মতো গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি একাধারে পালিতা মাতা হিসেবে প্রদ্যুম্নকে যেমন বড় করেন, তেমনই পরবর্তীতে স্ত্রী হিসেবেও তাঁর কর্তব্য ভোলেন নি। পুরানে এমন নারী বিরল।

কবির কলমে

রাত্রিকথা

সুমন মল্লিক

প্রতিটি রাত যেন এক-একটা ভেঙে পড়া মেঘ, আবার কখনও কখনও তৃপ্তিবিসারী জলকামান। সুস্থ ও অসুস্থতার মাঝে যে তুলসীমঞ্চ, তাতে রাতের মাঝামাঝি কোনও একটা সময়েই প্রাণ ভরে জল ঢালতে হয়। হেমন্তবাতাস আর চাঁদের হাল্কা আলো মেখে নিয়ে ভাবনাবৃত্তে খাঁচা খুলে ওড়াতে হয় স্মৃতির কবুতর। কিছু জিজ্ঞাসা ভেসে আসে, কিছু উত্তর ধরা দিয়েও উধাও হয়ে যায়। এই যে আকস্মিকের খেলা, এই যে জড় হতে হতে নতুন হিল্লোলে মেতে ওঠে মন, অথচ তার গভীরে গাঁথা আছে আসক্ত মানুষের দীক্ষিত বেদনা, এর সবটুকু ধার ও ভার বহন করে চলেছে প্রতিটি রাত।

ভার্জিনিয়া উল্ফ লিখেছিলেন, "Melancholy were the sounds on a winter's night." শীতের রাতে ঠিক শুনতে পাওয়া যায় কান্নাভরা বাঁশির সুর। আঙুল কেঁপে ওঠে, তারপর চোখ, মন থেকে শুরু করে একে একে প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বাঁধভাঙা নদীর মতো ধেয়ে আসে ভাল ও মন্দ মেশানো কিছু দেখা-অদেখার সারাৎসার, তার পেছন পেছন হৃদয়ের ছাইভস্ম। আঁধারের সামনে শ্রদ্ধাবনত হতে হয়। রাতের আঁধারই প্রতিটা নিঃস্ব মানুষের মন্দির।

সারাদিন যন্ত্রের মত এই যাপনে 'নিজের অস্তিত্ব কেঁপে ওঠে।' দিনের শেষে গৃহগরাদও হয়ে ওঠে দিব্য সুকুনে পরিপূর্ণ এক স্বর্গের উদ্যান। জিরো ওয়াট আলোয় ফুটে ওঠে একে একে ইচ্ছের কোকনদ, সুস্নিগ্ধ আত্মখনন, দর্শনের স্বরাজ, সৃজনের রংধনু। রাত জানে, এরপর কীভাবে ঘুম উধাও হয়, অবধারিতভাবে পৃথিবীর দিকে তাক করা দৃষ্টি নিজের দিকে ঘুরে যায়। কোন 'ম্যাজাই' আসে না ঘরে, আসে না মীরা কিংবা মিরাকল ঘটিয়ে দেবার মতো কোন নীলসুখ। অসুখে অ-সুখ আসে না, প্রীতি ও কুসুমে ভরে ওঠে দুর্ভাগ্যপীড়িত সময়ের মশান। নিঃসঙ্গতাই যার সঙ্গী, তার আবার কীসের ভয়, কীসের ভ্রান্তি। শুধু সস্নেহে খেলা আর লেখা, লেখা আর খেলায় ডুবে থাকা। একদিকে কনফেশনের গোপন বাক্স খুলে আত্মশুদ্ধির তাবিজ পড়ে ফেলা, অন্যদিকে চেতন ও অবচেতনের মিশ্র ও মেদুর এক স্তরে যাপনকে উদযাপন করা —রাতের গহীন, নির্মল ও নীরব বাতাবরণেই একমাত্র সম্ভব এই নিজস্ব জায়গিরদারি।

প্রেমের উথালপাথালকে আরও নাড়িয়ে দেয় নিশুতির নিষিক্ত স্ফুরণ। প্রিয় মুখ একটা মিছরির চাবুকের মতো আছড়ে পড়ে। দিলখুশ ছোঁয়া থেকে

জন্ম নেয় অগণিত পরশাবগাহন। এরকম অবস্থা কোনও স্বঘোষিত জরুরি অবস্থা না-হলেও, মাথার ভেতর ঘুরতে শুরু করে স্টেশন চত্বরের কোনও এক সোনালি সন্ধে, কুয়াশার ভেতর থেকে ছুটে আসা সকালের প্রথম বাসের একটা উইনডো সিট থেকে পাহাড়ি ঝোরার মতো হাসি, তিস্তার বালুকাবেলায় অপরাহ্নের রাঙা লজ্জা... আরও, আরও কত কী। স্মৃতির ঘুনপোকা রাতেই অতিসক্রিয় হয়। কুরে কুরে তুলে আনে বিশেষ-বিশেষ সেইসব শেষ হওয়া এক-একটা মনোলোভা সুবর্ণরেণু। কাহাতক পালানো যায় এই অদম্য ঘূর্ণি থেকে। কবি ও কাঙাল "অভিভূত হয়ে আছে —চেয়ে দেখে —বেদনার নিজের নিয়ম।"

কোনও কোনও রাত আবার মৃত্যুর মঞ্চ প্রস্তুত করে রাখে —একটা ভাবনার মৃত্যু, একটা বিশ্বাসের মৃত্যু, একটা দীর্ঘ সংগ্রামের মৃত্যু, আবার কখনও মনের গোপন ডেরায় লুকিয়ে বেঁচে থাকা একটা আসক্তির মৃত্যু। এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বলেছেন, "মৃত্যুর মত ব্যক্তিগত আর কোনও কিছু নেই।" কী চরম এক সত্যি! এমন এক সত্যির কাছে এসে বিষাদ-আনন্দ, প্রেম-বিচ্ছেদ, চাওয়া-পাওয়া, জয়-পরাজয়, মুক্তি-শৃঙ্খল সব, সবকিছু শূন্যে বিলীন হয়ে যায়।

বর্ষার রাতগুলি সাগরে ভাসমান হিমবাহের মতো —এমনিতে স্থির এবং কোনওপ্রকার উত্তেজনার উদ্রেক ঘটায় না, কিন্তু মুখোমুখি হলে ভেঙে চৌচির হওয়াই ভবিতব্য। তাই বর্ষার রাতেই বোধহয় শব্দসৃজন বাঁধ ভাঙে। একইসাথে বৃষ্টিরাত সৃষ্টিরাত হয়ে আলাদারকম একটা আমেজ দিয়ে যায়। রূপান্তর ঘটে অন্তর্দর্শনে, স্থানান্তরিত হয় মনের খেয়া। তবুও রাতের মুষলধারা বৃষ্টির ঝমঝম শব্দের সাথে দুলতে দুলতে সময় ঠিক বিরল এক স্মৃতির মহাজাগতিক ফলকে গিয়ে ঝুলে থাকে।

জ্যোৎস্না-রাতের অপার ও অনন্য রূপের সামনে দাঁড়ালে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তনমন। পূর্ণিমায় চাঁদ গলে নেমে আসা আলোর প্লাবনে ভেসে যায় যাবতীয় 'বিষাদ যোগ', পূর্ণ হয়ে ওঠে পৃথিবী অলৌকিক প্রতিভাসে। রাতপাখির গান, জোনাকিদের আলোর মেলা, দূর থেকে ভেসে আসা বাউলের সুর —এসব মিলেমিশে রাতের জ্যোৎস্না উপভোগ করাকে আরও আকণ্ঠ করে তোলে। ক্লান্তি উড়ে যায়, উড়ে আসে আবহমান সৃষ্টিপ্রপঞ্চ । জনাকীর্ণ শহর কিংবা নিরালা গ্রাম জানে না এইসব, জানে শুধু ওই অপরূপ রাত আর রাতের মাঝে ঘুম হারিয়ে পাথর হয়ে থাকা কেউ কেউ।

হ্যাঁ, একমাত্র রাতই পারে মনের রাতে আলো জ্বেলে দিতে। না-হওয়া চাকরির ওপর সাদা কাফন চড়িয়ে দেয়, অভাবেও স্বভাব নষ্ট না-হওয়াকে একটি তারা উপহার দেয়, মায়ের অসুখী মুখের ওপর এক মুহূর্তের একটা হাসি এঁকে দেয়, বাবার লুকোনো রাগে ঢেলে দেয় এক পশলা বৃষ্টি, স্ত্রীর অভিমানে নামিয়ে আনে চাঁদের চিড়িয়া, সন্তানের অভিযোগগুলিকে কোলে তুলে নিয়ে ঘুম পাড়ায় —হ্যাঁ, একমাত্র রাতই পারে এসব।

রাতের অন্ধকারের ভেতর সব মুখোশ খুলে যায়। মুখ থেকে বেরিয়ে আসে নতুন মুখ —ভয় হয়, আবার কখনও কখনও ভালোও লাগে। মধ্যরাতের দীর্ঘ অবসরে অতীত খনন করা যায়, উঠে আসা রংচটা ছবিকে ছুঁয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায়। সৃজন আর বিসর্জনের মাঝে দাউ দাউ করতে থাকা প্রত্যয় জীবনীশক্তি দেয় দেহকে, মনকে দেয় অনাবিল আদিগন্ত এক স্ফুরণ। এমন সব রাতেই নদীর তীরে বসে 'ব্ল্যাক জার্নি' শুরু করে চিত্রশিল্পী। এমন সব রাতেই শহরের গোপন তল্লাটে কবি 'নগরবাউল' কিংবা 'সীমান্তফকির' হয়ে জীবনের কথা লেখে। এমন সব রাতেই গায়কের আলখাল্লার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে দিব্য মুরলী। আসলে এমন প্রতিটা রাত এক-একটা স্থির ও অস্থির অভাবজনিত বেদনার অভিভাবক। রাত, হ্যাঁ, শুধু রাতই জানে, দিনে মানুষ আসলে আত্মখুনী।

রাত্রির কায়া, ছায়া ও মায়া এক-একজনের কাছে এক-একভাবে ধরা দেয়। আলোর মাঝে থেকে প্রকৃত আলোকে পাওয়া যায় না, তার জন্য একটা গহীন ও নীরব আঁধার প্রয়োজন, যা একমাত্র রাত্রির আলিঙ্গনেই পাওয়া সম্ভব।

মহাকাব্যের লোককথা
ভৈমী একাদশী

উত্তরের উপকথা

এ কাহিনি মহাভারত থেকে টোকা অতএব ভূমিকা লেখার প্রশ্ন নেই। বলার মধ্যে এটুকু, এটি পাণ্ডবদের উত্তর-পূর্ব ভারতের বনভূমিতে দিনযাপনের আখ্যান। কোন বন, কী বৃত্তান্ত তা গবেষকরা বলতে পারবেন। লোককথার অত নিখুঁত স্থানকাল সাধারণত থাকে না। লোকমুখে বেঁচে যায় কেবল কাহিনিটি। যেমনটি এখানে হয়েছে।

পঞ্চপাণ্ডব যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেব তখন বনবাসে। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন মাতা কুন্তীও। মাতা নিষ্ঠাবতী। হিন্দু ঘরের বিধবার জন্য বেঁধে দেওয়া সকল আচার নিয়ম উপবাস তিনি ভক্তিভরে পালন করে চলেছেন।

সে এক মাঘ মাসের কথা।

মাঘ পঞ্চতারকাযুক্ত দশম নক্ষত্র মঘাযুক্ত পূর্ণিমার মাস। এ মাসে সূর্যদেব এমন কৃপণ থাকেন, বসুন্ধরা প্রচণ্ড শীতে থরহরি কাঁপে। সেদিনও এমনই শীত, জীবকুল জারে কাঁপছে ঠকঠক।

মা কুন্তীও শীতে কাবু, কুটিরের দ্বারে বসে ভাবছেন নিত্যশুদ্ধির সময় বয়ে যায়, স্নান না করে দেববিগ্রহকে সেবা না করিয়ে হবিষ্যি-ঘরে যাবেনই বা কী করে, আবার এত শীতে স্নানই বা করবেন কী করে। যাহোক করতে যখন হবেই, শীতের মধ্যেই তিনি প্রস্তুত হলেন পুকুরঘাটে স্নান করতে যাবার জন্য। নামমাত্র নেয়ে ধুয়ে আসবেন।

কুটির ছেড়ে কুন্তী চললেন বনপথ ধরে। পথটি শিশিরে ভেজা। কুঁদফুলের কুঁড়িগুলি ডাল পাতার আড়ালে লুকিয়ে শীত ঠেকাচ্ছে। ঘন কুয়াশার আস্তরণ এমন, এক হাত দূরের মানুষও স্পষ্ট দেখা যায় না। যেন তাঁর রাজমহলের অন্দরের স্বচ্ছ যবনিকা সারা বনে টাঙিয়ে দিয়েছে কেউ।

দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে, হস্তিনার রাজমহলের কথা ভেবে কুন্তীর বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছেন পুকুরের দিকে, এমন সময় বনের বাঁক ধরে হনহন করে হেঁটে আসছেন মধ্যপাণ্ডব ভীমসেন। অসীম বলে বলীয়ান ভীম আকৃতিতে যেমন ভীষণ, প্রকৃতিতেও তেমনই ভয়ানক। জঙ্গল থেকে কাঠকুটো সংগ্রহ করে তিনি কুটিরে ফিরছেন। ভীম দেখলেন, এই শীতে মা কুন্তী কাঁপতে কাঁপতে পুকুরের ঠান্ডা জলে নাইতে নামছেন।

দৃশ্যটি ভীমের সহ্য হল না। কৌরবদের অপকর্মের শাস্তি ভুগছে নির্দোষ কতগুলি মানুষ—ভাবতে ভাবতে তিনি রাগে দিগ্‌বিদিক হারিয়ে ফেললেন। এদিক ওদিক চঞ্চল নজর বুলিয়ে কিছু একটা খুঁজতে লাগলেন।

বনের পাশেই আদিগন্ত চাষজমি। চাষিরা মাঠে আসে নি কেউ। ভীম দেখলেন একটি লাঙলের ফলা মাঠের কোণে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেটি কুড়িয়ে এনে হাতের তেলোয় ঘষতে লাগলেন। তাঁর

সবল হাতের ঘর্ষণে খুব শিগগির লোহার টুকরোটি গরম হয়ে উঠল। তরতরিয়ে পুকুরে নেমে গরম লাঙলের ফলাটি জলে ডুবিয়ে দিয়ে ভীম হুংকার ছাড়লেন 'জয় শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীকৃষ্ণের জয়!'

পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণের আসন টলল। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখে নিলেন মধ্যম পাণ্ডবের কীর্তি। মায়ের কষ্ট দুর করার মতো পবিত্র কাজ আর নেই, তাই তিনি ভীমসেনের এই সরব আহ্বানের মর্যাদা রাখলেন, পুকুরের জল উষ্ণ হয়ে উঠল। মা কুন্তী নিশ্চিন্তে উষ্ণ জলে স্নান করে তৃপ্ত হলেন। মনে মনে ভীমকে আশীর্বাদও করলেন তিনি।

ওদিকে জলাধিপতি বরুণ পড়লেন মহা ফাঁপরে!

জগতের সবচেয়ে বলীয়ান পুরুষের এমন কীর্তি! সর্বাঙ্গ জ্বলছে। কিছুতেই তাঁর অঙ্গের তাপ প্রশমন হচ্ছে না। ভীষণ তাপে জ্বলেপুড়ে যেতে যেতে আর উপায়ান্তর না দেখে তিনি বিপদতারণ শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিলেন।

বরুণের দশা দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনে দয়া হল। তিনি হেসে বললেন, 'গোটা পৃথিবী (উন্) তোমার দ্বারা আবৃত (বৃ), সেই কারণেই তুমি বরুণ। আজ কিনা তোমাকেও রক্ষা করার প্রয়োজন হয়েছে? বেশ। হে জলাধিপতি, কারও কৃতকর্ম তো ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তার থেকে মুক্তি নেওয়া যায়। আজ শুক্লা একাদশী তিথি। তুমি যদি মধ্যম পাণ্ডবকে দিয়ে এই একাদশী তিথি পালন করাতে পারো তা হলে অচিরেই তোমার গাত্রদাহ উপশম হবে এবং তোমাকে যন্ত্রণা দিয়ে ভীমসেন যে পাপ করেছে সেই পাপ থেকে নিজেও মুক্ত হবে।'

পরামর্শ শুনে বরুণ ব্যাসদেবের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন। ভীমসেন আমার ওপর রেগে আছে, আপনি বরং তাঁকে এই তিথি পালনের উপদেশ দিন।

ব্যাসদেব উপদেশ দিলেও ভীম রাজি হলেন না। বললেন, 'আমার অপরাধ মার্জনা করুন। উপবাসী তো দূর, দিনে একবার অন্তত ভোজন কম করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ আমার উদরে বৃক নামের আগুন রয়েছে, পাঞ্চালীর হাতের সুস্বাদু রান্না বিনে সে আগুন শান্ত হয় না। কাজেই এই পালন না করলে যা-কিছু অমঙ্গল হবে তা মেনে নিতেও আমি রাজি আছি।'

মহা বিপদ!

ভীমসেন করতে রাজি নন, অথচ পালন না হলে বরুণদেবের উদ্ধার নেই। কী করা যায়, উপায় ভাবতে লাগলেন ব্যাসদেব। অনেক ভাবতে ভাবতে তিনি একটি পথ পেলেন। মধ্যম পাণ্ডবকে পুনরায় অনুরোধ জানালেন, 'আপনি বরং নির্জলা একদশী করুন। দিনান্তে একবার ভোজন না করলে আপনার উদর শান্ত হবে না, অতএব আপনি সমস্ত দিন জলপানে বিরত থেকে রাতে ভোজন করে উপবাস ভঙ্গ করবেন।'

এই নিদান ভীমের পছন্দ হল। তিনি নির্জলা একদশী পালন করতে সম্মত হলেন। পরের একদশী তিথিটি তিনি রীতি মেনেই পালন করলেন। প্রায়শ্চিত্ত হল তাঁর।

ওদিকে ভীমের একাদশী পালনের সঙ্গে সঙ্গেই বরুণদেবের গাত্রদাহ জুড়িয়ে গেল। জলাধিপতি স্নিগ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের জয়জয়কার করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণও খুশি হয়ে তিথিটির নাম দিলেন ভৈমী একদশী।

সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য

রাসায়নিক রস

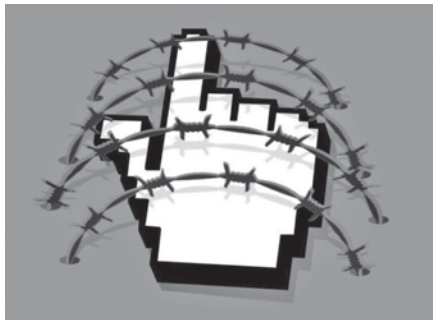

নাগরিকত্ব বিষয়ক বহুস্বরিক কথোপকথন

সুনীতিবাবু: ক্যালকাটা, ক্যাকোফনি, ক্যাবলাদা, ক্যারাটে, ক্যাডবেরির শব্দগুলির শুরুতে ক্যা আছে। ইদানিং রাজ্যে ক্যা ক্যা রব শুনিতেছি। বাঙলা ভাষায় শব্দের শুরুতে এ থাকিলে অ্যা বলার রেওয়াজ আছে, কিন্তু আ থাকিলে অ্যা সাধারণতঃ হয় না। তবে এটাও ঠিক যে আকাদেমি এবং অ্যাকাডেমি — দুইয়েরই চল আছে। অনুমান করি কাকের ডাক কা কোন কারণে এ(অ্যা)কাদ(ডে)মির পাল্লায় পড়িয়ে ক্যা হয়েছে।

জঁ জ্যাক রুশো: নাগর আর নাগরিকের তফাৎ নিয়ে কিছু বলুন। 'নাগর আমার কাঁচা পিরীত পাকতে দিল না' — এটা কি নাগরিকগীতি?

জন লক: নাগরিক কন্সেপ্ট কি বদলে গেছে?

সুনীতিবাবু: নগরের সঙ্গে ভুল প্রত্যয় লাগিয়েছে। নগরের যারা থাকে তাঁরা নাগর-নাগরী। তাঁদের একসঙ্গে বলা হয় নাগরিক।

কফিহাউজিয়া: ইয়েস! ঋত্বিক সেটাই দেখিয়েছেন তাঁর ছবিতে।

জুলিয়াস সিজার: নাগরিক নিয়ে ইন্ডিয়াতে খুব গোলমাল হচ্ছে। আমরা রোমানরা এ নিয়ে সব সমস্যার সমাধান তো করেই দিয়েছি!

ওবেলিক্স: তখন সব পথ রোমে যেত এখন বিশ্বব্যাঙ্কে যায়।

দেরিদা: আপনারা রোমে সবাইকে নাগরিকত্ব দিতেন না সিজারবাবু! তবে নাগরিকত্ব একটা টেক্সট। ইন্ডিয়াতে ভিন্ন ভাবে ডিকোড করা হচ্ছে। এখানেই আমার থিওরির সার্থকতা।

ওয়াশিংটন: আমরা এখন নাগরিকত্বের ব্যাপারে খুব কড়া হয়েছি।

ভলতেয়ার: আপনারদের মূল সমস্যা হল এই যে আপনারা ধরেই নিয়েছেন পৃথিবীটা কেবল নাগরিকের জন্য।

জন লেনন: ফালতু বোঝাচ্ছেন ভোলুদা। ফাইনালি সাদার দেশে কালো আর হিন্দুর দেশে মুসলমান মানেই অনাগরিক। ভালো মারিজুয়ানা থাকলে বরং দিন।

টলস্টয়: এমন কি হতে পারে যে স্বাধীনতার সত্তর বছর পর ইন্ডিয়াতে আর কোনও সমস্যা নেই। তাই কাজ না পেয়ে সরকার নাগরিক তালিকা রচনায় মন দিয়েছে। আমাদের সব কিছু ইতিবাচকভাবে দেখা উচিত।

বামপন্থী: স্বাধীনতা! দূর! দূর! হোপলেস! ভারত স্বাধীন হয় নি কেন কি আজাদিটা ঝুটা ছিল। এটা প্রমাণ করতে আমরা দেশের সম্পদ অনেক ভেঙেছি!

অ্যাস্টারিক্স: আপনারাই এ ব্যাপারে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন আদিতে?

পিট সিগার: আহা! ওদের থিওরিটা বুঝুন। ওরা তো দেশকে স্বাধীন ভাবে নি। সুতরাং রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিষয়টা এখানে খাটবে না।

স্টালিন: ইন্ডিয়াতে দেখলাম পুলিশ ঢিল ছুঁড়ছে, গাড়িতে আগুন লাগাচ্ছে।

মার্কস: এর মানে সরকার একই সঙ্গে শাসক আর বিরোধির ভূমিকায়। এই ডুয়ালিজম্‌টা কি সমাজতন্ত্রকে ত্বরান্বিত করবে?

লেনিন: ইন্ডিয়াতে আপনার থিওরি পুরোটাই নিয়েছে জাস্ট একটু বদলে। সোশালিজমের জায়গায় রামালিজম্‌। এটাকে মার্কশিয়ান বেদান্ত বলবেন না বৈদান্তিক মার্কসিজম্‌ — সেটা ভেবে দেখুন।

বেন হুর: যেটাই ভাবুন, সবাই কিন্তু নাগরিক হতে পারবে না।

হারকিউলিস: আনপসেবল। সবাই সব হয় না।

গ্যালিলিও: ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী নাকি বলেছেন ডি ক্যাম্প কোথাও নেই।

স্পিনোজা: নেই মানেই আছে। এটা তো ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়ালিজমের একটা অঙ্গ।

মেকিয়াভেলি: তা ছাড়া উনি এটাও বলেছিলেন, কালো টাকা নেই। উনি এভাবেই বলেন।

চে গুয়েভারা: যাই বলুন — ইন্ডিয়াতে তুমুল বিক্ষোভ হচ্ছে। ভাবছি ইন্ডিয়াতে গিয়ে কয়েকদিন থাকি।

মার্কেজ: আপনাদের কাছে আপডেট নেই। ইন্ডিয়াতে নতুন আরেকটা জিনিস এসে গেছে। ক্যা এখন পুরোন।

পল রবসন: দেখুন, মানুষকে দেশহীন বানাবার কৌশল কোনও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গরু-গাধাদের চিন্তা এমন খাতে বইতে পারে ঠিকই, মানুষের পারে না। আলোচনা চালিয়ে কোনও লাভে নেই। মারার জন্য মানুষ চাই। নইলে অস্ত্র বিক্রি হবে না।

চেম্বারলেন: অস্ত্র বিক্রি না হলে কত লোক বেকার হয়ে যাবে ভাবতে পারছেন?

চমস্কি: তাহলে ক্যা নিয়ে সুনীতিবাবু যা বললেন সেটাই কি ঠিক?

নেসফিল্ড: ক্যা আসলে ইংরিজি। সি এ এ।

হিপি: বুঝেছি। ক্যানাবিস অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট।

এলভিস: ক্যানাবিস নয়, সিটিজেন।

পোপ জন পল: এ নিয়ে ইন্ডিয়াতে অশান্তির কি আছে? আমরা সবাই ইশ্বরের সন্তান। কে নাগরিক হলো, কে হলো না —এ নিয়ে মাতামাতির কোন অর্থই হয় না।

রকফেলার: একদম তাই। আসলে আপনারা মূল বিষয়টা ধরতে পারেন নি। ইন্ডিয়াতে যদি সবাইকে হিন্দু করে দেওয়া যায় তবে বেশ কয়েকটা ধর্মিয় ছুটি কমে যাবে। এতে কর্মদিবস বাড়বে। সেটা বাড়লে আমার ইন্ডিয়ান কলিগদের সুবিধে হবে। ইন্ডিয়াতে পাঁচ বছর পর পর ভোট করার কোনও মানে নেই। বিশ বছরে একবার করলেই যথেষ্ট। আমরা যদি টানা বিশ বছর একজনকে ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্ট করে রেখে দিই এবং পুরো জনসংখ্যাকে একটা ধর্মে নিয়ে আসি, তবেই সেখানে জিডিপি বাড়বে। —(চমকে) আরে! আমার পেছনে এটা কী?

ক্ষুদিরাম বসু: একটা বোমা বেঁচে গেছিল। আপনার পেছনে দিলাম।

(আলোচনা ভণ্ডুল। পরদিন কাগজে বেরিয়েছিল 'ক্ষুদিরাম বসু নামে একজন আর্বান নকশাল গ্রেপ্তার'।)

অনু ঘটক

ডুয়ার্সের বইপত্র

বিষয় ডুয়ার্স

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা
এখন ডুয়ার্স সাহিত্য ২০২০। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা
গণ আন্দোলনে কোচবিহার। হরিপদ রায়। ২৪০ টাকা
কোচবিহারের রাণী নিরুপমা দেবীর নির্বাচিত রচনা। দেবায়ন চৌধুরী। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা
দিল সে দিল্লী সে। কল্যাণ গোস্বামী। ২৯৫ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন। সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে। প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন। ১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা
মুর্শিদাবাদ। জাহির রায়হান। ১৯৫ টাকা
বাংলার উত্তরে টই টই। দ্বিতীয় সংস্করণ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৯৫ টাকা

গাছ গাছালির পাঠ পাঁচালি।
শ্বেতা সরখেল। ১৯৫ টাকা

*** প্রায় নিঃশেষিত

এখন ডুয়ার্স

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে

ন্যুনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

অনলাইনে কিনুন আমাদের বইপত্র **www. dooarsbooks.com**

ডুয়ার্স সাহিত্য উৎসব ২০২০

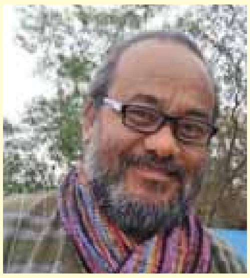

বিমল লামা, উদবোধক

সুধীর দত্ত, প্রধান অতিথি

রণজিৎ দাশ, বিশেষ অতিথি

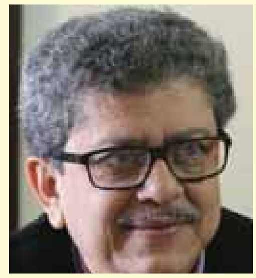

ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, প্রধান বক্তা

1st DOOARS
Literary Fest
January 18 & 19, 2020

অন্যান্য অতিথি

শীর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুজিত দাস

সাগরিকা রায়

বুবুন চট্টোপাধ্যায়

পার্থজিৎ চন্দ

সুমন ভট্টাচার্য

১৮ জানুয়ারি ২০২০ ধুপঝোরা সাউথ পার্ক, মুর্তি, গরুমারা।

উদ্বোধন। কবিতা পাঠ ও পিকনিক। গল্প নিয়ে আড্ডা (কেবল ডেলিগেট ও আমন্ত্রিতদের জন্য)

১৯ জানুয়ারি ২০২০ রবীন্দ্র ভবন, জলপাইগুড়ি।

মূল আলোচনা সভা। সম্বর্ধনা। কবিতা পাঠ ও পিকনিক। (সবার জন্য) সন্ধ্যায় শিশু-কিশোর পর্ব ও ডলস শো (সবার জন্য)

তরাই পর্ব। ইচ্ছেবাড়ি। শিলিগুড়ি

কবিতাপাঠ। আঞ্চলিক সাহিত্য। আলোচনা। সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

(কেবল ডেলিগেট ও আমন্ত্রিতদের জন্য)

আয়োজক

এখন ডুয়ার্স ইচ্ছেবাড়ি

সহযোগী

DooarsBooks.com

জলপাইগুড়ি, সৃষ্টি মাইম থিয়েটার

Dhupjhora South Park

ডেলিগেট রেজিস্ট্রেশন চলবে ১০ জানুয়ারি অব্দি। যোগাযোগ সত্যম ভট্টাচার্য ৯৪৭৫৮৯৩৪৩৩

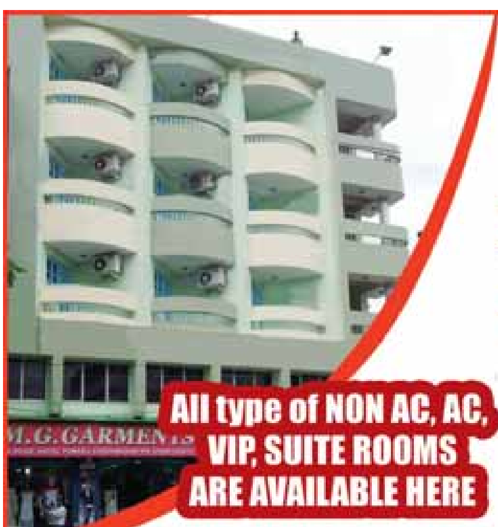

All type of NON AC, AC, VIP, SUITE ROOMS ARE AVAILABLE HERE

WEL COME
HOTEL YUBRAJ
&
RESTAURANT MONARCH

CHARU ARCADE | B. S. ROAD | COOCHBEHAR

CONTACT NO.
+91 9735526252, (03582) 227885

Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.